পর্ব-১ শিক্ষাগত পরিকল্পনা এবং পরিচালনা

যথার্থ পরিকল্পনা ও পরিচালনার মাধ্যমেই জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য সাফল্য লাভ করতে পারে।

একক-১-এ সংবিধানে বিবেচিত ভারতীয় শিক্ষার বিভিন্ন দিকের কথা এবং কেন্দ্র এবং রাজ্য একমত তালিকায় শিক্ষার পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে। সম্পূর্ণ অধ্যায়েই গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে শিক্ষার জাতীয় নীতিসমূহ ও তার সাথে সাথে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও। এই এককটি বিশেষ জোর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে ভারতবর্ষে বিশেষ শিক্ষার দিকটিকে। এক্ষেত্রে এই জাতীয় নীতিগুলি প্রয়োগের সমস্যাসমূহকে এবং নির্দেশিত করতে চেয়েছে বাস্তব লক্ষ্য এবং ঘোষিত নীতিগুলির মধ্যে কোথায় ফাঁক বা ব্যবধান এবং এই ক্ষেত্রের মূল সূত্রগুলিকে যেখানে প্রাথমিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে দেশ এই বিষয়ের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে।

একক-২-এ নির্দেশিত হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাগত সংস্থার ভূমিকা। যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ভূমিকা (MHRD), জাতীয় শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের ভূমিকা (NCERT) এবং জাতীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ পর্ষদের ভূমিকা (NCTE) জাতীয় শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন গঠনতন্ত্র, জাতীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ পর্ষদ, সামাজিক ন্যায় ও অধিকার প্রদান মন্ত্রক ও ভারতীয় পুনর্বাসন পর্ষদের সাংগঠনিক রূপ, সামাজিক ন্যায় ও অধিকার প্রদান মন্ত্রক পুনর্বাসনের উপায় বা পথ কি দেখাচ্ছেন এবং ভারতীয় পুনর্বাসন পর্ষদ প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করছে।

একক-৩-এ শিক্ষাগত পরিকল্পনার প্রকৃতি ও অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শিক্ষাগত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়েছে, শিক্ষাগত পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয়েছে, শিক্ষাগত পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন পথ নির্দেশ আলোচিত হয়েছে, শিক্ষা পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে এবং আমাদের দেশে শিক্ষা পরিচালনার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

একক ১ □ ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষা এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি ও শিক্ষামূলক পরিকল্পনা (Education in Indian Constitution, National Policies on Education and Educational Planning)

গঠন

১.১ ভূমিকা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষা

১.৩.১ অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

১.৩.২ মাধ্যমিক শিক্ষা

১.৩.৩ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা

১.৩.৪ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে শিক্ষা

১.৩.৫ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা

১.৩.৬ শ্রমিকদের কর্মগত (Vocational) এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ

১.৩.৭ পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য শিক্ষা

১.৩.৮ অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষা

১.৩.৯ প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান

১.৩.১০ হিন্দির বিস্তৃতি

১.৩.১১ ধর্মবিষয়ক শিক্ষা

১.৪ ইউনেস্কোর সঙ্গে সহযোগিতা (Liasion with UNESCO)

১.৫ যুগ্ম তালিকাধীন শিক্ষা

১.৬ শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় নীতি / জাতীয় শিক্ষা নীতি

১.৬.১ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯)

১.৬.২ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ১৯৫২-৫৩

১.৬.৩ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৬৪-৬৬

১.৬.৪ জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৬৮

১.৬.৫ জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬

১.৭ এককের সারাংশ

১.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন

১.৯ বাড়ীর কাজ (Assignment)

১.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.১১ উৎস

১.১ ভূমিকা (Introduction)

এই অধ্যায়ে ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষাব্যবস্থা, জাতীয় স্তরে ও যুগ্ম তালিকায় শিক্ষার মান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে জাতীয় শিক্ষানীতি এবং একই সাথে বিভিন্ন শিক্ষা কমিটি ও বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পড়ার পরে শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় এককের বিভিন্ন শিক্ষাবিষয়ক সংগঠন সম্পর্কে এবং তৃতীয় এককে শিক্ষাগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সম্পর্কে অধিকতর ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পড়ার পরে শিক্ষার্থীরা

★ জাতীয় শিক্ষানীতির যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

★ বিশেষ শিক্ষার মূল দিকগুলি এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতি (Policy) সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

★ জাতীয় কর্মনীতির রূপায়ণ সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

★ সরকারী ঘোষিত নীতি (Policy) এবং বাস্তব অভীষ্ট পূরণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

১.৩ ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষাব্যবস্থা (Education in the Indian Constitution)

ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে /ভূমিকাতেও শিক্ষা বিষয়ে স্পষ্ট দিক নির্দেশ আছে।

বিশেষ ধারা আর্টিকেল-২৯(১) অনুযায়ী রাজ্য পরিচালিত/ পোষিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র ধর্ম (Religion), বর্ণ/ জাত (Caste), জাতি (Race) এবং ভাষাগত (Language) কারণে বা কোন একটির কারণে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নাকচ করতে পারে না।

Article 29(1)–"No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving grant out of the State funds on grounds only on religion, race, caste, language or any of them."

আমাদের দেশে ১৯২১-১৯৭৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষা ছিল সরাসরি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজ্যের বিষয়। যেখানে কেন্দ্রীয় (Central, Govt.) সরকার General Policies তৈরী করেন, তৎসহ সাহায্য (Aid), নির্দেশ দান করেন এবং রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ছিল উক্ত কর্মনীতির (general policies) যথাযথ রূপায়ণের যাতে সর্বস্তরে শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

নিম্নে রাজ্যের শিক্ষাবিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

★ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

★ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

★ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা।

★ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান খোলা।

★ বয়স্ক ও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

★ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

★ কমিশন ও কমিটি নিয়োগ করা।

★ সুপারভাইজার স্টাফ নিয়োগ করা।

★ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রদান করা।

★ পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা।

এছাড়া রাজ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সংগঠনকে grant-in-aid প্রদান ও প্রদত্ত নিয়মানুযায়ী তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করে থাকে।

কিন্তু আইনের ৪২তম সংশোধনী বলে শিক্ষা যুগ্ম তালিকায় (concurrent list) স্থান পায় যেখানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই দায়িত্বশীল।

১.৩.১ অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (Free and Compulsory Primary Education)

Directive Principles of State Policy-র Article 45 অনুযায়ী রাজ্য সংবিধানের আরম্ভের/ চালু হওয়ার দশ বছরের মধ্যে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে প্রয়াসী/সচেষ্টা থাকতে বাধ্য। এটা রাজ্য সরকারের কর্তব্য এবং তদানুসারে আইন প্রণয়ন ও অন্যতম দায়িত্ব।

এখানে 'State' বলতে Article 12 অনুযায়ী "The Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India."

সংবিধান বর্ণিত সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ১৯৬০-এর দশকে উপলব্ধি করা হলেও এবং আশাধিক্যভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার লাভ করলেও সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার কাজ বিশেষ কারণে সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। কোঠারী শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) অনুযায়ী কেবলমাত্র সামাজিক ন্যায় এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য প্রতিটি শিশুর অবৈতনিক সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য নয় পরন্তু এটি শ্রমিকের / কর্মীর কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তোলায় জন্য জরুরী হাতে জাতীয় উৎপাদনসক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১.৩.২ মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education)

সংবিধানের ধর্মনিরেপক্ষতা অনুযায়ী স্কুলের সময়ের মধ্যে কোনপ্রকার ধর্মবিষয়ে শিক্ষাদান নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র স্কুলের সময়ের বাইরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিভাবক এবং পরিচালন সমিতির অনুমোদনসাপেক্ষে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে শিক্ষাদান করা যেতে পারে।

স্কুলের পরিবেশে অনৈক্য, বিরোধ, ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

কোঠারী শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কোন বিশেষ শ্রেণীর স্কুলে কোন বিশেষ ধর্মবিষয়ে শিক্ষাদানের চেয়ে নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয়।

১.৩.৩ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা (Higher Education and Research)

এই বিষয়ে কেন্দ্র নিজস্ব ক্ষমতা বলে আইন তৈরী করতে পারে—

(ক) Entry 63 of List-1 (Union List)-এর বলে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, দিল্লি ইউনিভার্সিটি জাতীয় গুরুত্ব পেয়েছে।

(খ) Entry 64 of List 1 (Union List)-এর বলে ভারত সরকার দ্বারা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সাহায্যপ্রাপ্ত সায়েনটিফিক অথবা প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় সম্পদের মর্যাদা লাভ করেছে।

(গ) Entry of 65 of List 1 (Union List)-এর ফলে—

★ বৃত্তিমূলক, কর্মগত অথবা প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণে এবং পুলিশ অফিসারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

★ বিশেষ বিষয়ে পড়া ও গবেষণায় উৎসাহদান।

★ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের তদন্ত এবং সত্য উদ্‌ঘাটনে বৈজ্ঞানিক অথবা প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

(ঘ) Entry 66—এই আইনের বলে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষায় জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনপ্রকার কার্যকলাপ যে কোনো রাজ্যস্তরে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের অধিকার কেন্দ্রের হাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত।

(ঙ) বিদেশের সঙ্গে শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক—Enry B-র বলে যে কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত জাতীয় স্তরে রূপায়ণ আবশ্যিক। ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশনের মতে শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক যোগাদান, রাষ্ট্রপুঞ্জের (UN) যে কোন কাজে বিশেষ করে UNESCO কাজে অংশগ্রহণ ভারত সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।

১.৩.৪ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শিক্ষা (Education in the union territories)

আর্টিকেল 239 অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োজিত প্রশাসন দ্বারা পরিচালিত যা কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত।

১.৩.৫ আর্থিক এবং সামাজিক পরিকল্পনা : (Economic and Social Planning)

এটি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত Entry 20 of List III (Concurrent List) যেহেতু আর্থিক ও সামাজিক উন্নতিসাধন শিক্ষার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই হেতু ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের উভয়ে সম্মিলিতভাবে শিক্ষাবিষয়ক জাতীয় পরিকল্পনা তৈরী এবং রূপায়ণে যৌথভাবে কাজ করা উচিত।

১.৩.৬ শ্রমিকদের কর্মগত ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ : (Vocational and Technical Training of labour)

III নং যুগ্ম তালিকার 25 ধারা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। এর বলে লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভা শিক্ষার স্বার্থে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

১.৩.৭ দুর্বল শ্রেণীর জন্য শিক্ষা (Edn. for Weaker Section) :

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো ভারত সরকারের আবশ্যিক দায়িত্ব।

আর্টিকেল 46 ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপ্যালসের মতে রাজ্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিক্ষা এবং আর্থিক উন্নতির স্বার্থে বিশেষ করে তপসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য বিশেষ যত্নবান হবেন এবং তাদের সামাজিক অন্যায় এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

এখানে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী বলতে কেবলমাত্র তপসিলি জাতি ও উপজাতি নয়। এটি মহিলাদেরও বোঝায়, ফলে বালিকা ও মহিলা শিক্ষা বিস্তারের দায়ভারও ভারত সরকারের উপর ন্যস্ত।

দুর্বল শ্রেণী (Weaker Section) বলতে অক্ষম ব্যক্তিদেরও বোঝায়। আর্টিকেল 46 অনুযায়ী অক্ষমদের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির দায়ভারও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত।

পিছিয়ে পড়া শ্রেণী বলতে কোন একটি জায়গার মানুষদের বোঝায় যেখানে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ব্যাহত এবং অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় পিছিয়ে আছে। এইসব পিছিয়ে পড়া জায়গা রাজ্যের মানুষদের শিক্ষায় সমান সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে ঐ সব জায়গার/ রাজ্যের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদানও ভারত সরকারের আবশ্যিক দায়িত্ব।

১.৩.৮ সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষা (Education of Minorities) :

ভারতীয় সংবিধানে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

(ক) আর্টিকেল 29—সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য—

★ ভারতীয় উপমহাদেশের যে কোন জায়গায় বসবাসকারী নিজের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখার পূর্ণ অধিকার আছে।

রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত / পোষিত/ সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ, কিংবা ভাষাগত কারণে কোন ব্যক্তিকে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

(খ) আর্টিকেল 30—সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার পূর্ণ অধিকার আছে।

★ ধর্ম কিংবা ভাষার ভিত্তিতে যে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজের পছন্দ মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার পূর্ণ অধিকার আছে।

★ ধর্ম কিংবা ভাষার ভিত্তিতে গঠিত এবং সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী সহায়তা প্রদানে (গ্রান্ট ইন এইড) অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদাভাবে দেখতে পারে না।

ভারতীয় সংবিধানে প্রাইভেট স্কুল চালানোরও অধিকার আছে। সেকেণ্ডারী ও ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশনের মতে সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত কিছু বিদ্যালয়ে অস্বাস্থ্যকর খণ্ডিত জাত্যভিমানের প্রাধান্য দেখা যায়। সেইহেতু ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন শিক্ষার মান বর্ধন ও জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য সক্রিয় নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন।

১.৩.৯ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান : (Instruction in mother-Tongue at Primary Stage)

আর্টিকেল 350-A অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যের এবং প্রতিটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উচিত ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘু শিশুদের প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে যথাযথ সুযোগের ব্যবস্থার করা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যে কোন রাজ্যকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন।

আর্টিকেল 350-B অনুযায়ী ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুরক্ষায় স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করে আলোচ্য বিষয়ে তদন্ত করতে পারেন।

সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশন তাদের রিপোর্টে মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান অপরিহার্য্য বলে মনে করে।

১.৩.১০ হিন্দী ভাষার বিস্তার : (Spread of Hindi)

আর্টিকেল 351 অনুযায়ী জাতীয় ভাষা অর্থাৎ হিন্দীর বিস্তারের জন্য কেন্দ্রের বিশেষ দায়িত্ব আছে। যাতে এই ভাষার মাধ্যমে মিশ্র সাংস্কৃতির ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয়।

হিন্দী ভাষার বিস্তারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রক নিম্নলিখিক কাজ করে থাকেন।

★ বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিগত পরিভাষা গঠন।

★ ভাষা বিষয়ে তথ্যকোষ গঠন।

★ জনপ্রিয় সাহিত্যের হিন্দীকরণ।

★ গুণমানসম্পন্ন হিন্দী কাজের প্রকাশন ও পুনর্মুদ্রণ।

★ উপযুক্ত হিন্দীর Short-hand-র উদ্ভাবন।

★ টাইপ রাইটারের হিন্দী সংস্করণ।

★ বিভিন্ন শিক্ষা ও বিজ্ঞানভিত্তিক কাজের হিন্দী সংস্করণ তৈরী।

★ হিন্দী বিস্তারের জন্য বৃত্তি প্রদান।

★ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিশেষ সুযোগ।

★ অহিন্দী ভাষী রাজ্যে হিন্দী বিস্তারের জন্য সাহায্য প্রদান।

১.৩.১১ ধর্মীয় শিক্ষা : (Religious Education)

25 (1) ধারা অনুযায়ী সমস্ত নাগরিকের নিজস্ব নীতিবোধ ও বিশ্বাস ও ধর্ম প্রচারের অধিকার ও স্বাধীনতা আছে।

28 ধারা অনুযায়ী যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজ ধর্মের পূজা ও ধর্মসভায় যোগদানের অধিকার আছে।

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত না হয় তবুও ধর্মবিষয়ক কোন প্রকার শিক্ষাদান নিষিদ্ধ। যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন সংঘের (Trust) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাদের প্রয়োজনে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করতে পারে। কিন্তু কোন সংখ্যালঘু শিক্ষার্থী অভিভাবকের অনুমতিক্রমে কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

১.৪ ইউনেস্কোর সঙ্গে সহযোগিতা (Liasion with UNESCO)

ভারত ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত UNESCO (ইউনাইটেড নেশন্‌স এডুকেশান্যাল, সায়েনটিফিক এণ্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন্ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এটি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। এটি সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য ভারতকে সাহায্য প্রদান করে। এটি ভারতে নানা প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে। যেমন,

(ক) UNESCO Research Centre of Social and Economic Development in Southern India.

(খ) Asian (পরবর্তীকালে National) Institute of Educational Planning & Administration.

(গ) South Asia Science Co-operative office.

(ঘ) Regional Research Centre on Social Implications of Industrialization for Southern Asia.

কমনওয়েলথ এডুকেশন কো-অপারেশন প্ল্যান (১৯৫৯)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ছাত্রদের স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ দিয়ে থাকে। এছাড়াও এর সাহায্যে ভারতীয় শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন কমনওয়েলথ দেশে প্রশিক্ষণ ও চাকরীর সুযোগ আছে।

কিছু স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান যেমন, Ford Foundation, The British Council, The Imperial Relation Trust, London ভারতীয় ছাত্রদের স্কলারশিপ প্রদান করে। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে বিদেশী ছাত্রও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায়।

১.৫ যুগ্ম তালিকায় শিক্ষাব্যবস্থা (Education on the Concurrent List)

১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসের আগে পর্যন্ত শিক্ষা ছিল রাজ্য সরকারের বিষয়। কিন্তু ৪২তম সংশোধনী বলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ১৯৭৬ সালে ১১ নভেম্বর ৪২তম বিল সংসদের অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯৭৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় এবং শিক্ষা যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪২তম সংশোধনী বলে শিক্ষা যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও এই সম্বন্ধে অনেক পূর্বেই আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল—

(ক) ১৯৬৪ সালে Sh. M. C Chagla শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় চেয়েছিলেন।

(খ) উচ্চ শিক্ষাবিষয়ক Sapru's কমিটির সদস্যগণ কমপক্ষে উচ্চশিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় রাখার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।

(গ ইণ্ডিয়ান এডুকেশন কমিটির দুইজন সদস্য শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে যুগ্ম তালিকায় রাখার জন্য গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

(ঘ) শিক্ষা পরিকল্পনা (Education Policy) হওয়া উচিত জাতীয় পর্যায়ে।

(ঙ) অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় উভয়েরই (রাজ্য ও কেন্দ্র) দায়িত্ব। এক্ষেত্রে কেন্দ্র রাজ্যকে এই বিষয়ে যদি প্রয়োজন হয় পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য করতে পারে।

(চ) দেশের সর্বত্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল শিশুর জন্য কেন্দ্র শিক্ষায় সমান সুযোগের ব্যবস্থা করতে বাধ্য।

(ছ) রাজ্যে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সমস্ত ধরনের সাহায্য প্রদান কেন্দ্রের দায়িত্ব।

(জ) কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০ + ২+ ৩ প্রথানুযায়ী রাজ্য অনুসরণ করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে কেন্দ্র যে কোন রাজ্যে যে কোন পরিকল্পনা সরাসরি রূপায়ণ করতে পারে।

(ঝ) জাতীয় প্রতিষ্ঠান যেমন UGC, NCERT এবং National Bodies, যেমন, CABE প্রভৃতি শিক্ষাবিষয়ক কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধনে সক্ষম।

১.৬ শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতিসমূহ (National Policies on Education)

১৯৫৬ সালে সংসদীয় আইন বলে UGC একটি স্বশাসিত বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সাধারণভাবে অনুদান প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে পরিচিত। যদিও এর মুখ্য কাজ হল বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের শিক্ষার

উন্নতিসাধন এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা এবং একইরকমের শিক্ষার মান বজায় রাখা।

UGC হল উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সরকারের পরিকল্পনা তৈরীর সংস্থা।

শিক্ষা বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা—

(১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন/রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯)।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন/মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩)।

(৩) জাতীয় শিক্ষা কমিশন/কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬)।

(৪) জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬)।

১.৬.১ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন : (University Education Commission 1948-49)

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্বাভাবিকভাবে দ্রুত প্রসার লাভ শুরু করে। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে উচ্চ শিক্ষার জন্য নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে স্নাতক স্তরে উত্তীর্ণরা সমাজের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে যথাযথভাবে অভিযোজিত হতে পারছিল না। সেই কারণে Inter-University Board of Education এবং Central Advisory Board of Education পরিবর্তনশীল সমাজের ও দেশের প্রয়োজনীয়তা পূরণে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে All India Commission on Education গঠনের পরামর্শ দিয়েছিল।

কমিশন নিয়োগ (Appointment of Commission) : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (যিনি পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন) এঁর সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর The University Education Commission নিয়োগ করা হয়েছিল। এই কমিশন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা করে যাতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো যায় তার জন্য পরামর্শ ও পথনির্দেশ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। এই কমিশন দুটি পর্যায়ে রিপোর্ট করেছিল। প্রথম পর্যায়ের রিপোর্টটি ১৮টি অধ্যায় ও ৭৪৭ পাতার ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের রিপোর্টে প্রতিষ্ঠানগুলির পরিসংখ্যান ও শিক্ষাগত সমস্যা নির্ধারিত হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of University Education) :

★ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক এবং আর্থিক অবস্থার বিশাল পরিবর্তন ঘটেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে রাজনীতি, প্রশাসন, শিল্প ও অর্থনীতিতে নেতৃত্বের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

★ বিশ্ববিদ্যালয় যাতে আধুনিক সভ্যতার বিকাশের পীঠস্থান হিসাবে পরিগণিত হয়।

★ সাংস্কৃতিক জীবনের আধারকে গতিশীল রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উচিত সাংস্কৃতিক অভিযান চালানো।

★ গণতন্ত্রের প্রসার ও নতুন জ্ঞানান্বেষণের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি তৈরী করা।

★ অতীতের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতিকে অবহেলা না করে আধুনিক শিক্ষার নতুন নতুন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা।

★ ছাত্রদের আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটানো।

★ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারানুযায়ী নারীদের সম্মান করা।

★ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি সত্তার অনুসন্ধান এবং বিকাশ ঘটানো।

★ কেবলমাত্র মানসিক নয় ছাত্রদের দৈহিক উন্নতি সাধন।

পরিকল্পনা ও শিক্ষকের উপর শিক্ষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথাযথভাবে সমৃদ্ধ এবং সুদক্ষ শিক্ষকের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষণের এবং মূল্যায়নের মান কমছে। শিক্ষকদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান এবং পাঠাগারে ভালো মানের বইয়ের অভাব নিম্ন মানের শিক্ষণের জন্য দায়ী। কমিশনের মতে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হওয়া ছাত্রদের বেশীর ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত সুযোগ সঠিকভাবে নিতে অক্ষম। সেই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তন জরুরী। কমিশনের মতে শিক্ষার মান মূল্যায়ন এবং অনুসন্ধিৎসামূলক কাজের মান খুব নিম্ন মানের যার উন্নতিসাধন খুবই জরুরী। বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে প্রকৃত কাজের দিন খুবই কম যা ১২০ দিনের কাছাকাছি।

মুখ্য সুপারিশগুলি (Major Recommendations) :

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (University Commission)-এর মতে—

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব্যক্তির অন্ত-সত্ত্বার বিকাশসাধন। গণতন্ত্র এবং আত্মোন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ, যাতে তারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং বৃত্তি ও কর্মমূলক প্রশিক্ষণ নিতে পারে।

★ ১২ বছর স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়ার পর উত্তীর্ণরা বিশ্বদ্যিালয়ে ভর্তি হতে পারবে।

★ শিক্ষা এবং শিক্ষণের মান বর্ধনের জন্য প্রতিটি প্রদেশে অধিক সংখ্যায় well staffed & equipped ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করতে হবে।

★ অধিক সংখ্যায় পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Vocational Institution) প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যাতে ছাত্ররা ১০-১২ বছর স্কুলে পড়ার পর নানা পেশায় নিযুক্ত হতে পারে।

★ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য হাইস্কুলে এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষকদের জন্য রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

★ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যধিক চাপ (over crowding) কমাতে হবে।

★ পরীক্ষা বাদ দিয়ে কাজের দিন সংখ্যা ন্যূনতম ১৮০ দিন করতে হবে।

★ একটি শিক্ষা বর্ষকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে হবে এবং প্রতি পর্যায়ের সময়সীমা ১১ সপ্তাহ হবে।

★ উচ্চশিক্ষার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে Tutorial প্রথা চালু করতে হবে এবং লাইব্রেরীও উন্নত মানের হওয়া উচিত।

★ স্নাতকোত্তরদের Master's এবং Doctor's ডিগ্রীর জন্য সেমিনারের ব্যবস্থা করতে হবে।

★ প্রচলিত এবং বিশেষ শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন এবং পেশাগত উদ্দেশ্য পূরণ। প্রচলিত শিক্ষার Theory এবং Practical উভয়ই বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রহণ করতে হবে।

★ দেশের অগ্রগতির জন্য স্নাতকোত্তর গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে।

★ ভারত কৃষিভিত্তিক দেশ। সেইহেতু কৃষিবিদ্যার জাতীয় গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কৃষিবিদ্যাচর্চার জন্য গ্রামীণ পরিবেশে অধিক সংখ্যায় কৃষি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান রাজ্য ও কেন্দ্রকে প্রবর্তন করতে হবে।

★ বাণিজ্য ও শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে হাতে-কলমে প্রয়োগমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বাণিজ্যে Master's-দের নির্দিষ্ট পেশায় (যেমন, accountancy) যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

★ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উচ্চশিক্ষায় ইংরেজীর পরিবর্তে ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

★ সরকারী এবং প্রশাসনিক কাজে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রী জরুরী নয়। রাজ্য নিয়োগের জন্য নিজস্ব পরীক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিশ্ব বিদ্যালয় কমিশনের (UGC) পরামর্শ অনুযায়ী বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে স্নাতক কোর্স তিন বছরের হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী কোর্স ইন্টারমিডিয়েট বিজ্ঞান নিয়ে পাস করার পর work training ছাড়া ৪ বছরের এবং work training নিয়ে ৫ বছরের হবে। যথেষ্ট সংখ্যায় Occupational Institutes প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে স্কুলে পড়ার পর ছাত্ররা নানা পেশায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। কমিশনের মতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ৩,০০০ এবং অনুমোদিত কলেজে ১,৫০০-র বেশী হওয়া উচিত নয়।

১.৬.২ মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন : (Secondary Education Commission 1952-53)

ডাঃ এ. লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়ার, (যিনি পরবর্তীকালে ১৯৫২-৫৩ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor হয়েছিলেন) এর সভাপতিত্বে ১৯৫২ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর এই কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি জানতে এবং এর উন্নতি ও পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবিধান গ্রহণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল।

উদ্দেশ্য :

★ ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে মূল্যায়ন করা।

★ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ করে—

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রতিষ্ঠান, বিষয়বস্তু।

(খ) প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পর্ক।

(গ) বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক নির্ধারণের জন্য।

(ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য সম্পর্কিত সমস্যা জানতে, যাতে দেশের সর্বত্র ও প্রয়োজন অনুযায়ী সদৃশ শিক্ষা কাঠামো গঠন করা যায়।

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে এর ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বুঝতে চেষ্টা করছিল। কমিশন Wood Dispatch, Hunter Commission, Sadler Commission, Sargeant Report প্রভৃতির ভিত্তিকে আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিল। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রশ্নমালা (Questionnaire) তৈরী করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে ছিল এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ২৯শে আগস্ট, ১৯৫৩ সালে ২৫০ পাতার একটি রিপোর্ট পেশ করেছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি : (Defects of the Secondary Education)

★ কমিশন অনুভব করেছিল মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল পুস্তকনির্ভর, যান্ত্রিক, বৈচিত্র্যহীন এবং একঘেঁয়েমীপূর্ণ। এটি ছাত্রদের বোধশক্তি, ধারণাকে পোষণ করে না। এটি ছাত্রদের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় নীতি, সহযোগিতা এবং নেতৃত্বের বিকাশসাধনে অক্ষম যা একজন আদর্শ নাগরিকের কাম্য।

★ অধিকমাত্রায় পরীক্ষার চাপ, পাঠ্যক্রম, অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি, যথাযথ পাঠ্য বিষয়ের অভাব ছাত্রদের কাছে একটি অন্যতম সমস্যা।

★ অনমনীয় সময়সূচী, অনুপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক, অস্বাভাবিকভাবে বড় সিলেবাসের জন্য শিক্ষকের নিজস্ব মত পোষণের অবকাশ খুবই কম।

★ অত্যধিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের পক্ষে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

★ ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা ব্যবসথার কারণে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জ্ঞানের মূল্যায়ন হয় না।

মুখ্য পরামর্শ : (Major Recommendation)

এই কমিশন গঠনের আগেই ভারত তার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।

★ মাধ্যমিক শিক্ষার সময়কাল ৭ বছর হওয়া উচিত এবং তা ১১ বছর বয়সে শুরু ও ১৭-১৮ বছরে শেষ হওয়া উচিত।

★ বহুমুখী বিদ্যালয় (Multipurpose school) স্থাপন করা উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের উদ্দেশ্য, সক্ষমতা এবং পছন্দ মতো বিষয় নির্বাচন করতে পারে।

★ Horticulture এবং পশুপালনবিদ্যা (Animal Husbandary) গ্রামীণ স্কুলে শেখানো উচিত।

★ বালিকাদের Home Science পড়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

★ তিনটি ভাষা মাধ্যমিক স্তরে শেখাতে হবে—

—মাতৃভাষা।

—আঞ্চলিক ভাষা।

—অফিসিয়াল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাষা।

—Classical language—সংস্কৃত, আরবী, পার্সী, ল্যাটিন।

—আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরাজী।

★ মাতৃভাষা এবং একটি আঞ্চলিক ভাষা জুনিয়র বেসিকে এবং হিন্দী ও ইংরাজী শেখানো উচিত জুনিয়র বেসিকের পরে।

★ External examination-এর সংখ্যা, Objective মূল্যায়নের মাধ্যমে কমিয়ে আনতে হবে। বার্ষিক মূল্যায়নের অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কার্ড (Progress records)-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

★ শিক্ষা সংক্রান্ত পথনির্দেশ (Guidance) ও পরামর্শ (Counselling) শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, সক্ষমতা ও ধারণা সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে। যা শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে সাফল্যের পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করবে।

১.৬.৩ জাতীয় শিক্ষা কমিশন—১৯৬৪-৬৬ (Nationl Education Commission—1964-66) :

এই কমিশন ডাঃ ডি. এস. কোঠারীর (যিনি পরবর্তীকালে UGC-র চেয়ারম্যান হয়েছিলেন) নেতৃত্বে ১৯৬৪ সালে ১৪ জুলাই গঠিত হয়েছিল। এটি কোঠারী কমিশন নামেও খ্যাত। এটি সর্ববিষয়ে এবং সর্বস্তরে সার্বিক নীতি ও পরিকল্পনা তৈরীর মাধ্যমে শিক্ষার জাতীয় রূপরেখা তৈরীর উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল।

মুখ্য সুপারিশ : (Main Recommendations)

★ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো, সামাজিক ও জাতীয় সংহতি অর্জনে আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে ও সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশের স্বার্থে শিক্ষার উন্নতি সাধন হওয়া উচিত।

★ গুণগত মানের তুলনায় পরিমাণগতভাবে শিক্ষা বিস্তার লাভ করেছে। সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক।

★ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মান, পাঠ্যক্রমে বৈচিত্র্য বাড়ানো, শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি কেবলমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে ফলপ্রসূ করা সম্ভব।

★ বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম অংশ হিসাবে বিজ্ঞানের কিছু বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সমস্ত কোর্সের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

★ সাধারণ অথবা কর্মমূলক যে কোন শিক্ষায় কাজের অভিজ্ঞতাকে (Work Experience) শিক্ষার একটি অখণ্ড অংশ হিসাবে রাখতে হবে।

★ মাধ্যমিক শিক্ষাকে কর্মমুখী করতে হবে।

★ স্কুল এবং উচ্চ স্তরে আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ইংরাজী শিক্ষার প্রসার স্কুল স্তর থেকে শুরু করা উচিত।

★ নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে।

প্রচলিত পাঠ্যক্রমের ত্রুটিগুলো অপসারণের উদ্দেশ্যে কমিশন বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্যক্রমের সুপারিশ করেছেন।

(ক) নিম্ন প্রাথমিক স্তর (প্রথম-চতুর্থ শ্রেণী)

★ একটি ভাষা—মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা।

★ গণিত।

★ পরিবেশচর্চা—তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান।

★ সৃষ্টিমূলক কার্যকলাপ।

★ সমাজসেবা ও কর্মশিক্ষা।

★ স্বাস্থ্য শিক্ষা।

(খ) উচ্চ প্রাথমিক (পঞ্চম-সপ্তম শ্রেণী)

★ মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা। (দুটি ভাষা মাত্র)

★ হিন্দী অথবা ইংরাজী।

★ গণিত।

★ বিজ্ঞান।

★ Social Studies [ইতিহাস, ভূগোল, নগরবিজ্ঞান (Civics)]।

★ অঙ্কন।

★ কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা (Social Service)।

★ শারীর শিক্ষা।

★ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ শিক্ষা।

(গ) নিম্ন মাধ্যমিক (অষ্টম-দশম শ্রেণী)

★ তিনটি ভাষা—হিন্দী অভাষাভাষী এলাকাতে সাধারণত—মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা।

—হিন্দী।

—ইংরাজী।

হিন্দী ভাষাভাষী এলাকায় সাধারণত

—মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা।

—ইংরাজী।

—একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা।

—গণিত।

—বিজ্ঞান।

—ইতিহাস, ভূগোল, নগরবিজ্ঞান।

—অঙ্কন, (Art)।

—কর্ম অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবা।

—শরীরচর্চা।

—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

(ঘ) উচ্চমাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)

কেবলমাত্র দুটি ভাষা। যার একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা, যে কোন বিদেশী ভাষা বা যে কোন ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা।

—একটি অতিরিক্ত ভাষা।

—ইতিহাস।

—ভূগোল।

—ইকনমিকস।

—মনোবিজ্ঞান।

—দর্শন।

—সমাজবিজ্ঞান।

—পদার্থ বিদ্যা।

—রসায়ন বিদ্যা।

—গণিত।

—জীব বিজ্ঞান।

—ভূবিদ্যা।

—হোম সায়েন্স (Home Science)।

—কর্ম শিক্ষা, সমাজ সেবা।

—শরীর শিক্ষা।

—অঙ্কন ও কারুশিল্প।

—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

★ দেশের সর্বত্র হিন্দীর বিস্তার জরুরী। আধুনিক ভাষার কিছু সাহিত্য দেবনাগরী অথবা রোমান হরফে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

★ প্রতিবন্ধী ও অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষার জন্য অধিকতর বেশী সুযোগসুবিধা দিতে হবে।

★ পথ প্রদর্শন ও পরামর্শদানকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে রাখতে হবে।

★ করেস্‌পণ্ডেন্স-এর মাধ্যমে কর্মমূলক ও কারিগরী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

সরকার ইতিমধ্যে বেশ কিছু পরামর্শ রূপায়ণ করেছেন এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রয়াস জারী রয়েছে। যাতে দেশের ভবিষ্যতের জন্য ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিক সক্রিয় করা যায়।

১.৬.৪ জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮) [National Policy on Education (1968)] :

জাতীয় উন্নয়ন একনাগরিকত্ব ও সংস্কৃতির বিস্তার জাতীয় সংহতিকে আরও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় পরিকল্পনা ১৯৬৮ সালে আইনসভা দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। এই পরিকল্পনাতে প্রথম স্নাতক স্তরের কোর্সের পুনর্গঠনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

উচ্চশিক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর বিশেষ আলোকপাত করেছিল।

★ কত জন সর্বক্ষণের শিক্ষার্থী একটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে তা নির্ভর করবে ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী ও অন্যান্য সুযোগ এবং স্টাফের উপর। যেহেতু চাহিদার তুলনায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ কম তাই ভর্তির জন্য নির্বাচনমূলক ভর্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

★ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ও তার মান বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

★ স্নাতকোত্তর (Post-graduate)-র স্তরে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে।

★ অধিক সংখ্যা advanced studies-এর কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

★ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে করস্‌পণ্ডেনস কোর্স ও পার্ট-টাইম শিক্ষায় সুযোগ বাড়াতে হবে।

★ দেশের বিভিন্ন জায়গায় গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

১.৬.৫ জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা—১৯৮৬ (National Policy on Education–1986) :

★ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছিল।

রাধাকৃষ্ণ কমিশন (১৯৪৮), মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২) এবং কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬) ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য নানা পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় একই থেকে গেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাসে তাই জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা (১৯৮৬) এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ

পদক্ষেপ হিসাবে পরিগণিত।

এটি জাতীয় উন্নয়ন, সার্বজনীন নাগরিকত্ব ও জাতীয় সংহতি আরো মজবুত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এটি শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং এটি সর্বস্তরে গুণমান বর্ধন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষা ও জীবনের নিকট সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কথা হল—প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে জাতি, ধর্ম,বর্ণ, প্রথা, জায়গা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে গুণমানগত শিক্ষা পায়। এটি সার্বিক ১০ + ২ + ৩ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেয় যা দেশে সর্বত্র প্রচলিত (এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম ১০ বছর—৫ বছর প্রাথমিক শিক্ষা, ৩ বছর উচ্চ প্রাথমিক এবং ২ বছর উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা); জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় পাঠ্যক্রমের গঠনশৈলীর উপর নির্ভরশীল যার একটি সার্বিক অংশ ও অন্যান্য নমনীয় অংশ নিয়ে নিয়ে গঠিত। ভারতবর্ষ পৃথিবীকে একটি পরিবার-রূপে গণ্য করে এবং শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে। জাতীয় প্রকল্প শিক্ষার আদানপ্রদান, বৈপরীত্যে কমাতে সার্বিক ন্যূনতম শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা প্রভৃতি বাস্তবায়িত করার জন্য দায়বদ্ধ।

আজীবন শিক্ষাদান হল প্রবাহমান শিক্ষা পদ্ধতির আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য। এটা ধরে নেওয়া যায় যে সার্বিক স্বাক্ষরতার দ্বারা যুবক, গৃহবধূ, কৃষি ও শিল্পকর্মী এবং পেশাদাররা তাদের পছন্দের মতো শিক্ষা পায়। ভবিষ্যতে Open ও Distance শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন (UGC), অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন (AICTE), ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ICAR) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ হতে সাহায্য করে। NCERT এবং NIEPA শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার কাজে যুক্ত।

নতুন শিক্ষা পরিকল্পনায় যারা শিক্ষায় সমান সুযোগ লাভে বঞ্চিত তাদের বিশেষ প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষায় সমান সুযোগদানের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষাকে নারীদের মানবর্ধনের অন্যতম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা মহিলাদের সমৃদ্ধির জন্য গঠনাত্মক ও মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষার সর্বস্তরে উপজাতি, শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় মানুষদের জন্য বিশেষ উপঢৌকনের ব্যবস্থা করে শিক্ষায় সম-অধিকারকে বাস্তবায়িত করা হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা **(Elementary Education) :**

এতে দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

(ক) সার্বিক যোগদান এবং সর্বতোভাবে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বজায় রাখা।

(খ) ক্রমাগত শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন।

এজন্য স্কুলে প্রয়োজনীয় সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। ন্যূনতম দুটি যথেষ্ট বড়ো শ্রেণীকক্ষ, প্রয়োজনীয় খেলনা, ব্ল্যাকবোর্ড, ম্যাপ, চার্ট ও অন্যান্য শিক্ষণের জিনিষ থাকতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education)—উন্নত মানের শিক্ষাদানের মাধ্যমে বিশেষ প্রবণতা বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে দ্রুতহারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা (Higher Education)—নিজস্ব পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় গবেষণাগার তৈরী করে উৎসাহ দান করতে হবে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। মুক্ত শিক্ষার প্রচলন করতে হবে।

কারিগরি ও ম্যানেজম্যান্ট শিক্ষা :

অর্থনীতি, সামাজিক পরিবেশ, উৎপাদন ও পরিচালনা পদ্ধতির কথা মাথায় রেখে কারিগরী ও ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন জরুরী। যেমন, কমপিউটার নামক যন্ত্রের গুরত্বের কথা মাথায় রেখে স্কুল স্তর থেকে কমপিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক শিক্ষা-উপাদান, লাইব্রেরী এবং কম্পিউটার প্রভৃতি উপকরণ থাকা দরকার। ছাত্রাবাসের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকতে হবে বিশেষ করে মেয়েদের জন্য। খেলাধূলা, গঠনমূলক কাজ এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের বিস্তার ঘটাতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন—

সাফল্যের মান নির্ধারণ হল শিক্ষণ ও জ্ঞানার্জন পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পরীক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার গুণগত মানের প্রকাশ ঘটে।

★ অতিরিক্ত বস্তুনিষ্ঠ পরিবর্তন বর্জনীয়।

★ মননের উপর গুরুত্ব আরোপ।

★ পরীক্ষা পরিচালনার উন্নতিকরণ।

★ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পিতামাতা দ্বারা মূল্যায়ন পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার।

★ শিক্ষা-উপাদান ও পদ্ধতির সহগামী পরিবর্তনের প্রয়োগ।

★ ধারাবাহিক ও সর্বাঙ্গীন মূল্যায়ন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সাধারণ বিষয় মূল্যায়িত হয়।

★ সেমিষ্টার প্রথার প্রয়োগ।

★ নম্বরের পরিবর্তে গ্রেড প্রথা চালু করা।

শিক্ষকের মর্যাদা সমাজের সমাজ-সংস্কৃতির ভাবসত্তা প্রকাশ করে। সরকার এবং কমিউনিটির এমন পরিবেশ তৈরী করতে প্রয়াসী হওয়া উচিত যাতে শিক্ষকরা গঠনমূলক ও সৃজনশীল কাজে আগ্রহী ও উৎসাহিত হয়। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, ব্যক্তি নিরপেক্ষতা থাকা উচিত। শিক্ষকের বিশেষ স্থানে নিয়োগ ও বদলী ব্যক্তি নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। শিক্ষক সংগঠন বৃত্তিগত সততা, শিক্ষকের মর্যাদা, বিকেন্দ্রীকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বনির্ভরতা বাড়িয়ে তুলতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা পরিকল্পনা ও পরিচালন ব্যবস্থায় নারীদের যোগদান জরুরী।

যদি এই পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তবে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্তন হবে।

শিক্ষা পরিকল্পনের পুনর্গঠন—১৯৯২

সেন্ট্রাল এ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ এডুকেশন (CABE) ১৯৯০-৯২, জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা (১৯৮৬) গভীর বিশ্লেষণের পর কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়, যা ১৯৯২ সালের মে মাসে গৃহীত হয়। ফলস্বরূপ প্রোগ্রাম অফ্ এ্যাকশন (POA)-এর জন্ম হয়।

পরামর্শগুলি হল—

সার্বজনীন মৌলিক শিক্ষা, শিক্ষার সুযোগের সমানাধিকার, নারীশিক্ষা ও তাদের উন্নতি, কর্মমুখী স্কুল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষার সুপ্রতিষ্ঠা। কারিগরী শিক্ষার আধুনিকীকরণ। সর্বস্তরে শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতির গুণগত উন্নতি।

ভারতে শিক্ষামূলক পরিকল্পনা (Educational Planning in India) :

দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা জরুরী। পরিকল্পনা হল গঠনশৈলী। যা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী অনুসরণ করে নির্দিষ্ট সময়ে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। পরিকল্পনা হল উদ্দেশ্যমূলক, পরিকল্পনার ফলে কোন নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছানোর জন্য বর্তমানে কি করতে হবে এবং কার পর কোন কাজটি হবে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

মূলধন পরিকল্পনা পদ্ধতি হল একটি সুসংগঠিত যন্ত্র যা যে কোন উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে তার ভবিষ্যতের আর্থিক খরচ সূচিত করে।

শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের ক্যাপিটাল পরিকল্পনার উন্নতির জন্য নীতি এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা পরিষ্কার পথনির্দেশ করে।

মূলধন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে—

★ মূলধন পরিকল্পনার উন্নতিসাধন এবং পরিষ্কার পথনির্দেশ-এর জন্য নীতি ও রূপরেখা তৈরী করা।

★ প্রতিষ্ঠানের স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনার সঙ্গে সম্ভাব্য ক্যাপিটাল পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়সাধন করা।

★ ক্যাপিটাল পরিকল্পনা পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং সুপারিশ মাস্টার ও আর্থিক প্ল্যানিং-এ ব্যবহার করা।

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা ঃ

ভারতের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গঠনের উদ্দেশ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় যোজনা কমিটি গঠিত হয়েছিল।

সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষাবিষয়ক কমিটি যথাক্রমে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, মেঘনাদ সাহা এবং টি. কে. সাহার সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল। এই কমিটিগুলির কাজ ছিল ভারতে শিক্ষাগত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নতির জন্য রূপরেখা তৈরী করা। জাতীয় যোজনা কমিটির স্থাপনের ফলে CABE নামক একটি অফিসিয়াল এজেন্সীকে (যা প্রকৃতপক্ষে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯২৩ সালে ভেঙ্গে পুনরায় ১৯৩৫ সালে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল।) শিক্ষার পুনর্গঠনের সমস্যা জানতে বলা হয়েছিল। এটি শিক্ষাগত পুনর্গঠনের বিভিন্ন বিষয়—মৌলিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, স্কুলের শিশুদের কল্যাণ, শিক্ষা ভবন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষকদের চাকরির শর্ত এবং কারিগরী শিক্ষা বিষয়ে জানতে কয়েকটি সাব-কমিটি গঠন করেছিল। স্যার জন সার্জেন্ট, (ভারতে শিক্ষা কমিশনার) ১৯৪৪ সালে প্রথম শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা রচনা করেছিল। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নতুন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গঠন করা যাতে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে গ্রেট ব্রিটেন এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষার মানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ভারতে ১৯৫১ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা হয়েছিল এবং শিক্ষা পরিকল্পনা প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়।

ভারতের যোজনা কমিশনের মুখ্য কাজ হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গঠন এবং তার প্রয়োগকে মনিটর করা।

প্রথম	পঞ্চ-বার্ষিক	পরিকল্পনা	১৯৫১-৫৬
দ্বিতীয়	,,	,,	১৯৫৬-৬১
তৃতীয়	,,	,,	১৯৬১-৬৬
চতুর্থ	,,	,,	১৯৬৯-৭৪
পঞ্চম	,,	,,	১৯৭৪-৭৯
ষষ্ঠ	,,	,,	১৯৮০-৮৫
সপ্তম	,,	,,	১৯৮৫-৯০
অষ্টম	,,	,,	১৯৯২-৯৭
নবম	,,	,,	১৯৯৭-২০০২

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা—১৯৫১-৫৬

★ বুনিয়াদি শিক্ষার একটি আলাদা শাখা তৈরী।

★ ন্যূনতম পক্ষে প্রতিটি রাজ্যে একটি পলিটেকনিক।

★ মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা নিয়ে গবেষণা করার জন্য গবেষণা সংস্থা।

★ সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব্ এডুকেশনে অডিও-ভিডিও এইডস তৈরী।

★ কারিগরী এবং পেশাগত শিক্ষায় যেতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য উপদেশ ও কাউনসেলিং কেন্দ্র স্থাপন।

★ বিশেষ পেশা এবং কর্মমূলক শিক্ষার জন্য ১৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত।

★ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে।

★ মাধ্যমিক শিক্ষাকে অধিকতর বিজ্ঞান নির্ভর করতে হবে এবং এটি মনোবিজ্ঞানের নিয়মনীতি অনুযায়ী শিক্ষণ এবং শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে।

★ শরীর শিক্ষা, সমর শিক্ষা, বাগানবিদ্যা, কৃষি, সঙ্গীত প্রভৃতি পাঠ্যক্রমে নেওয়া হবে।

★ উচ্চ শিক্ষার্থে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় স্থাপন ও পুনর্গঠন।

★ হাতের কাজ ও কারিগরী শিল্পের জন্য নতুন বিদ্যালয় স্থাপন।

★ শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করা।

★ বিদেশে পড়ার জন্য বৃত্তি প্রদান।

★ *গ্রন্থাগার স্থাপন।*

★ যুবকল্যাণে শরীর শিক্ষা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা।

★ স্বাক্ষরতা এবং বয়স্ক শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করা।

★ আঞ্চলিক এবং প্রাদেশিক ভাষার বিকাশ, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, বিভিন্ন কলেজে N.C.C. প্রশিক্ষণের সুযোগ।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)—

এই পরিকল্পনাতে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল—

★ প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদী শিক্ষায় পরিণত করা, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষয় বন্ধ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

★ বালকা[illegible] শিক্ষার প্রসার এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষিকাদের প্রয়োজন।

★ প্রাথমিক এবং বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য পর্ষদ গঠন।

★ বহুমুখী এবং নিম্ন কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন। উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করা।

★ মাধ্যমিক স্কুলের অধিকতর সাফল্যের জন্য শিক্ষকদের সুবিধা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।

★ মাধ্যমিক স্তরে কৃষিবিদ্যা পঠনের ব্যবস্থা করা।

★ উচ্চতর শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান এবং কারিগরী ও বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার ব্যবস্থা করা।

★ বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্নাতক স্তরে শিক্ষার মান বর্ধন করা।

★ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা এবং অপচয় রোধ করা।

★ বিদ্যালয় ভবন, গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

★ জাতীয় ভাষা এবং অন্যান্য ভাষার উন্নতিসাধন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্গঠন করা।

★ ফাইন আর্টসের উন্নতি এবং সমৃদ্ধ করা।

★ UNESCO-র সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সংগঠিত করা।

তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬)

নিম্নলিখিত বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

★ ছয়টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের শিশুকল্যাণ কেন্দ্রগুলির উপর সম্পূর্ণ নজরদারী। প্রাথমিক শিক্ষাকে রাজ্য সরকার, পুর বোর্ড এবং জেলা পরিষদকে অধিগ্রহণ করতে হবে এবং এর গ্রামীণ এলাকায় বিস্তারের জন্য অধিকতর মনোযোগী হতে হবে।

★ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার মান বর্ধনের জন্য সুযোগসুবিধা বাড়াতে হবে।

★ বহুবিধ উদ্দেশ্যমুখী এবং নতুন মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন পুনর্গঠন এবং পুরানোদের উচ্চমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন করা। ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ২৫,০০০ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বহুবিধ উদ্দেশ্যমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছিল। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব পূরণ করতে প্রাদেশিক প্রশিক্ষণ

উদ্দেশ্যমূখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছিল। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব পূরণ করতে প্রাদেশিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান খোলা।

★ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্নাতকোত্তর শিক্ষার ও গবেষণার জন্য সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

★ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে বালিকাদের যোগদান বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

★ স্কুল এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে সামাজিক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় নেতা, শিক্ষক এবং সমাজসেবীদের জনগণকে বেশী সংখ্যায় স্বাক্ষর করার কাজে সহায়তার আহ্বান করা হয়েছিল।

★ ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ্ ফাণ্ডামেন্টাল এডুকেশন (NIFE) এবং অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ্ অডিও ভিজুয়াল এডুকেশন সেন্টার (AIAVEC) বয়স্ক শিক্ষার জন্য অনেক কাজ করেছিল।

★ কারিগরী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ১৩০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল। এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনিক্যাল কলেজে প্রায় ২০,০০০ জনকে সম্পূর্ণভাবে প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল।

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৯-৭৪)

এই পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয় প্রাধান্য পেয়েছিল—

★ ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের চাহিদার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সক্রিয়ভাবে সংযোগ ঘটানো এবং তৎসংলগ্ন দুর্বলতাগুলোর অপসারণ করা।

★ দ্রুত প্রসারণের ফলস্বরূপ বেড়ে যাওয়া চাপের অপসারণ।

★ প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের প্রচেষ্টা কিছু নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত শিক্ষণ প্রযুক্তির বিকাশ, শিক্ষা-সহায়ক উপাদান তৈরী এবং শিক্ষকদের নির্দিষ্ট পথে চালিত করা।

★ ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা প্রদান।

★ গ্রামীণ এলাকাতে শিক্ষিকাদের বাসস্থান প্রদানের মাধ্যমে বালিকাদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকরণের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং শিক্ষক এবং ধাত্রীর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপিত করা।

★ মাধ্যমিক শিক্ষার মানের উন্নয়ন এবং বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ করা।

★ বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

★ কর্ম সংখ্যা বাড়ানো, গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগারের সুযোগসুবিধা বাড়িয়ে উচ্চতর শিক্ষার উন্নতির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা।

★ আংশিক সময়ের ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা কোর্সের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন। যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয়তা।

পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৪-৭৯)

★ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিক্ষার সমান সুযোগের সুনিশ্চিতকরণ।

★ শিক্ষার সঙ্গে উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় এবং কাজের/চাকরীর বাজারের নিকট সম্পর্ক স্থাপন।

★ প্রদত্ত শিক্ষার মান বর্ধন।

★ সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতির জন্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত জনগণ ও ছাত্রদের সামিল করা।

★ ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান। এছাড়াও যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাব্যক্তিত্বের নিয়োগ এবং শ্রেণীকক্ষ তৈরী করা বিশেষ করে অনুন্নত এলাকায়। পাঠক্রমের পুনর্গঠন। কর্ম অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও শক্তিশালী করা।

★ দুর্বল শ্রেণী এবং অনুন্নত এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থার অতিরিক্ত সুযোগ তৈরী করা।

★ সান্ধ্য কলেজ, দূর শিক্ষা এবং প্রাইভেট শিক্ষা লাভের জন্য সুযোগ তৈরী করা।

★ স্নাতকোত্তর পড়াশুনা এবং গবেষণাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এ্যাডভান্সড স্টাডি কেন্দ্র, বিজ্ঞান পরিষেবা কেন্দ্র, কম্পিউটারের সুযোগ এবং আঞ্চলিক যন্ত্রাদি উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মশালা প্রভৃতির উন্নতি সাধন। সামার ইনস্টিটিউট, সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে অধ্যাপকমণ্ডলীর মানোন্নয়ন।

★ বিধি বহির্ভূত শিক্ষায় শিক্ষা, বৃত্তি প্রদান এবং ভাষায় উন্নতিসাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

★ অধ্যাপকমণ্ডলীর মানোন্নয়ন / পুরানো যন্ত্রপাতির বিলোপ এবং কোর্সের বহুমুখীতার উপর জোর দান।

ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)

★ বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

★ প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক বিকাশ।

★ মাধ্যমিক শিক্ষার কর্মমুখীকরণ।

★ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার মান বর্ধন।

★ শিক্ষা-স্বনির্ভরতা এবং জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

★ শিক্ষায় সম-সুযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে অধিক সুযোগদানের উদ্দেশ্যে নানা কর্মসূচী গ্রহণ। উপজাতি এলাকায় অধিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং অপ্রচলিত শিক্ষার জন্য সুযোগ সৃষ্টি।

★ ৬-১৪ বছর শিশুদের জন্য সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা ফলপ্রসূ করার উপর জোর দেওয়া বিশেষ করে বালিকা এবং দুর্বল শ্রেণীর শিশুদের জন্য যাতে স্কুল পরিত্যাগ বন্ধ হয় কিংবা খুবই কমে যায়।

★ বয়স্ক শিক্ষাতে অধিক প্রাধান্য দান।

★ মাধ্যমিক স্তরের গুণগত মানোন্নয়ন এবং কর্মমুখীকরণ।

★ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের গুণগন মানমোয়েন বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিতে।

★ অপ্রচলিত শিক্ষার অধিকতর ব্যাপ্তি।

সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

★ ১৯৯০ সালের মধ্যে ১৫-৩৫ বছর বয়স্কদের মধ্য থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। ১৯৯০ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জন করা।

★ কর্মমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় নানানস্তরে অধিকতর সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন।

★ শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণ সংগঠন করা, যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে তাল মেলানো যায়।

★ কারিগরী শিক্ষার আধুনিকীকরণ।

★ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো।

★ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে শিক্ষার পঠনতন্ত্রকে ঢেলে সাজানো।

কারিগরী শিক্ষার আধুনিকীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। জাতীয় স্বাক্ষরতা মিশনের জন্ম হয়েছিল এবং মানব সম্পদ বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯২-৯৭)

★ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ সাফল্য অর্জন করা।

★ ১৫-৩৫ বছর বয়সের স্তরের মধ্য থেকে নিরক্ষরতার উচ্ছেদকরণ।

★ কর্মমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন।

★ শিক্ষণে বিজ্ঞান মনস্ক পদ্ধতির প্রয়োগ।

★ সর্বসাধারণের, বিশেষ করে নারীদের জন্য শিক্ষায় সমান সুযোগ দান।

★ কর্মমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে মাধ্যমিক পাশ করার পর প্রত্যেকে স্বনির্ভর হতে পারে।

★ প্রতিটি রাজ্যে ১০ + ২ + ৩ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োগ।

★ অধিক সংখ্যক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপর জোর দেওয়া।

★ নবোদয় বিদ্যালয়ের বিকাশ এবং সংখ্যা বাড়ানো।

★ পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষার সংস্থান করা।

★ ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের সুযোগের প্রসারণ।

★ উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের জন্য আরও বৃত্তি প্রদান।

এই পরিকল্পনার মুখ্য বিষয়গুলো হল—সার্বজনীন মৌলিক/ প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্কদের মধ্য থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যপূরণ এবং কর্মমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করা।

নবম পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার উপর অধিকতর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষার জন্য গুণগত মান বর্ধনের জন্য আরও উন্নত নেট ওয়ার্কস এবং মুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষার প্রসারণের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১.৭ এককের সারাংশ (Unit Summary)

সংবিধানের মুখবন্ধে শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে দেশের ভূমিকা নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে।

★ ২৯ নং ধারা অনুযায়ী সরকার পরিচালিত/ সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র ধর্ম, জাতি ও ভাষার ভিত্তিতে বা এর যে কোন একটির জন্য কোন ভারতবাসীকে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

★ শিক্ষা যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত। যেখানে কেন্দ্র সার্বিক নীতি প্রণয়ন, নির্দেশ এবং সাহায্য দান করে এবং রাজ্যের দায়িত্ব নীতির প্রয়োগ করে রাজ্যের জনগণকে শিক্ষা প্রদান করা।

★ ভারত UNESCO-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যা ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান নিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে। UNESCO ভারতের সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রের বিকাশসাধনের জন্য এর নানান প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে।

★ শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন

—বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন/রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৮-৪৯)।

—মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন/মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩)।

—জাতীয় শিক্ষা কমিশন/ কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬)।

—জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) (১৮৯৬)।

★ যোজনা কমিশনের মুখ্য দায়িত্ব হল পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী ও এর প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা।

১.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। যুগ্ম তালিকায় শিক্ষা "Education on the concurrent list" এই বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখুন।

২। শিক্ষা রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকা দরকার "Education should be a State Subject"—আলোচনা করুন।

৩। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (১৯৪৮-৪৯)-এর মতামত/সুপারিশগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৪। মুদালিয়র কমিশনের মূল সুপারিশগুলি লিখুন।

৫। সংক্ষেপে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের মতামত/সুপারিশগুলি বিবৃত করুন।

৬। জাতীয় শিক্ষানীতি—১৯৮৬-র সীমাবদ্ধতাগুলি লিখুন।

৭। জাতীয় শিক্ষানীতি—১৯৮৬-র মুখ্য বৈশিষ্টগুলি লিখুন।

৮। "আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে রচিত"। "Our Five year Plans envisaged the all round development of education"—আলোচনা কর।

১.৯ বাড়ীর কাজ (Assignment)

১। শিক্ষা যুগ্ম তালিকায় থাকা উচিত কিনা এই বিষয়ে নিজের মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

অথবা

ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষা সম্পর্কে লেখ।

অথবা

শিক্ষা রাজ্যের বিষয় হওয়া উচিত—আলোচনা করা।

২ (ক) ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে নিজের মতামত লেখ।

(খ) যদি তুমি শিক্ষাবিদ হও তবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে গঠন করবে। সংক্ষেপে উদাহরণ-সহ লেখ।

১.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Point for Discussion Clarification)

১.১০.১ আলোচনার সূত্রাবলি (Points for Discussion)..

....

....

....

১.১০.২ বিশ্লেষণের সূত্রাবলি (Points for Clarification)..

....

....

....

১.১১ উৎস (References/Further readings)

1. Basu, Aarna (1974) *The Growth of Education and Political Development in India* 1998-1920.

2. Bose, P.K. and Mukherjee, S.P. (1980) Graduate Employment and Higher Education in West Bengal. *Journal of Education* (3) Spring. New Delhi : pp 281-290.

3. Gandhi, M. K. (1962) *The problem of Education.* New Delhi : Navjivan Publishing House.

4. Naik. J. P. and Nurullah, Syed (1974) *A Student's History of Education in India :* 1842-1976, New Delhi : McMillan.

5. Ruhela, Satya Pal (ed) (1970) *Sociology of the Teaching Profession in India,* New Delhi : NCERT.

6. Sharma, Jogendra K. (2001) *History of Problems of Education.* Volume I. New Delhi : Kanishka Publishers. Distributors. New Delhi.

7. Government of India (1956) *Second Five Year Plan.* New Delhi. Government of India, Planning Commission.

8. Government of India (1957) *Review of the First Five Year Plan.* New Delhi : Government of India. Planning Commission.

9. Government of India (1961) *Third Five Year Plan.* New Delhi : Government of India, Planning Commission.

10. Government of India (1966) *Education and National Development.* New Delhi : Ministry of Education.

11. Government of India (1969) *Fourth Five Year Plan,* New Delhi : Government of India, Planning Commission.

12. Government of India (1974) *Fifth Five Year Plan.* New Delhi : Government of India. Planning Commisson.

13. Government of India (1980) *Sixth Five Year Plan 1978-89.* New Delhi : Government of India. Planning Commission.

14. Government of India (1985) *The Seventh Five Year Plan 1985-90.* Vol. II (Sectoral Programmes of Development). New Delhi : Government of India. Planning Commission.

15. Government of India (1992) *Eighth Five Year Plan 1992-97,* Vol. II (Sectoral Programmes of Development). New Delhi : Government of India. Planning Commission.

একক ২ ☐ সংস্থা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা (Agencies and their role in Education)

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (MHRD)

- ২.৩.১ শিক্ষায় MHRD-র ভূমিকা
- ২.৩.২ জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় (NOS)
- ২.৩.৩ ঠিকানা

২.৪ জাতীয় শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ (NCERT)

- ২.৪.১ NCERT-র গঠনতন্ত্র
- ২.৪.২ শিক্ষায় NCERT-র ভূমিকা
- ২.৪.৩ ঠিকানা

২.৫ জাতীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ পর্ষদ (NCTE)

- ২.৫.১ NCTE-র গঠনতন্ত্র
- ২.৫.২ শিক্ষায় NCTE-র অবদান
- ২.৫.৩ ঠিকানা

২.৬ সামাজিক ন্যায় ও অধিকার প্রদান মন্ত্রক (MSJ & E)

- ২.৬.১ পুনর্বাসনে কার্যসাধন পদ্ধতি
- ২.৬.২ অসমর্থ মানুষের পুনর্বাসন
- ২.৬.৩ প্রতিষ্ঠানের চার্ট
- ২.৬.৪ ঠিকানা

২.৭ ভারতীয় পুনর্বাসন পর্ষদ (RCI)

- ২.৭.১ RCI-র গঠনতন্ত্র
- ২.৭.২ পুনর্বাসনে RCI-র ভূমিকা
- ২.৭.৩ অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সংযোগ
- ২.৭.৪ বর্তমান প্রসারণ
- ২.৭.৫ ঠিকানা

২.৮ এককের সারাংশ

২.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন

২.১০ বাড়ীর কাজ

২.১১ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.১২ উৎস

২.১ ভূমিকা (Introduction)

সার্বজনীন মৌলিক শিক্ষা হল সাংবিধানিক নির্দেশনামা। এটি বিশেষভাবে উল্লিখিত যে অন্যভাবে সক্ষম (দৃষ্টিহীন, শ্রবণ এবং লোকোমোটর প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পলসি শিশুরা হল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত) শিশুদের সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে। এদের শিক্ষণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকের প্রয়োজন, যারা স্পেশাল এডুকেটররূপে পরিগণিত এবং যাদের বিভিন্ন ধরনের অক্ষমদের সম্পর্কে জ্ঞান এবং বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। ফলস্বরূপ বর্তমানে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচীতে বিভিন্ন ধরনের অক্ষমদের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, কিছু বিশ্ববিদ্যালয় যথা M. P. Bhoj Open University, Bhopal, Netaji Subhas Open University, Kolkata RCI-এর সহযোগিতায় B.Ed (Special Education) শুরু করেছে।

এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৬ সালের আগে রাজ্য সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার জন্য দায়িত্বশীল ছিল এবং কেন্দ্র কিছু নির্দিষ্ট—যেমন, সমন্বয়সাধন, উচ্চতর শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষার মান নির্ধারণের বিষয়ে কাজের জন্য দায়িত্বশীল ছিল। যাইহোক ১৯৭৬ সালের সংবিধানের সংশোধনী বলে শিক্ষা যুগ্ম তালিকায় স্থান পায়। অর্থাৎ শিক্ষা যৌথ দায়িত্ব হিসাবে পরিগণিত হয় এবং শিক্ষার কিছু বিষয় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যৌথ দায়িত্ব হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে রাজ্য শিক্ষার উন্নতিসাধন এবং অগ্রগতির জন্য দায়বদ্ধ এবং কেন্দ্রও শিক্ষার কিছু বিষয়ে সমানভাবে দায়বদ্ধ। রাজ্য প্রধানত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার গঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্র শিক্ষার গুণগত চরিত্রগত এবং উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা এবং উচ্চতর গবেষণার মান নির্ধারণের কাজে দায়বদ্ধ।

কেন্দ্র এবং রাজ্য তাদের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের সংস্থা স্থাপন করেছে। আমরা এই অধ্যায়ে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত কিছু মুখ্য সংস্থার বিষয়ে জানবো।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায় পড়ার পর শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত বিষয়ে জানতে সমর্থ হবে—

★ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে।

★ MHRD, NCERT এবং NCTE-র শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবে।

★ NCERT বিভিন্ন শাখা সংগঠন সম্পর্কে জানতে পারবে।

★ NCTE, MSJ & E এবং RCI-এর গঠনতন্ত্র সম্পর্কে জানতে পারবে।

★ পুনর্বাসনের জন্য MSJ & E-র কার্যসাধন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

★ প্রতিবন্ধী পুনর্বাসনে RCI-এর ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবে।

২.৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (Ministry of Human Resource Development—MHRD)

কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। MHRD ভারত সরকারের হয়ে শিক্ষা এবং শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন কার্যে মুখ্য দায়িত্ব বহন করেন। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এটি 'Ministry of Education' নামে পরিচিত ছিল। এই Ministry of Education ৯টি বিভাগ নিয়ে গঠিত—

১। প্রশাসন।

২। মৌলিক (Elementary) এবং বুনিয়াদী (Basic) শিক্ষা।

৩। মাধ্যমিক শিক্ষা।

৪। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা।

৫। শরীর শিক্ষা (Physical Education) এবং বিনোদন।

৬। হিন্দী।

৭। বৃত্তি (Scholarship)।

৮। গবেষণা এবং প্রকাশন।

৯। সমাজকল্যাণ।

১৯৮৭ সালে শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারণের উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় রাজীব গান্ধী (Ministry of Education)-এর নামকরণ করেন মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (MHRD)। এটি সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির জন্য মানব সম্পদের উন্নয়ন করা। স্বাভাবিকভাবে মানব সম্পদের বিকাশ ঘটে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে। সেই কারণে ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। একই কারণে District Institutes of Education & Training (DIETs), Institutes of Advanced Studies in Education (IASEs) এবং Colleges of Teacher Education (CTEs) তৈরী হয়েছিল।

২.৩.১ শিক্ষাক্ষেত্রে MHRD-র ভূমিকা : (Role of MHRD in the Field of Education)

MHRD-র অনেক বিভাগ আছে যাদের মধ্যে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রধান বিভাগ হল শিক্ষা বিভাগ (Department of Education) যার মাধ্যমে MHRD নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করেন।

★ **পরিকল্পনা গ্রহণ :** MHRD সুনির্দিষ্ট শিক্ষামূলক পরিকল্পনা তৈরী করে যা দেশের সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়।

★ **শিক্ষামূলক পুনর্গঠন :** যখনই শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয় তখনই কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন কমিশন গঠন করেন। এইসব কমিশন বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ এবং মতামত পোষণ করেন এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্য সরকার কাজ করেন।

★ **শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ :** এটি কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম দায়িত্ব দেশের সর্বত্র যাতে একই মানের শিক্ষা প্রদান হয় তা সুনিশ্চিত করা MHRD-র অন্যতম কাজ।

★ **শিক্ষায় অর্থবরাদ্দ :** শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও রাজ্য সরকারকে পূর্ণ বা আংশিক আর্থিক সহায়তা করা কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ। এই অনুদান এবং সহায়তা শিক্ষার বিস্তার এবং গুণগত মান বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচী এবং পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হয়।

★ **তথ্য সরবরাহ :** শিক্ষার অগ্রগতি এবং বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা এবং জার্নাল প্রকাশ করে।

★ **শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন :** সরকারী নীতি শিক্ষামূলক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী রূপায়ণের উদ্দেশ্যে জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। যেমন—NCERT, NCTE প্রভৃতি।

★ **নির্দেশদান :** শিক্ষাক্ষেত্রের প্রধান হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য ও অন্যান্য সংস্থাগুলিকে শিক্ষার উৎকর্ষ এবং মান বজায় রাখার জন্য নানা নির্দেশ দিয়ে থাকে।

★ **সমান সুযোগ সৃষ্টির জন্য সাহায্য :** সমাজের বিভিন্ন স্তরের জন্য বিশেষ করে অনগ্রসর এবং দুর্বল সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ তৈরী করা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য। এই উদ্দেশ্য MHRD বৃত্তি প্রদান এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা মঞ্জুর করে থাকে।

★ **কর্মরতদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা :** নির্দিষ্ট সময় অন্তর অথবা প্রয়োজনানুসারে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য MHRD নানা প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে। যেমন, প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য DIETs, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য CTEs, সিনিয়র সেকেণ্ডারী শিক্ষকদের জন্য IASES।

এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যালয় শিক্ষা (ফর্মাল এবং নন-ফর্মাল), উচ্চতর শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, কর্মমূলক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, বালিকাদের জন্য শিক্ষা, কর্মরত শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ, অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। MHRD প্রধানত বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তাদের রূপায়ণ, শিক্ষায় অর্থবরাদ্দ, শিক্ষার উৎকর্ষ নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

২.৩.৩ জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় (National Open School–NOS) :

এটি ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে MHRD-র অধীন একটি স্বশাসিত এবং স্বীকৃত সোসাইটি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর প্রি-ডিগ্রী কোর্স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ এবং সার্টিফিকেট প্রদানের পূর্ণ অধিকার আছে।

NOS উৎসাহী শিক্ষার্থীদের ফাউণ্ডেশন, সেকেণ্ডারী এবং সিনিয়র সেকেণ্ডারী কোর্সের পড়ার জন্য যথেষ্ট সুযোগ তৈরী করেছে। NOS নিজের মত করে নিজের পছন্দ মত পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে।

২.৩.৩ ঠিকানা ঃ

(ক) Department of Secondary Education & Higher Education
A1/W 3 Curzon Road Barracks, Kasturba Gandhi Marg.
New Delhi-110 001 (India)

(খ) অফিসের ঠিকানা
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (ভারত সরকার)
শাস্ত্রী ভবন, ডাঃ রাজেন্দার প্রসাদ রোড,
নয়া দিল্লী-১১০ ০০১ (ইণ্ডিয়া)
ফ্যাক্স-৯১-১১-৩৩৮১ ৩৫৫। টেলেক্স-৩১-৬১ ৩৩৬।

২.৩.৪ জাতীয় শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ (National Council of Education Research and Training--NCERT) :

তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাতে (১৯৬১-৬৬) জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল। যা শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ প্রসারণের উদ্দেশ্যে এবং যা বিদ্যালয় শিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে ১লা সেপ্টেম্বর সংস্থা নিবন্ধীকরণ আইন XXI, ১৮৬০ অনুযায়ী NCERT স্থাপিত হয়েছিল। এর প্রধান কার্যালয় নয়া দিল্লী। এটি ভারত সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পোষিত স্বশাসিত সংস্থা।

NCERT-র মাথায় আছেন ডাইরেক্টর (যিনি যুগ্ম ডাইরেক্টর, প্রফেসর, রিডার এবং লেকচারারদের সাহায্য পান)। যিনি ভারত সরকারের MHRD-র 'Department of Education'-র উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন এবং বিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু এবং সমস্যা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে সাহায্য এবং উপদেশ প্রদান করেন।

২.৪.১ NCERT-র সংগঠক উপাদান ঃ (constituents of NCERT)

বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য NCERT তার বিভিন্ন শাখা সংগঠনের মাধ্যমে নানা প্রকার শিক্ষা বিষয়ক এবং প্রযুক্তিগত নানা সাহায্য করে থাকে—

(ক) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ্ এডুকেশন (NIE) নয়া দিল্লী—(NIE) পুনরায় বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে গঠিত। যাদের মাধ্যমে NIE আদর্শ পাঠ্যক্রমের গবেষণা ও তার উন্নয়ন এবং নির্দেশদানমূলক বিষয়বস্তু তৈরীর কাজ করে থাকে। এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশসাধন করা। NIE-এর বিভিন্ন বিভাগগুলি হল—

(১) ডিপার্টমেন্ট অফ্ প্রি-স্কুল এ্যাণ্ড এলিমেন্টারী এডুকেশন (DPSEE)—এটি মুখ্যত প্রি-স্কুল ও এলিমেন্টারী শিক্ষার বিষয় এবং সমস্যা নিয়ে কাজ করে। এছাড়া গবেষণা, স্টাডি ম্যাটেরিয়ালের বিকাশ প্রভৃতি নিয়ে কাজ করে।

(২) ডিপার্টমেন্ট অফ্ এডুকেশন ইন নন-ফর্মাল এ্যাণ্ড অল্টারনেটিভ স্কুলিং (DENFAS)—এটি শিক্ষা ক্ষেত্রের বাইরে থেকে যাওয়া এবং ছেড়ে দেওয়া শিশুদের সমস্যা এবং বিষয় নিয়ে কাজ করে। এছাড়া গবেষণা প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার মডেল উন্নয়ন এবং বিকল্প স্কুলিং নিয়ে কাজ করে।

(৩) ডিপার্টমেন্ট অফ্ এডুকেশন অফ্ গ্রুপস উইথ স্পেশাল নীডস (DEGSN)—এটি তপসিলি সম্প্রদায় ও তপসিলী উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অন্যভাবে সক্ষম এবং অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজন বিশিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা ও পরিণতি নিয়ে কাজ করে।

(৪) ডিপার্টমেন্ট অফ উইমেন স্টাডিস (DWS)—এটি বালিকা শিক্ষার সমস্যা ও পরিণতি এবং তৎসংক্রান্ত গবেষণা এবং বিকাশ নিয়ে কাজ করে।

(৫) ডিপার্টমেন্ট অফ্ এডুকেশন ইন সায়েন্স এ্যাণ্ড ম্যাথেমেটিকস (DESM)—এটি বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার সমস্যা এবং পাঠ্যক্রম, শিক্ষা নির্দেশনামূলক উপাদান ও বিজ্ঞানভিত্তিক যন্ত্রপাতির বিকাশ ও গবেষণা নিয়ে কাজ করে।

(৬) ডিপার্টমেন্ট অফ টিচার এডুকেশন এ্যান্ড এক্সটেনশন (DTEE) ঃ NCTE-র সহিত সহযোগিতায় রাজ্য/রাজ্যের নিম্নস্তরে শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাপাসিটি তৈরীর কাজ, কেন্দ্রীয় পোষিত শিক্ষক শিক্ষা স্কীমে শিক্ষামূলক সাহায্য দান এবং তৎসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করে।

(৭) ডিপার্টমেন্ট অফ্ এডুকেশন ইন সোশাল সায়েন্স এ্যান্ড হিউম্যানিটিস (DESSH) ঃ এটি সোশাল সায়েন্স ও হিউম্যানিটিস শিক্ষার পরিণাম ও সমস্যা এবং আদর্শ পাঠক্রম ও নির্দেশনামূলক উপাদানের গবেষণা ও বিকাশ নিয়ে কাজ করে।

(৮) ডিপার্টমেন্ট অফ্ এডুকেশনল সাইকোলজি এ্যান্ড ফাউণ্ডেশন অফ্ এডুকেশন (DEPEE) ঃ এই বিভাগ শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক এবং সামাজিক সম্পর্ক,তুলনামূলক শিক্ষা এবং তাদের স্কুলে শিক্ষার প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করে।

(৯) ডিপার্টমেন্ট অফ্ এডুকেশনাল মেজারমেন্ট এ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন (DEME) ঃ এটি প্রধানত স্কুল শিক্ষার পরিমাপ ও মূল্যায়ন এবং তৎসংক্রান্ত গবেষণা এবং বিকাশসাধন কার্যে জড়িত।

(১০) ডিপার্টমেন্ট অফ্ এডুকেশনাল সার্ভে এ্যান্ড ডাটা প্রসেসিং (DESDP) ঃ এটি গবেষণা, মাসিক শিক্ষামূলক পত্রিকা প্রকাশন এবং সর্বভারতীয় শিক্ষামূলক সার্ভে করে থাকে।

(১১) ডিপার্টমেন্ট অফ্ এডুকেশনাল রিসার্চ এ্যান্ড পলিসি পারসপেকটিভস (DERPP) ঃ এটি বিশেষভাবে স্কুল শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষানীতির উন্নতিসাধনের জন্য গবেষণার কাজে যুক্ত।

(১২) ডিপার্টমেন্ট অফ্ কম্পিউটার এডুকেশন এ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল এইডস (DCETA) ঃ এই বিভাগটি কম্পিউটার শিক্ষার পরিণাম, সমস্যা এবং তৎসংক্রান্ত গবেষণা ও আধুনিক কারিগরী শিক্ষা সহায়ক যন্ত্রপাতির বিকাশসাধনের কাজে যুক্ত।

(১৩) প্ল্যানিং, প্রোগ্রামিং, মনিটরিং এ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ডিভিসন (PPMED) ঃ শিক্ষামূলক কর্মসূচী তৈরীর মধ্যে সমন্বয়সাধন, কর্মসূচীর রূপায়ণের উপর নজরদারী এবং টার্গেট দলের দ্বারা কর্মসূচী কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তার মূল্যায়ন করে থাকে।

(১৪) ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ডিভিশন (IRD) ঃ বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপন করা।

(১৫) প্রকাশন বিভাগ পাব্লিকেশন ডিভিশন (PD) ঃ এটি প্রধানত স্কুল স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন, নির্দেশদানমূলক এবং পরিপূরক শিক্ষা উপাদান ও গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশনা করে।

(১৬) ডিভিসন অফ্ লাইব্রেরী ডকুমেন্টেশন এ্যান্ড ইনফর্মেশন (DLDI) ঃ এটি শিক্ষামূলক প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ ও তার পরিবেশন এবং গ্রন্থাগার সার্ভিস প্রদান করে।

(খ) কেন্দ্রীয় শিক্ষামূলক কারিগরী প্রতিষ্ঠান [(সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব্ এডুকেশন্যাল টেক্নোলজি (CIET)] ঃ এটি মুখ্যত শিক্ষায় আধুনিকতম প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং শিক্ষামূলক মিডিয়া সম্পর্কিত গবেষণা, উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, উৎপাদন, এক্সাটেনশানের কাজ করে থাকে। এছাড়াও 'State Institute of Educational Technology' (SIETs)-কে কারিগরী ও শিক্ষামূলক গাইডেন্স ও সাহায্য প্রদান করে থাকে।

(গ) পণ্ডিত সুন্দরলাল শর্মা কেন্দ্রীয় কর্মমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান [Pandit Sunderlal Sharma Central Institute of Vocational Education (PSSCIVE), Bhopal] ঃ এটি বিদ্যালয় স্তরে কর্মমূলক শিক্ষার গবেষণা ও উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে।

(ঘ) আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (Regional Institutes of Education--RIEs) ঃ RIE বিদ্যালয় স্তরে কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্য এবং জেলা স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য প্রদান করে। আজমীর, ভূপাল, ভুবনেশ্বর, মাইসোর এবং ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে শিলং-এ North-East Regional Institute of Education (NE-RIE) স্থাপিত হয়। NE-RIE উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলি আসাম, অরুণাচলপ্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা এবং সিকিমে শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তা পূরণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে।

(ঙ) রাজ্যে ক্ষেত্র উপদেষ্টার অফিসসমূহ (Field Advisor's offices in the states) ঃ NCERT-র ফিল্ড অফিসগুলির বেশীর ভাগ রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থিত। এই অফিসগুলি স্কুল শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় এবং সমস্যা নিয়ে রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ এবং তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়সাধনের কাজ করে এবং তাদের NCERT-র নানান কর্মসূচী ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করে।

২.৪.২ শিক্ষাক্ষেত্রে NCERT-র অবদান (Role of NCERT in the Field of Education) :

NCERT বিভিন্ন কাজকর্ম এবং অনুষ্ঠান সূচী স্কুল শিক্ষা ও শিক্ষক শিক্ষায় পরিবর্তনশীল জাতীয় চাহিদার পূরণের স্বার্থে পরিচালিত হয়।

★ গবেষণা (Research) ঃ জাতীয় পর্যায়ের একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষক শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা করে। গবেষণা ও গবেষণার জন্য সাহায্য এবং শিক্ষামূলক গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে গবেষণামূলক কাজের জন্য আর্থিক সহায়তা ও শিক্ষামূলক গাইডেন্স প্রদান করে।

★ উন্নয়ন (Development) ঃ স্কুল শিক্ষার বিভিন্ন স্তরকে পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করার উদ্দেশ্যে স্কুল শিক্ষার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী যেমন, পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন, সংশোধন ও নবীকরণ নিয়ে কাজ করে এবং নির্দেশনামূলক বিষয়বস্তু।

★ প্রশিক্ষণ (Training) ঃ NCERT প্রি এবং ইন সার্ভিস শিক্ষকদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং বিভিন্ন কর্মমূলক শিক্ষা, শিক্ষাপ্রযুক্তি এবং বিশেষ শিক্ষা স্তরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

★ সংযোজন (Extension) ঃ NCERT রাজ্য স্তরের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতায় শিক্ষক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক, পাঠ্যপুস্তক লেখক এবং অন্যান্যদের সহায়তা প্রদান করেন। সংযোজনমূলক কাজের অঙ্গ হিসাবে কনফারেন্স, সেমিনারের আয়োজন করে।

★ প্রকাশনা ও বন্টন (Publication & Dissemination) ঃ NCERT প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনা করে। এছাড়াও ট্রেনী টিচার, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং কর্মরত শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনামূলক বিষয়বস্তু প্রকাশ করে। এছাড়াও গবেষণা রিপোর্ট, পত্রিকা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষামূলক তথ্য প্রদান করে।

★ কর্মসূচীর আদানপ্রদান (Exchange Programmes) ঃ NCERT নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন, UNICEF, UNESCO, বিশ্বব্যাঙ্ক প্রভৃতির সঙ্গে নিকট সম্পর্ক রক্ষা করে চলে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যের আদানপ্রদান করে থাকে। এছাড়া NCERT বিদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিচরণকারী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

উপরে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য ছাড়াও NCERT মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে স্কুল শিক্ষা বিষয়ে, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে তার বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়ে থাকে। NCERT ভালো সমন্বয়কারী হিসাবে SCERT, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এবং অন্যান্য বাইরের সংস্থার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে।

২.৪.৩ ঠিকানা ঃ

NCERT
শ্রীঅরবিন্দ মার্গ
নয়া দিল্লী-১১০ ০০৬, ইণ্ডিয়া।

২.৫ জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পর্ষদ (National Council for Teacher Education–NCTE)

ভারত সরকার ১৯৯৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বরে (by an Act of Parliament, No. 73, 1993) শিক্ষা মন্ত্রীকে সভাপতি করে NCTE প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশের সর্বত্র শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পিত ও সমন্বিত উন্নয়ন, নিয়ম এবং মান ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ। জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের সর্বত্র শিক্ষক প্রশিক্ষণের সমস্ত কোর্স এবং প্রতিষ্ঠানের আইনি বৈধতা ও অনুমোদন দান করা হল NCTE-র অন্যতম দায়িত্ব।

NCTE একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। এটি শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার সমস্ত বিষয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুল স্তরে শিক্ষা প্রদান, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, আংশিক সময়ের শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং দূরশিক্ষা কোর্সের শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

২.৫.১ NCTE-র গঠনতন্ত্র : (Organisational Structure of NCTE)

এর প্রধান কার্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত এবং ৪টি আঞ্চলিক কমিটি ভুবনেশ্বর, ব্যাঙ্গালোর, ভূপাল এবং জয়পুরে অবস্থিত। প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বে আছেন চেয়ারম্যান এবং প্রতিটি আঞ্চলিক কমিটির মাথায় একজন করে রিজিওন্যাল ডাইরেক্টর আছেন। প্রধান এবং আঞ্চলিক কমিটির প্রশাসনিক এবং শিক্ষা শাখা আছে। প্রশাসনিক শাখা অর্থ, এস্টাব্লিশমেন্ট এবং আইনী বিষয় নিয়ে এবং শিক্ষা শাখা গবেষণা, পাঠ্যক্রম, কো-অর্ডিনেশন, নজরদারী, পলিসি প্ল্যানিং, ইনোভেশন, ইন-সার্ভিস প্রোগ্রাম, গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন এবং বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে।

২.৫.২ শিক্ষাক্ষেত্রে NCTE-র অবদান : (Role of NCTE in the Field of Education)

পরিকল্পিত এবং সমন্বিতভাবে শিক্ষক শিক্ষণের উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং এর মান নিয়ন্ত্রণ ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কাজ করে থাকে।

★ শিক্ষক শিক্ষার উপর সমীক্ষা (Survey) করে এবং তার ফল প্রকাশ করে।

★ শিক্ষক শিক্ষণের উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী গ্রহণের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, UGC এবং স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুপারিশ করে।

★ শিক্ষক শিক্ষণের উন্নয়নের জন্য সংযোগ সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

★ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি পর্যালোচনা এবং গাইড লাইন প্রদান করে।

★ শিক্ষক শিক্ষণের কোন বিশেষ ধরনের কোর্সে ভর্তি অথবা প্রশিক্ষণের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নির্বাচনের পদ্ধতি, কোর্সের সময়কাল, কোর্সের বিষয়বস্তু প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ম তৈরী করে।

★ কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে নতুন বিষয়/ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য ফিজিক্যাল গঠন এবং নির্দেশনামূলক শিক্ষাদানের সুযোগসুবিধা, স্টাফেদের যোগ্যতা প্রভৃতি সম্পর্কে চালকনীতি প্রদান করে।

★ শিক্ষক শিক্ষণ পরীক্ষার ভর্তি এবং মান নির্ধারণ করে।

★ শিক্ষক শিক্ষণের নানান ক্ষেত্রে নতুনত্ব এবং গবেষণার কাজ করে তার ফল প্রকাশ করে।

★ এটি কাউন্সিল নির্ধারিত বিভিন্ন নিয়মনীতির চালকনীতি এবং মানের বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে।

★ NCTE শিক্ষক শিক্ষণের বিভিন্ন স্তরের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করে। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে এবং নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করে।

★ শিক্ষক শিক্ষার বাণিজ্যকরণ বন্ধ করতে সমস্ত ধরনের প্রয়োজনীয় প্রতিবিধান গ্রহণ করে।

★ এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রদত্ত এই ধরনের যে কোন কাজ করে থাকে।

২.৫.৩ ঠিকানাসমূহ ঃ

(ক) প্রধান কার্যালয় ঃ

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পর্ষদ (NCTE)
(স্বশাসিত বোর্ড)
সি ২/১০, সফদরজং ডেভেলাপম্যান্ট এরিয়া,
শ্রীঅরবিন্দ মার্গ, নয়া দিল্লী-১১০ ০১৬
দুরভাষ ঃ ২৬৯৬-৫১৩৪, ২৬৯৬-৭৬৪৮, ২৬৯৬-৭৫১৭, ২৬৫৬-১৩৪৯
ফ্যাক্স ঃ ৯১-১১-২৬৯৬-৮৪৯২
ই-মেল ঃ ncte@de13.vsnl.net.in

(খ) আঞ্চলিক কমিটিসমূহ—নিচের ঠিকানাগুলি থেকে যে কোন কোর্স বা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি সম্বন্ধে জানতে পারা যায়।

★ আঞ্চলিক আধিকারিক
উত্তর আঞ্চলিক কমিটি (NCTE)
এ-৪৬, শান্তিপথ, তিলক নগর, জয়পুর-৩০২ ০০৪
টেলিফ্যাক্স ঃ ০১৪১-৬২০, ১১৬, ৬২৩ ৫০১
(এক্তিয়ার ঃ দিল্লী, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, চণ্ডীগড়)।

★ আঞ্চলিক আধিকারিক
দক্ষিণ আঞ্চলিক কমিটি (NCTE)
১২৫, ইনফ্যান্ট্রি রোড, ব্যাঙ্গালোর-৫৬০ ০০১
টেলিফ্যাক্স ঃ ০৮০-২২৮৬-০৯৬২, ২২৮৬-১৩৬৯
(এক্তিয়ার ঃ অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, লাক্ষাদ্বীপ, পণ্ডিচেরী)।

★ আঞ্চলিক আধিকারিক
পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটি (NCTE)
মানসভবন (A.I.R.-এর নিকটে)
শ্যামলা হিলস, ভুপাল-৪৬২ ০০২
টেলিফ্যাক্স ঃ ০৭৫৫-৫৩০-৯১২
(এক্তিয়ার ঃ গোয়া, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, দাদরা ও নগর হাভেলী, দমন ও দিউ)।

★ আঞ্চলিক আধিকারিক
পূর্ব আঞ্চলিক কমিটি
১৫, নীলকণ্ঠ নগর,
নয়া পল্লী,
ভুবনেশ্বর-৭৫১ ০১২
টেলিফ্যাক্স ঃ ০৬৭৪-৪১৫ ৭৯৩, ৪১৪৮৭৩

(এক্তিয়ার ঃ অরুণাচলপ্রদেশ, আসাম, বিহার, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ওড়িষ্যা, সিকিম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

২.৬ সামাজিক ন্যায় ও অধিকার প্রদান মন্ত্রক (Ministry of Social Justice and Empowerment—MSJ & E)

ভারত একটি কল্যাণকারী রাষ্ট্র হিসাবে তার জনগণের প্রতি বিশেষ করে অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ এবং উন্নয়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। ভারতীয় সংবিধানের ৩৮, ৩৯ এবং ৪৬ নং ধারা হল এই অঙ্গীকারের অন্যতম প্রামাণ্য নথি।

অতীতে কল্যাণমুখী কর্মসূচী ছিল মূলত আরোগ্যদায়ক এবং রক্ষণাত্মক। কিন্তু বর্তমানে এটি সামাজিক ন্যায় এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত, সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর তপশিলী জাতি ও উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘু, বয়স্ক পথশিশু, মাদকাসক্ত এবং অক্ষমদের সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত। যাতে সামাজিক ন্যায় এবং সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

MSJ & E প্রতিবন্ধীদের সার্বিক বিকাশের জন্যও দায়বদ্ধ। সমাজের শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত এবং অবিচারের শিকার হওয়া মানুষের জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে একইরকম সুযোগের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করাই MSJ & E-র মুখ্য উদ্দেশ্য। Social Defence Bureau নানা ধরনের নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। যাতে অনগ্রসর শ্রেণীসমষ্টি শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনধারণ করতে পারে এবং দেশের একজন অপরিহার্য নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। ভারতের কল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিটি নীতি, পরিকল্পনা আইন এবং প্রতিষ্ঠান অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের উন্নয়নের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে গঠিত এবং পরিচালিত।

২.৬.১ পুনর্বাসন দৃষ্টিভঙ্গী (Approach of Rehabilitation) :

পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য তালিকাতে যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। সরকার অনেক পরিকল্পনা, কর্মসূচী এবং প্রজেক্ট রূপায়ণ করেছে। যা MSJ & E-র প্রতিবন্ধী বিভাগের "infrastructural network"-এর মদতে সংঘটিত হয়েছে।

এই পরিকাঠামোগুলি হল—

(ক) ★ রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সংস্থা (NIVH), দেরাদুন।

★ রাষ্ট্রীয় অস্থি-বিকলাঙ্গ সংস্থা (NIOH), কলকাতা।

★ রাষ্ট্রীয় মানসিক প্রতিবন্ধী সংস্থা (NIMH), সেকেন্দ্রাবাদ।

★ রাষ্ট্রীয় শ্রবণ প্রতিবন্ধী সংস্থা (NIHH), মুম্বাই।

★ জাতীয় পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NIRTAR), কটক।

★ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান (IPH), নয়া দিল্লী।

(খ) ভারতীয় পুনর্বাসন পর্ষদ (RCI)।

(গ) ন্যাশনাল হ্যান্ডিক্যাপড ফাইনান্স এ্যান্ড ডেভেলপম্যান্ট কর্পোরেশন (NHFDC)।

(ঘ) আর্টিফিসিয়াল লিম্বস ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া (ALMCOI)।

(ঙ) ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর ওয়েলফেয়ার অফ্ পার্সনস উইথ অর্টিজম, সেরিব্রাল পলসি, মেন্টাল রিটার্ডেশন এ্যান্ড মাল্টিপল ডিসএবিলিটিস।

(চ) জেলা পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলি (DRCs)।

(ছ) আঞ্চলিক পুনর্বাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি (RRTCs)।

(জ) অফিস অফ্ দ্য চীফ্ কমিশনার ফর পার্সনস উইথ ডিসএবিলিটিস।

২.৬.২ অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসন (Rehabilitation of Persons with Disability) :

(ক) ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর ওয়েলফেয়ার অফ্ পারশনস উইথ অটিজম, সেরিব্রাল পলসি, মেন্টাল রিটার্ডেশন এ্যান্ড মাল্টিপল ডিসএবিলিটিস—১৯৯৯ এই ট্রাস্ট স্বাধীনভাবে কাজ করে। যাদের কোনো প্রকার পারিবারিক সাহায্য করার মতো কেউ থাকে না তাদের বিশেষ যত্ন নেয়। এই সংঘ পরিবারকে শক্তিশালী করতে চেষ্টা করে এবং এই ধরনের প্রতিবন্ধীদের পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই সংঘ যে কোন প্রকার গ্রান্টস এবং ডোনেশান গ্রহণ করতে পারে, যা আয়কর মুক্ত। বিশদভাবে জানার জন্য যোগাযোগ করুন—

Joint Secretary & Chief Executive Officer,
Room No. 4 'B' Wing,
4th Floor, Lok Nayak Bhawan,
New Delhi
Phone : 91-11-24648921

(খ) প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় পুরস্কার ঃ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ৩রা ডিসেম্বর। এই দিনে ১৯৬৯ সাল থেকে MSJ & E বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় পুরস্কার দিয়ে থাকে। প্রতিবন্ধীদের সর্বোচ্চ চাকরী প্রদানকারী, বিশিষ্ট কর্মী, সৃজনশীল প্রতিবন্ধী, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই ধরনের পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এই ধরনের কাজ অক্ষমদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের সমাজের মূলস্রোতে ফেরানোর উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

Under Secretary,
MSJ & E
Room No. 622,'A' Wing,
6th Floor Shastri Bhawan, New Delhi
Ph. 91-11-2338 6314.

(গ) RCI : অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রশিক্ষণ নীতি এবং কর্মসূচীর নিয়ন্ত্রণ, প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনে নিযুক্ত প্রফেশনালদের ন্যূনতম শিক্ষাগত মান এবং প্রশিক্ষণ নির্ধারণ করে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে RCI সম্বন্ধে বিশদভাবে পড়ব।

Member Secretary
RCI
B-22 Qutub Institutional Area
New Delhi-110016
Ph : 91-11-26532408, 2685 6892
Fax : 91-11-26534291
E-mail : rehabstd@nde. vsnl.net.in.

(ঘ) জেলা পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলি DRCs.

(ঙ) রিলিফ অ্যাসিস্টেনশ আণ্ডার বাইল্যাটারাল এগ্রিমেন্ট।

(চ) অক্ষমদের জন্য কম্পোজিট রিজিওন্যাল সেণ্টার স্থাপন।

(ছ) অক্ষমদের কাজের সুযোগ তৈরী করা।

২.৬.৩ MSJ & E সাংগঠনিক ছক : (Organisational Chart of MSJ&E)

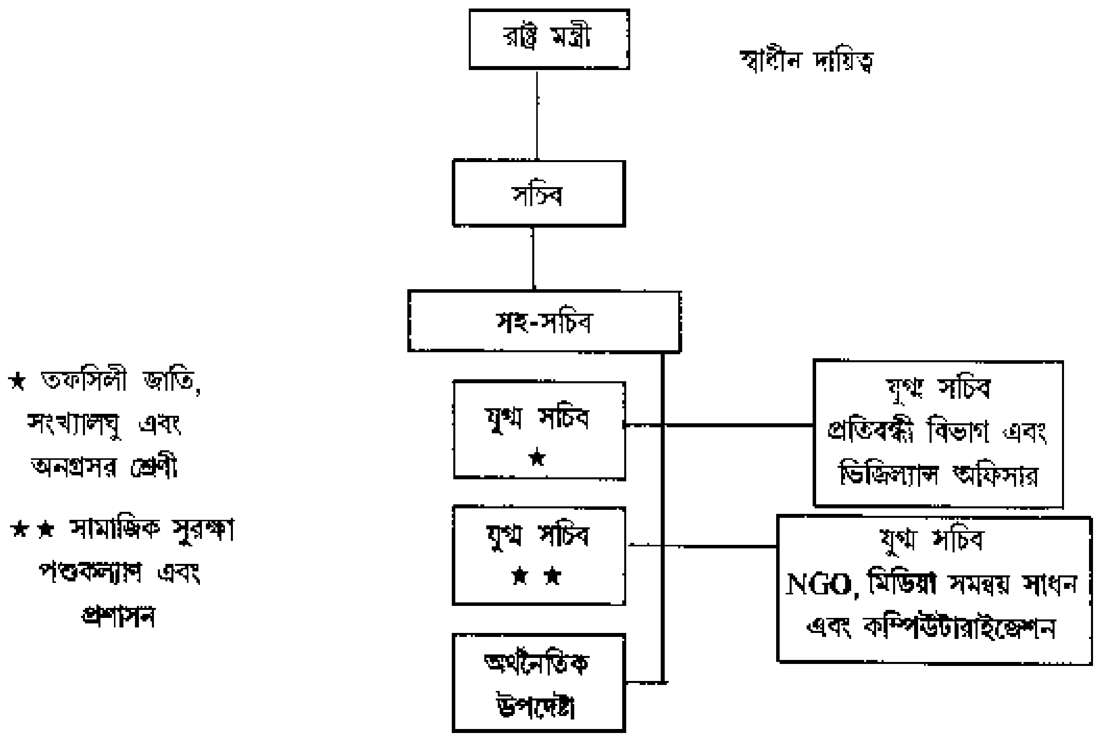

২.৬.৪ ঠিকানা : (Address)

সামাজিক ন্যায় ও অধিকার প্রদান, মন্ত্রক
শাস্ত্রী ভবন, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোড,

নয়া দিল্লী-১১০ ০০১
ফ্যাক্স ঃ ৯১-১১-২৩৩৮৪৯১৮

২.৭ জাতীয় পুনর্বাসন পর্যদ (MSJ & E- র অধীন স্বশাসিত সংস্থা) Rehabilitation Council of India)

১৯৮১ সালকে International Year of the Disabled Persons (IYDP) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তখন থেকেই ভারত সরকার প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের অভাবে পুনর্বাসনের কাজ খুবই কঠিন। কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পৃথকভাবে এই ক্ষেত্রে যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জারী রেখেছিল তাদের মধ্যে কোন একই ধরনের পাঠ্যসূচী বা পাঠ্যক্রম ছিল না। এই কারণে ভারত সরকার সংস্থা নিবন্ধকরণ আইনে (১৮৬০) ১৯৮৬ সালের ৬ই মে Rehabilitation Council of India গঠন করেন এবং ১৯৯২ সালের RCI Act 34 বলে আইনী বৈধতা পায়। যা ১৯৯৩ সালের ২২ জুন কার্য শুরু করে।

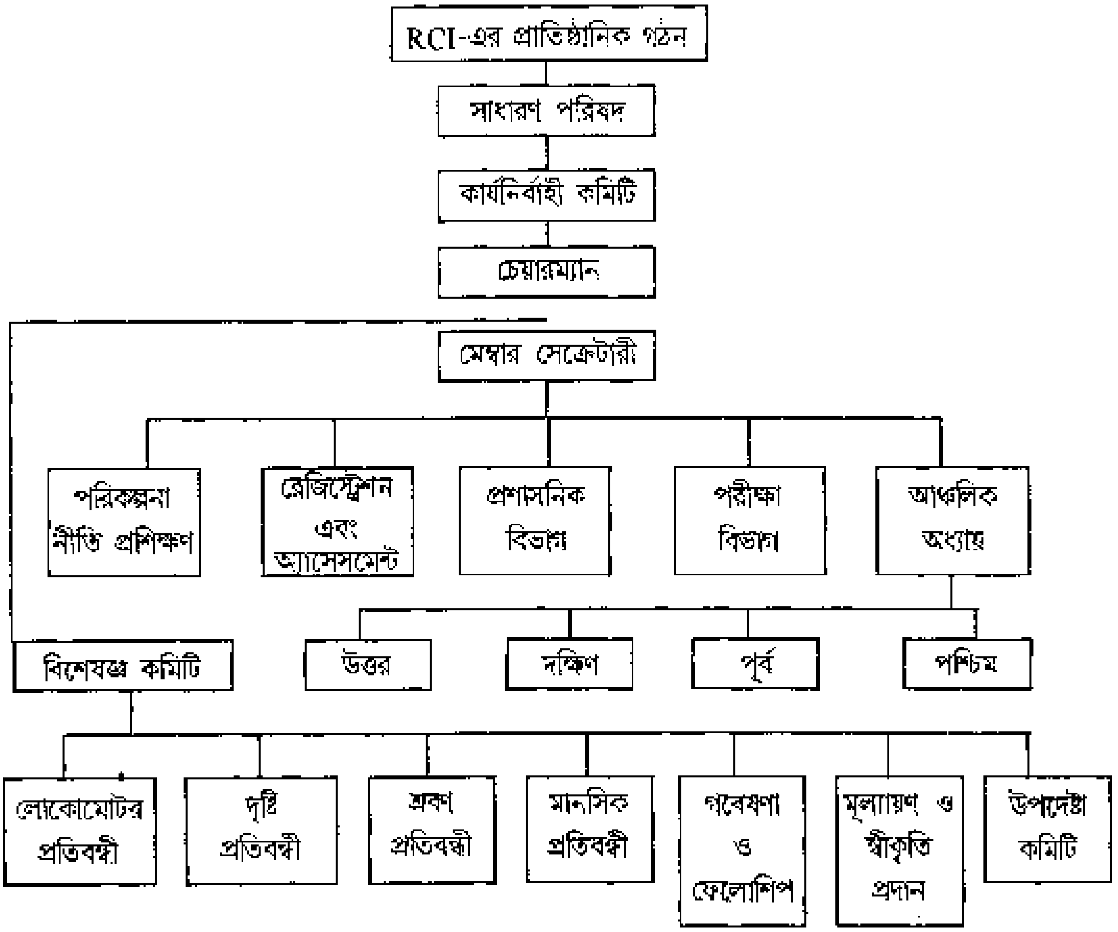

২.৭.১ পুনর্বাসন ক্ষেত্রে RCI-এর অবদান ঃ (Role of RCI in the Field of Rehabilitation)

মূল এবং সর্বশেষ লক্ষ্য হল পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় মানব ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য RCI নিম্নলিখিত কাজ করে থাকে -

★ পুনর্বাসন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নীতি ও কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে।

★ পুনর্বাসন কাজে যুক্ত ব্যক্তিত্ব ও প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণের পাঠ্য বিষয়ের নাম বর্ধন করা।

★ দেশের সর্বত্র একই ধরনের শিক্ষা এবং শিক্ষার ন্যূনতম মান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম মান নির্দিষ্ট করে।

★ দেশের সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ন্ত্রণ করে।

★ যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসন ক্ষেত্রে ডিগ্রী/ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান করে তাদের স্বীকৃতি দেয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের মান বা সুযোগ উপযুক্ত না হলে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে।

★ এটি বৈদেশিক ডিগ্রী/ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেটকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

★ এটি যাদের স্বীকৃত পুনর্বাসন যোগ্যতা আছে তাদের তালিকাভুক্ত করে এবং স্বীকৃতি দেয় এর ফলে ভারতের যে কোন জায়গায় ঐসব ব্যক্তি কাজ করতে পারেন।

★ এটি পুনর্বাসন এবং বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার কাজে উৎসাহিত করে।

★ এটি নিয়মিতভাবে দেশ এবং বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পুনর্বাসন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে।

★ এটি প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনে যুক্ত নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুগ্মভাবে পুনর্বাসন শিক্ষায় উৎসাহিত করে।

এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য RCI নিজে কোন প্রশিক্ষণ কার্য বা কোর্স পরিচালনা করে না। কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানব সম্পদ এবং মানব শক্তির বিকাশের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনা করে।

RCI জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশিক্ষণের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স-এর আয়োজন করে।

২.৭.২ বিভিন্ন পেশাদারী সংস্থার সঙ্গে RCI-এর যোগাযোগ ঃ (Linkages with various Professional Agencies)

নতুন পরিকল্পনার বিকাশ এবং আধুনিকতম প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে RCI নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের নানা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে। যা সহযোগিতা বৃদ্ধি, সাম্প্রতিকতম জ্ঞানার্জন এবং সাহিত্যের আদানপ্রদানে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

(ক) অন্তর্দেশীয় সংযোগ ঃ

★ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

★ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে।

★ UGC-র সঙ্গে।

★ জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ (NCERT)-এর সঙ্গে।

★ জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা পরিষদ (NCTE)।

★ ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (IGNOU)।

★ পলিটেকনিক্‌সগুলির সঙ্গে।

★ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির সঙ্গে।

★ মধ্যপ্রদেশ ভোজ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ভূপাল)-এর সঙ্গে।

★ নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (কোলকাতা) এর সঙ্গে।

★ বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনের সঙ্গে।

(খ) আন্তর্দেশীয় সংযোগ—

★ পিটস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে।

২.৭.৩ বর্তমান প্রসারণ ঃ (Current Ex-panions)

★ পুনর্বাসন এবং বিশেষ শিক্ষায় অধিকতরভাবে গবেষণার জন্য উৎসাহিত করা।

★ দূর শিক্ষা মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করা। এই উদ্দেশ্যে RCI মধ্যপ্রদেশ ভোজ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (MPBOU)-এর সঙ্গে সহযোগিতায় B.Ed (Special Education) শুরু করেছে। এই কোর্সের মেয়াদ ২৪ মাস এবং মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান যারা integrated/inclusive বা বিশেষ স্কুলে কাজ করবে। এই কার্যক্রম দৃষ্টিহীন, শ্রবণ, মানসিক ও অঙ্গসংস্থানগত প্রতিবন্ধী এবং সেরিব্রাল পলসির মতো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে কোন ব্যক্তি (ক) স্বীকৃত স্নাতক ডিগ্রী, (খ) প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজে দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকলে উপরিউক্ত যে কোন বিষয় নিয়ে B.Ed (Special Education) প্রশিক্ষণ দেশের ৫১টি পঠন কেন্দ্র থেকে নিতে পারে।

২.৭.৪ ঠিকানা ঃ (Address)

মেম্বার সেক্রেটারী
ভারতীয় পুনর্বাস পরিষদ
বি-২২ কুতুব ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া
নয়া দিল্লী-১১০ ০১৬
দূরভাষ ঃ ০১১-২৬৫৩২৪০৮, ২৬৮৫৬৮৯২,২৬৫৩২৩৮৪
ফ্যাক্স ঃ ০১১-২৬৫৩৪২৯১

E-mail : rehabstd@nde.vsnl.net.in.
ওয়েব সাইট : www.rehabcouncil.nic.in

২.৮ এককের সারাংশ (Unit Summary)

★ ১৯৭৬ সাল থেকে শিক্ষা কেন্দ্র এবং রাজ্যের যৌথ দায়িত্বে চলে আসে।

★ যেখানে রাজ্য প্রধানত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার গঠনতন্ত্র নিয়ে কাজ করে এবং কেন্দ্রের প্রধান দায়িত্ব হল শিক্ষার গুণগত ও চরিত্রগত মান নির্ধারণ এবং উচ্চতর শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা এবং উচ্চতর গবেষণার গুণগত চরিত্রগত মান নির্ধারণ।

★ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

★ জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় নমনীয়তার সহিত শিক্ষার্থীকে নিজের পছন্দ মতো নিজের মতো করে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

★ জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বিস্তারের স্বার্থে কাজ করে চলেছে।

★ জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পর্ষদ শিক্ষক শিক্ষণের পরিকল্পিত এবং সমন্বিত বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল।

★ সামাজিক ন্যায় এবং উন্নয়ন মন্ত্রক সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ, সামাজিক সুবিচার ও আত্মোন্নতি বিষয়ে কাজ করে চলেছে।

★ RCI-র মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য মানব ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা।

২.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

(১) জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

(ক) NCERT-র অধীনে।

(খ) NCTE-র অধীনে।

(গ) MHRD-র অধীনে।

(ঘ) MSJ &E-র অধীনে।

(২) মহিলা শিক্ষা বিভাগ হল—

(ক) RCI-এর সংগঠক উপাদান।

(খ) NCERT-এর সংগঠক উপাদান।

(গ) NCTE-এর সংগঠক উপাদান।

(ঘ) শিক্ষা বিভাগের সংগঠক উপাদান।

(৩) —সালকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বছর হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

(ক) ১৯৭৮ সাল।

(খ) ১৯৮১ সাল।

(গ) ১৯৪৭ সাল।

(ঘ) ১৯৯৯ সাল।

(৪) RCI-এর লক্ষ্য হল—

(ক) প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদান।

(খ) প্রতিবন্ধীদের তালিকা সংরক্ষণ।

(গ) দেশের সর্বত্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(ঘ) প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষক করা।

২.১০ বাড়ীর কাজ (Assignment)

MHRD, NCERT,NCTE, MSJ & E এবং RCI-এর মধ্যে কোনটি এবং কিভাবে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২.১১ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion/Clarification)

২.১১.১ আলোচনার সূত্রাবলি (Points for Discussion)..

....

....

২.১১.২ বিশ্লেষণের সূত্রাবলি (Points for Clarification)..

....

....

২.১২ উৎস (References/Further readings)

1. Dash, M (2000) *Education in India : Problems and Perspective,* New Delhi : Atlantic Publishers.

2. National Council for Teacher Education (1998) *Policy : Perspectives in Teacher Education : Critique and documentation.* New Delhi : NCTE Document 98/23.

3. National Council for Teacher Education (1998) *Curriculum Framework for Quality Teacher Education.* New Delhi : NCTE Document 98/30.

4. Pandey, R. S. (1998) *Educational Controversies.* Allahabad : Horizon Publishers.

5. Sharma, A.P. (1984) *Contemporary Problems of Education.* New Delhi : Vani Educational Books.

6. Sharma, R.N. and Sharma R.K. (1996) *History of Education in India.* New Delhi : Atlantic Publishers.

7. The Gazette of India (1993) *The National Council for Teacher Education Act, 1993,* New Delhi : Government of india.

একক ৩ ☐ শিক্ষামূলক পরিকল্পনা ও পরিচালনা (Planning and Management of Education)

গঠন

৩.১ ভূমিকা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার অর্থ এবং প্রকৃতি

৩.৩.১ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার প্রয়োজন

৩.৩.২ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ

৩.৩.৩ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার নীতি

৩.৪ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ

৩.৪.১ 'ইন্ট্রা-এডুকেশনাল' বহির্পাতন মডেল

৩.৪.২ জনসংখ্যা সংক্রান্ত প্রোজেকশন মডেল

৩.৪.৩ মানব ক্ষমতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী

৩.৪.৪ সামাজিক চাহিদামূলক দৃষ্টিভঙ্গী

৩.৪.৫ 'রেট অফ্ রিটার্ন' দৃষ্টিভঙ্গী

৩.৪.৬ সামাজিক সুবিচার দৃষ্টিভঙ্গী

৩.৫ শিক্ষামূলক পরিকল্পনা

৩.৫.১ কেন্দ্রীয় সরকার স্তরে

৩.৫.২ রাজ্য সরকার স্তরে

৩.৫.৩ আঞ্চলিক এবং জেলা স্তরে প্রতিষ্ঠানসমূহের

৩.৫.৪ স্থানীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানসমূহের

৩.৫.৫ ব্যক্তিগত স্তরে পরিচালনা

৩.৬ এককের সারাংশ

৩.৭ অগ্রগতির মূল্যায়ন

৩.৮ বাড়ীর কাজ

৩.৯ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

৩.১০ উৎস

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

ব্যক্তি জীবনে এবং জাতীয় জীবনে পরিকল্পনা খুবই জরুরী। এটি সমস্ত মানবের এবং সামাজিক প্রচেষ্টার অখণ্ডিত অংশ। সব মানুষ তার কোনো কাজের পরিকল্পনা করে স্পষ্টভাবে বা গোপনীয়তার সঙ্গে। এটা বলা হয় যে পরিকল্পনাহীন কাজ হয় অর্দ্ধ-সম্পূর্ণ অথবা কখনো হয় না। এমনকি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাও একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় চলে। যা আমার সময়ান্তরে তৈরী করি। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা শিক্ষামূলক কাজকর্মের পথ প্রশস্ত করে, ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুনিশ্চিত করে অধিকতর সন্তোষজনক ফল লাভে সাহায্য করে। শিক্ষা পরিকল্পনা উচ্চ এবং নিম্ন উভয়ই স্তরে করা হয়ে থাকে। উচ্চ স্তরে শিক্ষা পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষামূলক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নিম্ন স্তরে পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে স্থানীয় গ্রামীণ স্তরে। শিক্ষামূলক পরিকল্পনা স্কুল এবং শ্রেণীকক্ষেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে আমরা শিক্ষামূলক পরিকল্পনার অর্থ, বৈশিষ্ট্য পদ্ধতি এবং বিভিন্ন স্তরে এটি পরিচালনা নিয়ে আলোচনা করবো।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

শিক্ষার্থীরা—

★ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার অর্থ এবং প্রকৃতি জানতে পারবেন।

★ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন।

★ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন।

★ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি জানবেন।

★ শিক্ষা পরিচালনার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জানবেন।

★ দেশের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা পরিচালনা সম্পর্কে জানবেন।

৩.৩ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার অর্থ এবং প্রকৃতি (Meaning and Nature of Educational Planning)

আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি পরিকল্পনা হল "Plan the work and work-out the plan". Webster-এর আন্তর্জাতিক অভিধান (১৯৮১) পরিকল্পনাকে একইভাবে বর্ণনা করেছে। সেই পরিকল্পনা হল পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যপূরণের জন্য গঠিত সম্পূর্ণ নকশা বা কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট লক্ষ্য পৌঁছানোর জন্য কি, কেন এবং কিভাবে ? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয়।

Beeby (১৯৬৭)-এর মত অনুযায়ী শিক্ষামূলক পরিকল্পনা হল শিক্ষানীতি, প্রাধান্য তালিকা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার খরচ প্রভৃতি নির্ধারণে দূরদর্শিতার অনুশীলন যাতে দেশের অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সিস্টেমের বৃদ্ধি এবং দেশের ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন পূর্ণ হয়। সেইহেতু, শিক্ষামূলক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিকল্পনাকারদের নীতি এবং প্রাধান্য তালিকার নির্ধারণে দূরদর্শিতা।

Coombs (১৯৭০)-এর মত অনুযায়ী শিক্ষামূলক পরিকল্পনা হল বাস্তবোচিত, শিক্ষা-উন্নয়ন পদ্ধতির পর্যায় ক্রমিক বিশ্লেষণ যাতে শিক্ষা, সমাজ এবং শিক্ষার্থীর প্রয়োজন চাহিদা ও লক্ষ্যপূরণে আরও সক্রিয় এবং দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষা পরিকল্পনা হল বাস্তবোচিত, সম্পূর্ণ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ এবং লক্ষ্য হল শিক্ষার্থী এবং সমাজের প্রয়োজন / চাহিদা।

UNESCO এবং বিশ্বব্যাঙ্ক হল বিশ্বে শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্যোক্তা। UNESCO তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষা পরিকল্পনায় খুবই সক্রিয়। এটা সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা পরিকল্পনাকারদের প্রশিক্ষণ দেয়, গবেষণা করে, সেমিনারের আয়োজন করে, বিশেষজ্ঞ মতামত দেয় এবং রিপোর্ট প্রকাশ করে।

ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মানব সম্পদের চাহিদা, বাস্তুবিদ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় এবং বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের বিশৃঙ্খল ব্যবহার প্রভৃতির কারণে শিক্ষামূলক পরিকল্পনা আবশ্যক।

৩.৩.১ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা : (Need of Educational Planning)

(ক) প্রতিষ্ঠানের সুনিশ্চিত সাফল্যের জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বা যে কোনো প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রচেষ্টাটি কতখানি সুপরিকল্পিত তার উপর। পরিকল্পনা শিক্ষামূলক কাজের সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপাদান, ইস্যু এবং কার্যপ্রণালীকে বোঝায়। যা সাফল্য লাভ করতে সাহায্য করে।

(খ) সুনিপুণ এবং কার্যকরী পরিকল্পনা সময়,শ্রম এবং অর্থ সাশ্রয় করে। Dreor (১৯৭৬)-এর মতে পরিকল্পনা হল সময়, শ্রম এবং অর্থ সাশ্রয়কারী কাজ।

(গ) পরিকল্পনা হল সমস্যা সমাধানের ভালো পদ্ধতি। একটি সুপরিকল্পিত কার্যক্রম কোনো সমস্যা সহজে এবং সুনিপুণভাবে সমাধান করতে পারে। সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য trial ও error পদ্ধতির কোন প্রয়োজন হয় না।

(ঘ) শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির জন্য পরিকল্পনা জরুরী। যে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চালান দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ। এই কাজের জন্য অনেক মানবশক্তি এবং আর্থিক সম্পদ জরুরী। সেইহেতু পরিকল্পনা অপরিহার্য।

(ঙ) সময়ের সাথে তাল রেখে চলার জন্য পরিকল্পনা জরুরী। নানা কারণে সমাজে পরিবর্তন আসে, যেমন, আর্থিক বৃদ্ধি, শিল্পের বৃদ্ধি, বিজ্ঞানসম্মত এবং প্রযুক্তিগতে আমূল পরিবর্তন, মূল্যবোধের পরিবর্তন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রভৃতি। সময়ের সাথে সাথে এই সমস্ত পরিবর্তনের প্রয়োজনে শিক্ষাগত পরিকল্পনা জরুরী। সেইহেতু শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণালী সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সাথে সাথে পর্যালোচনা হওয়া জরুরী।

৩.৩.২ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ : (Characteristics of Educational Planning)

(ক) শিক্ষামূলক পরিকল্পনা হল একটি যুক্তিসম্মত, পর্যায়ক্রমিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এটি অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণের জন্য অনেক বিকল্পের পরীক্ষা করে সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্পটি যুক্তিসম্মত এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে বেছে নিতে সাহায্য করে।

(খ) এটি হল সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল যারা আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার সঙ্গে জড়িত। পরিকল্পনা হল তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। যারা রূপরেখা তৈরী করে এবং যারা প্রয়োগ করে তাদের প্রত্যেকেই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত।

(গ) শিক্ষামূলক পরিকল্পনায় সমাজের বা জাতীর মুখ্য উদ্দেশ্যগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন হল আমাদের দেশের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং পরিকল্পনা প্রণালীর উচিত আমাদের সংবিধানে বর্ণিত মুখ্য উদ্দেশ্য পূরণকে সুনিশ্চিত করা।

(ঘ) শিক্ষা পরিকল্পনা সর্বদা ভবিষ্যতে হতে পারে এমন সম্ভাব্য পরিবর্তনকে ধরে নিয়ে করা হয়। অপ্রাসঙ্গিক পরিবর্তন এবং প্রচেষ্টা বাদ দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়।

(ঙ) শিক্ষামূলক পরিকল্পনা শিক্ষাতন্ত্রের অসংগতি এবং দুর্বল জায়গাগুলি সূচিত করে। সেইহেতু এটি অভাবপূরণের জন্য সম্ভাব্য প্রতিবিধান সম্পর্কে পরামর্শ দেয়।

(চ) শিক্ষাগত পরিকল্পনা হল বস্তু নির্ভর এবং এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এটি তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, অন্তর্নিহিত অর্থের প্রকাশ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের মধ্যে আন্তর্সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তারপর বর্তমান সমস্যার সমাধান সম্পর্কে মত দান করে।

৩.৩.৩ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার নীতিসমূহ : (Principles of Educational Planning)

(১) পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং কার্যপ্রণালী সচেতনভাবে গঠন এবং তাদের মধ্যে সংযুক্তি পর্যায়ক্রমিকভাবে সম্পূর্ণ করা উচিত।

(২) শিক্ষামূলক পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনার অখণ্ডিত অংশ হিসাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। পরিকল্পনা সর্বদা সামাজিক এবং জাতীয় বিকাশের স্বার্থে হওয়া উচিত।

(৩) শিক্ষামূলক পরিকল্পনা সংগঠিত গবেষণা ও তার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তৈরী হওয়া উচিত। পরিকল্পনা প্রণালীর সিদ্ধান্ত সর্বদা বস্তু নির্ভর গবেষণার উপর নির্ভরশীল।

(৪) শিক্ষামূলক পরিকল্পনা হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার পরিবর্তন এবং অভিযোজনে জরুরী প্রয়োজনগুলি পূরণের জন্য আবশ্যিক।

(৫) শিক্ষামূলক পরিকল্পনা সর্বদা কার্যকরী, বাস্তববাদী এবং ব্যবহারিক। এটি কেবলমাত্র বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়।

(৬) শিক্ষামূলক পরিকল্পনা সক্রিয় এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠান এবং ইন্টারেস্ট গ্রুপকে যুক্ত করে।

(৭) শিক্ষামূলক পরিকল্পনার পরিকল্পনা প্রণালীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

(৮) শিক্ষামূলক পরিকল্পনার মানুষের প্রয়োজন পূরণে সমর্থ হওয়া উচিত।

(৯) পরিকল্পনার প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া উচিত।

(১০) এর সমাজের শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করা উচিত। পরিকল্পনা কার্য সাধনের সময় সমাজের উদ্দেশ্য মাথায় রাখা উচিত।

(১১) পরিকল্পনা প্রয়োজনভিত্তিক এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী হওয়া উচিত। সমাজের উদ্ভূত প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে সংক্ষিপ্ত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করা উচিত। কোনো একটি পরিকল্পনা সমস্ত কাজের এবং সব সময়ের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পরিকল্পনা হতে পারে না।

৩.৪ পরিকল্পনার প্রণালীসমূহ (Approaches to Educational Planning)

শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রণালী ও আদর্শ সমগ্র বিশ্বে অনুসরণ করা হয়েছে। এই প্রণালীগুলি মূলতঃ দৃষ্টিভঙ্গী অথবা বিচার্য বিষয়গুলির দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে।

১. ইন্ট্রা-এডুকেশনাল বহির্পাতন মডেল।

২. জনসংখ্যা সংক্রান্ত প্রোজেকশন মডেল বা স্কুল ম্যাপিং।

৩. মানব ক্ষমতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী।

৪. সামাজিক চাহিদা মডেল।

৫. রেট অফ্ রিটার্ন মডেল।

৬. সামাজিক সুবিচার মডেল।

৩.৪.১ Intra-Educational Extrapolation Approach

অভ্যন্তরীণ শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞাত তথ্যের বিচারে অজ্ঞাত তথ্য নিরূপণ করার দৃষ্টিভঙ্গী।

এই দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এটি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত করে। যদি সরকার ২০০৫ সালের মধ্যে সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে, তবে শিক্ষামূলক পরিকল্পনাকারীকে জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে হিসেব করে নির্ণয় করতে হবে কতজন শিক্ষক, কতগুলি বিদ্যালয় ভবন, কতগুলি পাঠ্য পুস্তক প্রয়োজন হবে নির্দিষ্ট সময়ের শেষে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনাকারীকে অন্যান্য পরিবর্তনগুলিকেও বিবেচনা করতে হবে।

৩.৪.২ জনসংখ্যা অভিক্ষেপন মডেল : (Demographic Projection Model)

এটি সব শিক্ষামূলক পরিকল্পনার অঙ্গ। এটি প্রধানত নির্ণয় করে ভবিষ্যতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কতজনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটি ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন নির্দিষ্ট স্তরে নির্দিষ্ট বয়সের কতজন শিক্ষার্থীর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা নির্ধারণ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিকল্পনায় কোন নির্দিষ্ট বয়সের শিক্ষার্থীর কে কোন বিষয়ে নিয়ে পড়বে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে অতীতে শিক্ষার্থীদের পছন্দ বহির্পাতনের জন্য একটি সম্ভাব্য ভিত্তি গঠন করে।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও স্কুল ম্যাপিং স্কুলের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনা করে। এই বিষয়/বৈশিষ্ট্যগুলো হল স্কুলের স্থানের ভৌগোলিক অবস্থা, স্কুলের চারিদিকের সামাজিক পরিবেশ, স্কুলে যাতায়াতের

জন্য সুযোগসুবিধা প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়ই স্কুলের স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত। একে কখনো কখনো বলা হয় মাইক্রো অথবা স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা। এটা জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে শিক্ষামূলক সুযোগের বন্টনে সাহায্য করে। এটা জাতীয় বিষয়কে অধিকতর আঞ্চলিক এবং স্থানীয় বিষয়ে পরিণত করে।

৩.৪.৩ মনুষ্যশক্তি ব্যবহার-এর দৃষ্টিভঙ্গী (Man Power Approach) :

মনুষ্য শক্তি ব্যবহার-এর দৃষ্টিভঙ্গীকে অন্যভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রচেষ্টা বলা হয়। সমাজ এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য একটি দেশের মানব সম্পদের উন্নয়ন জরুরী। মানব সম্পদের আছে জ্ঞান, ধারণা এবং দক্ষতা। মানব সম্পদের প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন করা হল দেশের প্রথম এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন ও পরিবর্তিত হচ্ছে। মানব সম্পদের উন্নয়ন কেবলমাত্র যথাযথ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার মাধ্যমেই সম্ভব। যখন শিক্ষা পরিকল্পনা দেশের প্রয়োজনে মানব সম্পদকে বিবেচনা করে তখন এটা শিক্ষা পরিকল্পনায় মানব ক্ষমতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে। মানব ক্ষমতা পরিবর্তনশীল এবং এটার প্রয়োজন সময়ান্তরে পরিবর্তিত হয়। এখন আমরা দেখবো কেমন করে মানব ক্ষমতার পরিকল্পনা সময়ান্তর পরিবর্তিত হয়। আগে আমাদের দেশে অধিক সংখ্যায় ডাক্তার এবং ইঞ্জিনীয়ারের দরকার ছিল। কিন্তু এখন আমাদের চাহিদা অধিক কম্পিউটার সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার প্রফেশনালস। সুতরাং মানব ক্ষমতামূলক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কম্পিউটার সম্পর্কিত বৃত্তিতে অধিক সংখ্যায় মানব সম্পদের উৎপাদন করা। কখনো কখনো মানব ক্ষমতামূলক পরিকল্পনা ভুল হওয়ার জন্য দেশে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। হার্বিসন (১৯৬৭) মনে করেন যে, আমাদের উচিত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দক্ষতা তৈরীর কেন্দ্র হিসাবে দেখা। মানব ক্ষমতায় সমস্যা যেমন বেকার সমস্যা, অদক্ষতা প্রভৃতিকে একটি বিদ্যুৎ তৈরী কেন্দ্রের বিদ্যুৎহীনতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মানব ক্ষমতার পরিকল্পনা দৃষ্টিভঙ্গী এই ধরনের সমস্যার সমাধানের উপর জোর দেয় এবং সমস্ত বিষয়ের মধ্যে মানব ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্রে রাখে এবং এটা কাজের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করার উপর জোর দেয়।

৩.৪.৪ সামাজিক চাহিদামূলক দৃষ্টিভঙ্গী (Social Demand Appraoch) :

সামাজিক চাহিদামূলক দৃষ্টিভঙ্গী মানবক্ষমতামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মত নয়। সামাজিক চাহিদামূলক দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার জন্য সামাজিক চাহিদাকেই বিবেচনা করে। মানব ক্ষমতামূলক পরিকল্পনাতে মানব সম্পদের প্রয়োজন এবং জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে সমতা স্থাপন করাই শিক্ষামূলক পরিকল্পনার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সামাজিক চাহিদামূলক দৃষ্টিভঙ্গী সমাজের শিক্ষার চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে। এটা যে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বা শ্রেণীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, যদি তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সক্ষমতা থাকে। কখনো কখনো শিক্ষার জন্য সামাজিক চাহিদা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের ক্ষমতার মধ্যে অসমতা দেখা যায় যা একজন পরিকল্পনাকারীর কাছে খুবই জটিল কাজ। দুইভাবে চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সমতা আনা যেতে পারে। প্রথমত, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যেককেই অনুমোদন করতে পারে। যারা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আসতে চায় এবং তারা নিজের ইচ্ছা মত যত সময় থাকতে চায় থাকতে পারে। ফলে অধিক সংখ্যায় ভর্তি হয়, শ্রেণীকক্ষ ভিড়ে ঠাসা হয় এবং সম্ভবত শিক্ষার মান নেমে যায়। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাতে সবাইকে প্রাথমিক শিক্ষায় সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার জন্য নানান নির্বাচন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়।

৩.৭.৫ প্রত্যাবর্তনের হার (Rate of Return Approach) :

একে 'খরচ লাভ' বা খরচ কার্যকারিতা দৃষ্টিভঙ্গীও বলা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী মনে করে শিক্ষা একটি ব্যবসা এবং শিক্ষায় বিনিয়োগ নির্ভর করে বিনিয়োগের উপর লাভের পরিমাণের উপর। শিক্ষায় উচ্চতর বিনিয়োগ মানব সম্পদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং মোট জাতীয় আয় বাড়ায়। জাতীয় উন্নয়ন, এইভাবে সরাসরি শিক্ষায় বিনিয়োগের সঙ্গে সংযুক্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগকে অর্থ ব্যবস্থার অন্যান্য বিভাগে বিনিয়োগের সঙ্গে একইভাবে গণ্য করা হয়। শিক্ষাকে এই কারণে দ্বিতীয় সারিতে না রেখে একে প্রাধান্য তালিকার শীর্ষে রাখা উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনাকারীদের ভাবতে হবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগকে সমাজ বা দেশকে বিনিয়োগের ফলস্বরূপ লাভ বা ফেরত দেওয়ার নিরীখে ভাবা উচিত।

এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিকল্পনাতে অনেক জটিলতা আছে। ফেরতের পরিমাপ করা সহজ নয়। কারণ পরিমাপের মানদণ্ড আর্থিক বিষয়হীন লাভ (যেমন, ব্যক্তি সন্তুষ্টি, সংস্কৃতির বৃদ্ধি)-কে হিসাবের মধ্যে ধরে না।

৩.৪.৬ সামাজিক ন্যায়বিচার দৃষ্টিভঙ্গী (Social Justice Approach) :

এই দৃষ্টিভঙ্গী অন্যভাবে 'Social Planning Approach' নামে পরিচিত। প্রত্যেক সমাজ অথবা দেশের কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্যগুলি দেশের আইন দ্বারা বর্ণিত। আমাদের দেশে আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সংবিধানে বর্ণিত আছে। শিক্ষ পরিকল্পনাকারদের এই অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরী করা দরকার। সামাজিক সুবিচার হল সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

সংবিধানের ৪৫ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য ১৪ বছর পর্যন্ত সব শিশুদের অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। একইভাবে, অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর শিশুদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হল ঐ সমস্ত শ্রেণীর মানুষদের প্রতি সামাজিক সুবিচার করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিকল্পনাতে পরিকল্পনাকারদের উপরিউক্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখার উপর জোর দেওয়া উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী আর্থিক বা সামাজিক উন্নয়নের ফলে উদ্ভূত সামাজিক পরিবর্তনকেও বিবেচনা করে।

৩.৫ শিক্ষামূলক পরিচালনা (Management of Education)

আমাদের দেশে শিক্ষামূলক পরিচালনা চার ধরনের সংস্থা করে থাকে। এইগুলি হল— (ক) কেন্দ্রীয় সরকার, (খ) রাজ্য সরকারগুলি, (গ) স্থানীয় সংস্থাগুলো, (ঘ) ব্যক্তিগত প্রয়াস।

৩.৫.১ কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ে : (Central Government Level)

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনামূলক কার্য প্রণালী বোঝার জন্য শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রকের প্রাতিষ্ঠানিক গঠন জানা প্রাসঙ্গিক। কেন্দ্রীয় স্তরে শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (MHRD)-এর দায়িত্ব। এটা ১৯৮৫ সালের আগে শিক্ষা মন্ত্রক নামে পরিচিত ছিল। MHRD-র শীর্ষে আছেন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, শিক্ষা বিভাগ MHRD-র অধীন। Minister of State-এর অধীন শিক্ষা বিভাগ অনেকগুলি সংস্থা নিয়ে গঠিত। এদের

প্রতিটির শীর্ষে আছেন যুগ্ম-সচিব অথবা যুগ্ম-শিক্ষামূলক পরামর্শদাতা। এরা আবার ডাইরেক্টর, ডেপুটি সেক্রেটারী অথবা ডেপুটি এডুকেশনাল অ্যাডভাইসর দ্বারা সহায়তা পান। তারা আবার সাহায্যপ্রাপ্ত হয় আণ্ডার সেক্রেটারীস অথবা সহকারী শিক্ষমূলক পরামর্শদাতা দ্বারা।

MHRD-র অধীন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা সরকারকে প্রয়োগ, শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী, শিক্ষানীতি গঠন বিশেষ করে শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য এবং উপদেশ দিয়ে থাকে। নিম্নে এই ধরনের কিছু প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

(ক) সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরী বোর্ড অফ্ এডুকেশন (CABE) ঃ CABE ১৯২০ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা ১৯২৩ সালে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল এবং হার্টগ কমিটি (১৯২৮)-র সুপারিশের ফলে ১৯৩৫ সালে পুনর্জ্জীবিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী এই বোর্ডের চেয়ারপার্সন। এর সদস্যারা হল ভারত সরকারের প্রতিনিধি, রাজ্য সরকারগুলির প্রতিনিধি, মেম্বার্স অফ্ পার্লামেন্ট, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিধিবদ্ধ সংস্থা যেমন, AICTE, মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ্ ইণ্ডিয়া, UGC, যোজনা কমিশন ইত্যাদির প্রতিনিধি। CABE-র কাজ হল—

★ ভারত সরকার বা রাজ্যের দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণকারী শিক্ষামূলক বিষয়ে পরামর্শ দান করা।

★ তথ্য সংগ্রহ এবং সুপারিশের সঙ্গে নির্দিষ্ট বিষয় ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিকে সরবরাহ করা।

★ বিগত বছরের সাফল্য নির্ধারণ করা এবং পরের বছরের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচীর সুপারিশ করা।

(খ) সেন্ট্রাল বোর্ড অফ্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন (CBSE) ঃ এটা ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা ১৯৬২ সালে ভারত সরকার দ্বারা পুনর্গঠিত হয়েছিল।

কাজ ঃ

★ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচি রচনা করা।

★ মাধ্যমিক স্কুলের পরীক্ষা পরিচালনা করা।

★ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের অনুমোদন করা।

★ মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন করা।

(গ) জাতীয় শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ (NCERT) ঃ NCERT ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর অধীনে চারটি প্রতিষ্ঠান আছে।

(১) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ্ এডুকেশন।

(২) সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ্ এডুকেশন।

(৩) চারটি আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—আজমীর, ভুবনেশ্বর, মাইসোরে অবস্থিত।

(৪) সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ্ ভোকেশন্যাল এডুকেশন, ভুপাল।

এটা MHRD-র উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে এবং কেন্দ্রীয় সরারের সম্পূর্ণ আর্থিক অনুদান পায়। MHRD-র মন্ত্রী

হচ্ছেন NCERT-র প্রেসিডেন্ট এবং প্রতিটি রাজ্যের এবং ইউনিয়ন টেরিটরীর শিক্ষামন্ত্রী এর সদস্য। অন্যান্য সদস্যরা হল চেয়ারম্যান, UGC, MHRD-র সেক্রেটারী, চার জন ভাইস চানসেলর দেশের চারটি অঞ্চল থেকে। NCERT-র শীর্ষে ডাইরেক্টর আছেন।

এর বিভিন্ন বিভাগগুলি নিম্নলিখিত বিষয়ে কাজ করে। প্রাথমিক শিক্ষা, বিশেষ ধর্মী শিক্ষা, শিক্ষামূলক গবেষণা, নীতি, পরিকল্পনা, সমাজ বিজ্ঞান ও হিউম্যানিটিস, গণিত, বিজ্ঞান, শিক্ষামূলক পরিমাপ এবং মূল্যায়ন, প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষণ, প্রকাশন বিভাগ।

NCERT-র কাজ ঃ

★ স্কুল শিক্ষা সম্পর্কিত অনুসন্ধান, সার্ভে করা।

★ প্রি এবং ইন-সার্ভিস শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

★ প্রসারণমূলক কাজ পরিচালনা করা।

★ স্কুল শিক্ষা সম্পর্কিত সব বিষয়ের সব ধরনের তথ্য সরবরাহ করা।

★ গবেষণা এবং স্কুল শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দ করা।

★ স্কুল শিক্ষার নীতি এবং কর্মসূচী গঠন করা।

(ঘ) কেন্দ্রীয় শিক্ষক শিক্ষণ পর্ষদ (NCTE) ঃ ১৯৯৩ সালে পার্লামেন্টের আইন বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। NCTE-র কাজ ঃ

★ শিক্ষক শিক্ষণ-এর সমন্বিত উন্নয়নের উৎসাহ দান।

★ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষণের মান নির্ধারণ ও বজায় রাখা।

★ শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন নিয়ন্ত্রণ করা।

★ শিক্ষকদের ধারাবাহিক শিক্ষার গুরুত্ব প্রদান করা।

★ শিক্ষকদের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যেকার ফাঁক পূরণ সাহায্য করা।

★ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে, UGC, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিকে শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।

(ঙ) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ্ এডুকেশন, প্ল্যানিং এ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (NIEPA) ঃ এটা ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা আগে এশিয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য UNESCO আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসাবে শিক্ষামূলক পরিকল্পনাকার, প্রশাসক এবং সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণের কাজ করত।

NIEPA-র কাজ ঃ

★ পরিকল্পনা ও প্রশাসনের গুণগত মানের উন্নয়ন করা।

★ নতুন ধারণা এবং টেকনিকের উদ্ভাবন এবং তাদের ছড়িয়ে দেওয়া।

★ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং ইউনিয়ন এলাকার সিনিয়র এডুকেশনাল অফিসারদের জন্য প্রি এবং ইন্-সার্ভিস প্রশিক্ষণ, সম্মেলন, ওয়ার্কশপ, মিটিং, সেমিনার, ব্রিফিং সেশন সংগঠন করা।

★ শিক্ষামূলক পরিকল্পনা এবং প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে সাহায্য ও উৎসাহিত করা, সমন্বয়সাধন করা এবং নিজে গবেষণা করা।

(চ) কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন (KVS) ঃ এটা ভারত সরকারের একটি স্বশাসিত সংগঠন। এটা ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

KVS-এর কাজ ঃ

★ কেন্দ্রীয় সরকারের বদলীর চাকুরীতে আছেন এমন ব্যক্তিদের সন্তানদের জন্য, এছাড়া,সৈন্যবিভাগ এবং প্যারা-মিলিটারী ব্যক্তিদের শিক্ষার প্রয়োজন পূরণ করা।

★ জাতীয় সংহতি রক্ষা শিশুদের মধ্যে 'Indianness' ধারণা তৈরী করা।

★ স্কুল শিক্ষার সঙ্গে সমতা রাখা।

★ CBSE, NCERT-র ন্যায় সংস্থার সহযোগিতায় শিক্ষায় নতুনত্ব আনার জন্য কাজ শুরু করা এবং উৎসাহ দান।

৩.৫.২ রাজ্য সরকার স্তরে ঃ (State Government Level)

রাজ্যে শিক্ষা শিক্ষামন্ত্রক অথবা বিভিন্ন বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা মন্ত্রক যেমন, উচ্চশিক্ষা,জনশিক্ষা বিদ্যালয় শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা ইত্যাদির পরিচালিত হয়ে থাকে। শিক্ষামন্ত্রক শিক্ষানীতি গঠন ও তাদের নিষ্পাদনে নির্দেশদান এবং তাদের রূপায়ণে নজরদারী করে। শিক্ষামন্ত্রকের শীর্ষে আছেন শিক্ষামন্ত্রী। যিনি সচিবালয় দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হন। সচিবালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হলেন সচিব। সচিব যুগ্ম/ডেপুটি/নিম্ন সচিবদের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হন। মন্ত্রকের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা পরিচালকের কার্যালয় আছে। পরিচালক কার্যালয়ের শীর্ষ ব্যক্তি এবং তিনি যুগ্ম, ডেপুটি এবং সহকারী পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত হন। প্রতিটি রাজ্য ভৌগোলিক বন্টনের ভিত্তিতে কয়েকটি শিক্ষামূলক সার্কেলে বিভক্ত। প্রতিটি সার্কেলের শীর্ষে আছেন সার্কেল ইন্সপেক্টর যিনি জেলা শিক্ষা অফিসার/জেলা স্কুল পরিদর্শকদের দ্বারা পরিচালিত হন। ব্লক স্তরে আছেন ব্লক শিক্ষা অফিসাররা এবং স্কুল পরিদর্শকরা যারা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের দায়িত্বে আছেন। গ্রাম স্তরে আছেন গ্রাম-শিক্ষা কমিটি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, যারা শিক্ষামূলক কাজের দেখাশোনা করেন।

এছাড়া রাজ্য স্তরে SCERT, BSE এবং রাজ্য পাঠ্যপুস্তক পর্ষদ আছে যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করে।

(ক) রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পর্ষদ (SCERT) ঃ এটি স্টেট ইনস্টিটিউট অফ্ এডুকেশন (SIE) নামে পরিচিত। এটি শিক্ষা পরিচালকের কার্যালয়ের একটি অংশ। এর শীর্ষে আছেন পরিচালক এবং যুগ্ম-পরিচালকেরা, যারা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে দেখাশোনা করেন।

SCERT-র কাজ ঃ

★ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলের কর্মরত শিক্ষকদের এবং জেলা শিক্ষা ও ব্লক শিক্ষা আধিকারিকদের এবং স্কুল পরিদর্শকদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

★ রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে সাহায্য করা এবং শিক্ষক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের নকশা তৈরী করা।

★ স্কুল শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যক্রম তৈরী করা।

★ স্কুল শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা করা।

★ সংখ্যালঘু এবং SC,ST, OBC শিশুদের বৃত্তি, ভাতা এবং অন্যান্য উৎসাহদানমূলক কাজের ব্যবস্থা করা।

★ আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানে নির্দেশনামূলক পদ্ধতির উন্নতিতে সাহায্য করা।

★ NCERT, NCTE এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষামূলক সংযোগ বৃদ্ধি করা।

(ঙ) মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (BSE) ঃ এই পর্ষদ চেয়ারম্যান, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি এবং মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত।

পর্ষদের কাজ ঃ

★ বিদ্যালয়গুলিকে অনুমোদন প্রদান।

★ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তক নির্দেশ করা।

★ দশম এবং দ্বাদশ মানের রাজ্য স্তরে পরীক্ষা গ্রহণ।

★ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মান বজায় রাখা।

★ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

★ প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

★ বিদ্যালয় স্তরে পরীক্ষামূলক সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণা করা।

★ রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক তৈরী করা।

(গ) রাজ্য পাঠ্যপুস্তক পর্ষদ (STB) ঃ এটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তক তৈরী করে।

★ বিদ্যালয় সব পাঠ্য বিষয়ের জন্য বিষয়—বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা। যার কাজ হল বই লেখা, সম্পাদনা করা, পর্যালোচনা এবং পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়ন করা।

★ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা করা।

★ বিদ্যালয়গুলিকে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা।

★ পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত গবেষণা করা।

★ SCERT এবং শিক্ষামন্ত্রকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

★ শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক লেখক এবং পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণের জন্য কর্মসূচী এবং কর্মশালার আয়োজন করা।

৩.৫.৩ আঞ্চলিক এবং জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ (Regional and District Level Organisations)

(ক) সার্কেল শিক্ষা অফিস (CEO) এই অফিসের পদারূঢ় ব্যক্তিরা সার্কেল পরিদর্শক, সার্কেল শিক্ষা অফিসার বা বিভাগীয় অফিসার নামে পরিচিত।

এর কাজ ঃ

★ জেলা শিক্ষা দপ্তরের কাজের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা।

★ পরিচালকের কার্যালয় ও জেলার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা।

★ অঞ্চলে সরকারের নীতির পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ করা।

★ অঞ্চলের শিক্ষামূলক প্রয়োজন নির্ধারণ করা।

★ বিদ্যালয় পরিদর্শন করা।

★ শিক্ষামূলক কর্মসূচীর পর্যালোচনা করা।

(খ) জেলা শিক্ষা দপ্তর (DEO) ঃ এর শীর্ষে আছেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক। যিনি দুই/তিনজন বিদ্যালয় পরিদর্শক দ্বারা পরিচালিত হন।

★ স্কুল পরিদর্শন এবং বিদ্যালয়ের প্রদত্ত নিয়মনীতি অনুযায়ী স্কুল চলছে কিনা তা দেখা।

★ পরিচালকের কার্যালয় এবং আঞ্চলিক সার্কেল অফিস থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেওয়া।

★ সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, ছুটি অনুমোদন করা এবং পদোন্নতি বিষয়ক কাজ করা।

★ বিদ্যালয় এবং রাজ্য পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা।

★ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কর্মসূচীকে পথনির্দেশ করা।

★ অভিযোগের নিষ্পত্তি করা।

(গ) জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (DIET) ঃ এটি ১৯৮৬ সালে Programme of Action (POA) :- এর ফলে তৈরী হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য টিচিং স্টাফদের দ্বারা পরিচালিত।

DIET-এর কাজ ঃ

★ প্রাথমিক শিক্ষার স্থানীয় চাহিদা এবং সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করা।

★ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য প্রি এবং ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর পরিচালনা করা।

★ শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

★ অ্যাকশন রিসার্চ করা।

★ বিদ্যালয়ে শিখনের গুণগত মানের উন্নয়ন করা।

৩.৫.৪ স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনসমূহ : (Local Level Organisation)

সংবিধানের ৪০ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তাদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদানে বাধ্য যাতে তারা একটি স্ব-শাসিত সরকারের ন্যায় কাজ করতে পারে। বলবন্ত রাজ মেহতা কমিটি ত্রি-স্তর শাসন ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়েছিল। এইগুলি হল—

গ্রাম স্তর—গ্রাম পঞ্চায়েত।

ব্লক স্তরে—পঞ্চায়েত সমিত।

জেলা স্তরে—জেলা পরিষদ।

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েত : এটি কতগুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত। এর শীর্ষে আছেন জনগণ দ্বারা নির্বাচিত 'সরপঞ্চ'। তিনি জনগণের প্রতিনিধি ওয়ার্ড সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রশাসন চালানো হল পঞ্চায়েতের দায়িত্ব।

এর কাজ হল :

★ বিদ্যালয় এবং কমিউনিটিকে একত্রিত করা।

★ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

★ গ্রামে বিদ্যালয় শিক্ষার রূপরেখা তৈরী করা।

★ বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য জেলা পরিষদ এবং ব্লক সমিতিতে পরামর্শ দেওয়া।

(খ) পঞ্চায়েত সমিতি/ব্লক সমিতি : সমিতি ব্লক বা তালুকা পর্যায়ে থাকে। এর চেয়ারম্যান গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্বারা ব্লকে নির্বাচিত হয় এবং তিনি সমিতির দেখভাল করেন।

★ বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণ এবং তদারক করা।

★ বিদ্যালয়ে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।

★ সরকারের নিয়ম-কানুন বলবৎ করা।

★ শিক্ষায় স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করা।

★ জেলা পরিষদ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা।

(গ) জেলা পরিষদ : পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত এবং মনোনীত করে। জেলা শিক্ষা আধিকারিক পরিষদের মনোনীত সদস্য।

এর কাজ হল :

★ প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করা।

★ ব্লক সমিতির কাজে পথ দেখানো।

★ ব্লক সমিতির আয়-ব্যয় এবং পরিকল্পনার সংশোধনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা।

(ঘ) গ্রাম শিক্ষা কমিটি (VEC) ঃ পঞ্চায়েতরাজ বিল অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গ্রাম-শিক্ষা কমিটি থাকবে। এটা নারী, সংখ্যালঘু, প্রধান শিক্ষক, সরপঞ্চ এবং বিভাগীয় সদস্যদের নিয়ে গঠিত।

এর কাজ হল ঃ

★ সংগঠিতভাবে বাড়ী বাড়ী তদন্ত এবং সময়ান্তর অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে গ্রামের বিদ্যালয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

★ সমস্ত শিশুর স্কুলে ভর্তি হওয়া ও যাওয়া সুনিশ্চিত করা।

★ সমস্ত স্তরের মানুষের শিক্ষায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

★ স্কুলের কাজ কর্ম নিয়মিত করা।

★ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য প্রশাসনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা।

(ঙ) শহরে এলাকার স্থানীয় সংস্থাসমূহ ঃ পৌরসভা, কর্পোরেশন এবং নগরপালিকা। এই সংস্থাগুলি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। চেয়ারম্যান অথবা মেয়র এদের শীর্ষে থাকেন। এছাড়া ভাইস চেয়ারম্যান অথবা ডেপুটি মেয়র এবং শহরের প্রতিটি বিভাগ থেকে নির্বাচিত সদস্যরা থাকেন।

এদের কাজ হল ঃ

★ নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা।

★ বিদ্যালয়গুলিকে যথাযথ সুযোগ এবং আর্থিক অনুদান করা।

★ শিক্ষক নিয়োগ করা।

★ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য শিক্ষক এবং কমিউনিটির সাথে একযোগে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৩.৫.৫ ব্যক্তিগত স্তরে পরিচালনা ঃ (Private Management Level)

বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংস্থা যেমন, শিল্প, ধর্মীয়গোষ্ঠী, সংখ্যালঘুগোষ্ঠী অনেক সংখ্যায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। এই বিদালয়গুলির দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য বোর্ড অফ ট্রাস্টি অথবা ম্যানেজমেন্ট আছে।

এই সমস্ত বিদ্যালয়ের কাজ হল ঃ

★ শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ নিয়োগ করা।

★ শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করা।

★ বিদ্যালয়ে অর্থ প্রদান এবং পরিকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি করা।

★ সরকারের নিয়ম-কানুন যাতে বিদ্যালয়ে রূপায়িত হয় তা সুনিশ্চিত করা।

★ বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন বিষয়ে দেখাশোনা করা।

৩.৬ এককের সারাংশ (Unit Summary)

★ শিক্ষামূলক কাজকর্মের সূচী নির্ধারণ, ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুনিশ্চিত করতে এবং অধিকতর সন্তুষ্টিজনক ফল লাভের জন্য পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

★ শিক্ষামূলক পরিকল্পনা বলতে পরিকল্পিত প্রচেষ্টা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ভাবনা চিন্তাপ্রসূত পরিবর্তনকে বোঝায়, যা পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে।

★ ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যা (যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মানব ক্ষমতার প্রয়োজন, ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অসংগঠিতভাবে বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রয়োগ)-র জন্য শিক্ষামূলক পরিকল্পনা জরুরী।

★ শিক্ষামূলক পরিকল্পনা সাফল্য সুনিশ্চিত করে, সময়, প্রচেষ্টা ও অর্থ বাঁচায় এবং সমস্যা সমাধান করে।

★ শিক্ষামূলক পরিকল্পনার ছটি দৃষ্টিভঙ্গী আছে।

★ শিক্ষামূলক কার্যাবলী দেশের পাঁচটি বিভিন্ন স্তরে পরিচালিত হয়ে থাকে।

★ এইগুলি হল কেন্দ্রীয় সরকার স্তর, রাজ্য সরকার স্তর, আঞ্চলিক এবং জেলা স্তর, স্থানীয় স্তর এবং ব্যক্তিগত পরিচালন স্তর।

★ প্রতিটি স্তরের অধীনে অনেক সংগঠন আছে। যারা দেশের শিক্ষামূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে।

৩.৭ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

(ক) শিক্ষামূলক পরিকল্পনা বলতে কি বোঝেন?

(খ) শিক্ষামূলক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(গ) শিক্ষামূলক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

(ঘ) শিক্ষামূলক পরিকল্পনার নীতিগুলি আলোচনা করুন।

(ঙ) শিক্ষামূলক পরিকল্পনার বিভিন্ন দৃষ্টভঙ্গী কি কি?

(চ) মনুষ্য শক্তি উন্নয়ন (Man Power Development) পরিকল্পনা কি?

(ছ) শিক্ষা পরিকল্পনায় সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

(জ) কেন্দ্রয় সরকারের যে কোন তিনটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কার্য সম্পর্কে লিখুন।

(ঝ) শিক্ষা পরিচালনায় গ্রাম স্তরের সংগঠনের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

(ঞ) SCERT এবং DIETs-এর কার্যাবলী লিখুন।

৩.৮ বাড়ীর কাজ (Assignment)

(ক) মনুষ্য শক্তির উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে সমালোচনামূলক আলোচনা করুন।

(খ) শিক্ষাগত পরিকল্পনায় সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোন তিনটি শিক্ষামূলক সংগঠনের পরিচালনামূলক কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৩.৯ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussions and Clarifications

৩.৯.১ আলোচনার সূত্রাবলি **(Points for Discussion)**..

....

....

৩.৯.২ বিশ্লেষণের সূত্রাবলি **(Points for Clariffication)**..

....

....

৩.১০ উৎস (Reference)

1 Bhat, K. S. and Ravishankar, S. (1985) *Administration of Education*, New Delhi : Seema Publications.

2. Bhatnagar, R. P. and Agarwal, Vidya (1986) *Educational Administration*, New Delhi : Anupama Publishers Distributors.

3. Beeby, C. E. (1967) *Planning and the Educational Administration*, Paris : IIEP, UNESCO,

4. Coombs, H. P. (1970) *What is Educational Planning*. Paris : UNESCO.

5. Dror, Yehezkel. (1967) 'The Planning Process : A Facet Design', in Fermant,J. Lyden, et. al. (eds.) *Planning, Programmig Budgetting : A Systems to Aproach to Management*, Chicago : Merkham.

6. Hussen, Torsten and Postlethwaite : T. N. (eds.) *The International Encyclopedia of Education*, New York, : Pergamen, P. 3924.

7. Harbison, F. (1967) *Educational Planning and Human Resource Development*, Paris : IIEP, UNESCO.

S.E.C.P. - 03
BLOCK - 02
Curriculum Designing
পাঠক্রম পরিকল্পনা

পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Designing)

ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রদত্ত সামগ্রিক কার্যকলাপকে পাঠ্যক্রম বলে। কার্যকলাপ শ্রেণীকক্ষ থেকে খেলার মাঠ এবং তার উপরেও যেতে পারে। পাঠ্যক্রম হল একটি যন্ত্র যার সাহায্যে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সামাজিক হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক চাহিদা পূরণেও সমর্থ হয়ে ওঠে। প্রথম অধ্যায়ে পাঠ্যক্রমও তার সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা ও তার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে "মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম"-এর অর্থ এবং এইধরনের কোর্সের ভূমিকা এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতার সমস্যা এবং বিষয়বস্তু তৈরি করার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের নানান বৈশিষ্ট্য--গুরুত্ব, উৎস, বিষয় ও নমুনাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একক ১ ❑ পাঠ্যক্রম-এর সংজ্ঞা (Defining Curriculum)

গঠন

1.1 ভূমিকা

1.2 উদ্দেশ্য

1.3 পাঠ্যক্রমের ধারণা

1.4 পাঠ্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ

1.5 পাঠ্যক্রমের তাৎপর্য ও প্রয়োজন

- 1.5.1 জাতীয় উন্নয়নের জন্য পাঠ্যক্রম
- 1.5.2 গণতান্ত্রিক জীবন গঠনের জন্য পাঠ্যক্রম
- 1.5.3 জীবনের মানোন্নয়নের জন্য পাঠ্যক্রম
- 1.5.4 পাঠ্যক্রম ও জাতীয় সংহতি

1.6 পাঠ্যক্রমের ভিত্তিভূমি

1.7 পাঠ্যক্রম গঠন পদ্ধতি ও তার বিভিন্ন স্তর

- 1.7.1 লক্ষ্য নিরূপণ
- 1.7.2 শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন
- 1.7.3 বিষয়বস্তুর নির্ধারণ
- 1.7.4 শিখন বস্তুর/লক্ষ্যসমূহের প্রস্তুতকরণ
- 1.7.5 রূপায়ণ
- 1.7.6 মূল্যায়ন

1.8 পাঠ্যক্রমের প্রকারভেদ

- 1.8.1 বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম
- 1.8.2 কর্ম-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম
- 1.8.3 শিক্ষার্থী ন্দ্রিক পাঠ্যক্রম

1.8.4 সমন্বিত পাঠ্যক্রম

1.8.5 কোর প্যাটার্ন পাঠ্যক্রম

1.9 এককের সারাংশ/মনে রাখার বিষয়

1.10 অগ্রগতির মূল্যায়ন

1.11 আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

1.12 উৎস

1.1 ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষা প্রক্রিয়ার হৃদয় ও আত্মা হল 'পাঠ্যক্রম'। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা শিশুদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রদত্ত সমস্ত কার্যকলাপের সমষ্টিই হল পাঠ্যক্রম। কার্যকলাপ বলতে শ্রেণীকক্ষ ও তার বাইরের সবধরনের কার্যকে বোঝায়। প্রতিটি সমাজ তার শিশুদের পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের মাধ্যমে সামাজিকীকরণ করে থাকে। পাঠ্যক্রম হল এই উদ্দেশ্য পূরণের একটি হাতিয়ার। আমরা এই অধ্যায়ে পাঠ্যক্রমের অর্থ, প্রয়োজন ও ভিত্তি, পাঠ্যক্রমের প্রক্রিয়া/পদ্ধতি এবং বিভিন্ন প্রকার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করব।

1.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

- 'পাঠ্যক্রম'-এর অর্থ বুঝতে পারা।
- 'পাঠ্যক্রম'-এর তাৎপর্য ও প্রয়োজন বর্ণনা করতে পারা।
- 'পাঠ্যক্রম'-এর ভিত্তি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারা।
- 'পাঠ্যক্রম'-এর পদ্ধতিসমূহ ও বিভিন্ন স্তরসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করা।
- বিভিন্ন প্রকার 'পাঠ্যক্রম' চিহ্নিত করা ও বর্ণনা করতে পারা।

1.3 'পাঠ্যক্রম'-এর ধারণা (Concept of Curriculum)

বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্নভাবে 'পাঠ্যক্রম'-এর ব্যাখ্যা করেছেন—

* শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করার উপাদান বা 'বিষয়বস্তু' হল পাঠ্যক্রম।
* পাঠ্যক্রম হল অধ্যয়নের জন্য লিখিত বিষয়াবলী। এটি সর্বদা পূর্ব পরিকল্পিত। এটি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়িকা নথিপত্র যা তথ্য সরবরাহ করে থাকে।
* পাঠ্যক্রম হল স্কুলে প্রদত্ত বিষয়সমূহ। কখনো কখনো একটি পর্যায়ে প্রদত্ত বিষয়বস্তুও পাঠ্যক্রম হিসাবে বিবেচিত হয়।

* পাঠ্যক্রম সর্বদা উদ্দেশ্যমূলক অর্থাৎ সামাজিক লক্ষ্যসমূহের সামগ্রিকরূপ। একটি পাঠ্যক্রমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি শিখনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

* পাঠ্যক্রম হল সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা ও সংস্কৃতির পুনরুৎপাদন। আমরা জানি পাঠ্যক্রম সামাজিক চাহিদার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। সমাজ পাঠ্যক্রম এমনভাবে গঠন করে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাপূরণ সম্ভব হয়।

* পাঠ্যক্রম হল অভিজ্ঞতা, একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রম কিছু নির্দিষ্ট শিখন-অভিজ্ঞতাকে সূচিত করে। যেমন মাধ্যমিক স্তরে ব্যতিক্রমী শিশুদের জন্য পাঠ্যক্রম। এই ধরনের শিখন অভিজ্ঞতা এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে ভিন্ন হয়।

* পাঠ্যক্রম সমাজকে পুনর্গঠিত করে। পাঠ্যক্রম প্রচলিত সামাজিক রীতি নীতিতে পরিবর্তন সাধিত করে যুব সমাজকে সমাজজীবনে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

* পাঠ্যক্রম পরিকল্পিত শিখন অভিজ্ঞতাবলী হিসাবে বিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয়। পাঠ্যক্রম একটি অপরিকল্পিত আয়োজন নয়। শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত শিখন অভিজ্ঞতা পূর্বপরিকল্পিত হওয়া উচিত; উদ্দেশ্যাবলী ও অভিষ্ট লক্ষ্যসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে পাঠ্যক্রমে বর্ণিত থাকা দরকার।

উপরের বর্ণনানুযায়ী পাঠ্যক্রম কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ বিষয়ের অধ্যয়ন নয়, শ্রেণীকক্ষ এবং বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ও বাহিরের পরিবেশে শিখন ছাড়াও পরিকল্পিত সামাজিক শিখনও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

সমস্ত ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত, যাদের চারটি বিভাগে ভাগ করা যায়—অধ্যয়নের বিষয়াবলী, সামাজিক প্রসঙ্গ। শিখন অভিজ্ঞতাবলী/শিখন/ফল/পরিণাম।

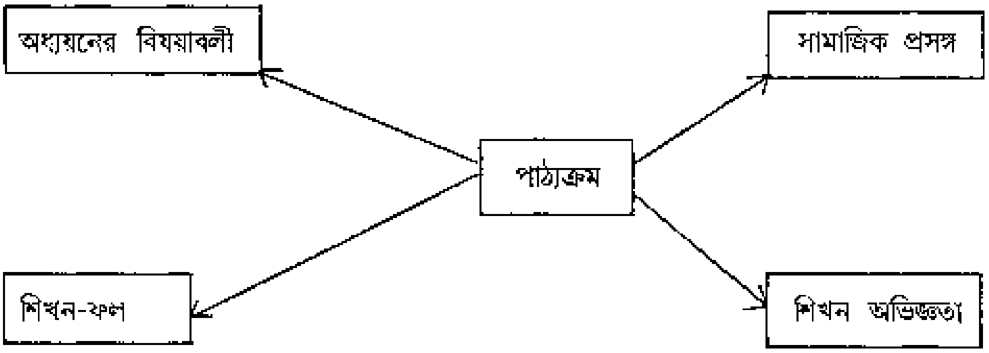

চিত্র 1.1 : পাঠক্রম-এর উপাদানসমূহ

অধ্যয়নের বিষয়াবলী/বিষয়বস্তু/পাঠসূচী ঃ—যা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয়, এছাড়া সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীসমূহও এর অন্তর্গত।

সামাজিক প্রসঙ্গ ঃ মানুষ সমাজবদ্ধভাবে এবং গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে। যেখানে নিজেদের ও বাহিরের গোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা ও পারস্পরিক আদান-প্রদান করে থাকে। মানুষ পরিবার, গোষ্ঠী বা বাহির থেকে অনেক কিছু শিখে থাকে, যা শ্রেণীকক্ষে শেখা সম্ভব নয়।

সামাজিক প্রসঙ্গ বা পরিস্থিতি বলতে বোঝায় একজনের চিন্তাভাবনা যা শিখনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ এটি শিশুদের সামাজিকীকরণের জন্য খুবই জরুরী।

শিখন অভিজ্ঞতাবলী : একটি শিশু শ্রেণীর মধ্যে এবং বাহিরে উভয় পরিবেশেই শিখে থাকে। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে প্রতিটি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে মানুষ শিখে থাকে। কর্মনির্ভর শিক্ষা-শিখন মানুষকে আরও অভিজ্ঞ করে তোলে যা সমস্যা-নির্ভর শিখনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ করে সমস্যা যদি প্রকৃত জীবনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত হয়। পরীক্ষামূলক শিখনের ক্ষেত্রে বর্তমান শিখন পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে হয়ে থাকে, যা শিশুর অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে।

শিখন ফলাফল : এটি পাঠ্যক্রমের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ কি অর্জন করা হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা অর্থাৎ একটি কাজের পরে বা একটি পর্যায়কালের পরে বা এক বছর পরে কি অর্জন করা হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা। শিখন ফল, জ্ঞান, বোধশক্তি, দক্ষতা, ধারণা, মূল্যবোধ প্রভৃতি অর্জন/সাফল্যের মাপকাঠিতে এবং শিক্ষার কারণে শিশুর পরিবর্তন রূপে প্রকাশ করা হয়। শিখন ফল বিস্তৃত পরিসরে যা নির্দিষ্ট সময়ের পরে অর্জন করা যায় (যেমন—বুনিয়াদি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক প্রভৃতি) বা প্রতিটি স্তরের জন্য বছর হিসাবে বা বিষয়ের জন্য সেমিষ্টার হিসাবে প্রকাশ করা যায়।

1.4 পাঠ্যক্রমের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা (Important Definitions of Curriculum)

শিক্ষাবিদরা বিভিন্নভাবে পাঠ্যক্রমের সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিছু সংজ্ঞা খুব নির্দিষ্ট অর্থবহ এবং কিছু খুবই বিস্তৃত। নিম্নে কিছু সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত অর্থ দেওয়া হল—

জনসন (১৯৭৬)-এর মতে "A curriculum is a structured series of intended learning outcomes."

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের (১৯৫২-৫৩) মতানুযায়ী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগারে, পরীক্ষাগারে, কর্মশালায়, খেলারমাঠে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অপ্রচলিত পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফল স্বরূপ সমস্ত ধরনের অভিজ্ঞতা রাশি পাঠক্রমের অন্তর্গত। এইক্ষেত্রে বিদ্যালয় জীবনের সবকিছুই যা শিক্ষার্থীর সুসংহত ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে তাই পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু।

অ্যালবার্টি ও অ্যালবার্টির (১৯৫৯) মতানুযায়ী অভীষ্টলক্ষ্য পূরণের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষার্থীদের অভীষ্টসমূহের সমষ্টিগত বিষয়বস্তু হল পাঠক্রম।

জেনকিন এবং শিপ ম্যান (১৯৭৫) বিষয়ক শব্দকোষে বিদ্যালয়ে বা অন্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক প্রস্তাবনা গঠন এবং তার প্রয়োগ হল পাঠ্যক্রম যার জন্য প্রতিষ্ঠান তিনটি স্তরে দায়বদ্ধ। সেগুলি হল প্রস্তাবনাযুক্তি, প্রকৃত প্রয়োগ এবং প্রস্তাবনার প্রতিক্রিয়া বা ফল।

১৯৮১ সালে শিক্ষালব্ধ কোর্ষে / ডিকশ্যনারি বর্ণিত ডেরেক রাউন্ট্রির মতানুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পূরণের এবং আকাঙ্খিত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান দ্বারা গৃহীত ধারণা, কার্যাবলীর সমষ্টি হল পাঠক্রম।

গ্লেন হ্যাজ-এর (১৯৮৭) মতানুযায়ী তত্ত্ব এবং গবেষণা বা অতীতের এবং বর্তমানের পেশাদারী অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে সম্পর্কিত বিষয়ের নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং ভবিষ্যতের বিস্তীর্ণ লক্ষ্যপূরণের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষামূলক কর্মসূচীর অভিজ্ঞতা রাশি হল পাঠ্যক্রম।

উপরে উল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত এবং সংক্ষিপ্ত যেখানে লেখকরা ফলাফলের (Output) নিরীক্ষে পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিয়েছেন কিন্তু পদ্ধতির উপর এবং কি হওয়া উচিত তার উপর জোর দেননি।

তৃতীয় সংজ্ঞাটিতে শিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট কার্যাবলীকে সূচিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও ফলাফলের উপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সংজ্ঞাগুলি পাঠ্যক্রমকে যতটা সম্ভব বিস্তীর্ণ পরিসরে এবং প্রায় সমস্ত কিছুই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আলোকপাত :

(ক) ৫০টি শব্দে পাঠ্যক্রম বলতে কি বোঝ ব্যাখ্যা করা।

(খ) প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে কোনটিকে অধিকতর পছন্দ করেন এবং কেন ?

(গ) নিজের ভাষায় পাঠ্যক্রমের সংজ্ঞা দিন এবং সংজ্ঞার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন।

1.5 পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন ও তাৎপর্য (Significance and Need for the curriculum)

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। একটি সুপরিকল্পিত ও সঠিকভাবে রূপায়িত পাঠ্যক্রম শিশুর সূক্ষ্মানুভূতি, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক, বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং কর্মমূলক বিকাশে সাহায্য করে। পাঠ্যক্রম শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের সঠিক দিক নির্দেশ করে। ফলে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে হয় না এবং শিক্ষকও উদ্দেশ্যহীনভাবে শিক্ষাদান করেন না। পাঠ্যক্রম তাদের কাজ পূর্বেই নির্ধারিত করে দেয়।

পাঠ্যক্রম ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এটি শিক্ষার্থীকে সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে। এটি শিক্ষার্থীকে বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমাজের সঙ্গে সুসংহত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে সুনির্দিষ্ট করে। পাঠ্যক্রম সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে নিকট সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে।

একটি সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকে জ্ঞানারোহন ধারণার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে এবং দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী মূল্যবোধ এবং অভ্যাস গঠনে সাহায্য করে যা ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশের জন্য অনুকূল। এইভাবে বলিষ্ঠ জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ যুক্ত নাগরিক তৈরি করা হল পাঠ্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য। পাঠ্যক্রম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের এবং জাতীয় উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য বলিষ্ঠ অস্ত্র, যা কেবলমাত্র সুপরিকল্পিত পাঠক্রমের কাজ।

1.5.1 জাতীয় উন্নয়নের জন্য পাঠ্যক্রম (Curriculum for National Developmen)

জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। কোঠারী শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) যথাযথভাবে বলেছে "The destiny of the nation is being shaped in the class-room." এই কারণে শিক্ষাকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা দরকার। এই কাজ প্রাথমিকভাবে একটি সুসমন্বিত পাঠ্যক্রম করে থাকে। সেহেতু একটি সুগঠিত পাঠক্রম সুগভীর এবং গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত যাতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সব বিষয় থাকে। ফল স্বরূপ শিশুর নিজের দেশ সম্পর্কে সুবিস্তৃত এবং সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে এবং জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন পরিসরে সক্রিয় অবদান রাখতে পারে।

1.5.2 গণতান্ত্রিক জীবন গঠনের জন্য পাঠ্যক্রম (Curriculum for Developing Democratic life)

শিক্ষা গণতান্ত্রিক জীবনের জন্য অপরিহার্য। এটি কেবলমাত্র ব্যক্তির প্রয়োজন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা অর্জন করা সম্ভব। পাঠ্যক্রম ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিক জীবনের নিয়ম এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করে, দায়িত্বশীল নাগরিকের বিকাশ ঘটায়। এটি কেবলমাত্র প্রয়োজনভিত্তিক এবং সক্রিয়ভাবে রূপায়িত পাঠ্যক্রমের দ্বারা সম্ভব। পুনরায়, পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন এবং রচনা করতে হবে যাতে নানান ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রতি কোনপ্রকার ভেদাভেদ থাকবে না বরং শ্রদ্ধার উদ্রেক করবে।

1.5.3 জীবনের মানোন্নয়নের জন্য পাঠ্যক্রম (Curriculum for Raising Standard of Living)

নাগরিকের জীবনের মানোন্নয়নের দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। এটি নাগরিকের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতার উন্নয়ন, সর্বাধিক উৎপাদন, মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং কাজের নানান সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব কমানোর দ্বারা সম্ভব। ধারণা তৈরির জন্য (যেমন কর্ম অভিজ্ঞতা) প্রয়োজন সামাজিকভাবে ব্যবহারযোগ্য উৎপাদনশীল কাজ এবং কর্মমুখী শিক্ষা পাঠ্যক্রম হল জনগণের গুণগত জীবনের মানোন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

1.5.4 পাঠ্যক্রম ও জাতীয় সংহতি (Curriculum and National Integration)

সুসংগঠিতভাবে রচিত পাঠ্যক্রম দেশের নাগরিকের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের ধারণা বিকাশের সহায়ক। শিক্ষার্থীদের দেশের নানান সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি সংবেদনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া দরকার। তাদের মাতৃভূমির প্রতি অঙ্গীকার ও ভালোবাসা থাকা উচিত। জাতীয় সংহতির বিস্তার কেবলমাত্র পাঠ্যক্রমে নানা বিষয় ও কাজের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সম্ভব।

1.6 পাঠ্যক্রমের ভিত্তিভূমি (Bases of Curriculum)

প্রয়োজনভিত্তিক এবং আধুনিক পাঠ্যক্রম গঠনের জন্য একটি বলিষ্ঠ ভিত্তি থাকা দরকার। এখানে পাঠ্যক্রম গঠনের পাঁচটি ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হল। এগুলি হল—সামাজিক চাহিদা, সম্পদসমূহের প্রাপ্যতা, মানব উন্নয়ন বিকাশ, শিখনের প্রকৃতি এবং জ্ঞান ও বোধশক্তি চেতনার প্রকৃতি।

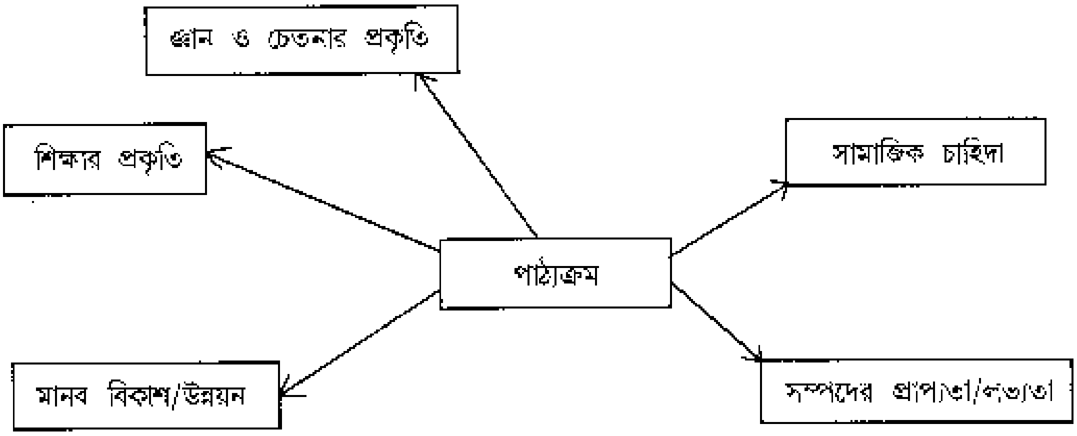

চিত্র ১.২ : পাঠ্যক্রমের ভিত্তিসমূহ

সামাজিক চাহিদা : শিক্ষা হল সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার এবং বিদ্যালয় হল সমাজের একটি তন্ত্র। শিক্ষার উপর সমাজের প্রভূত প্রভাব আছে। ভারত বহুসংস্কৃতি ও বহু ধর্মাধর্মী দেশ, সমাজ সামগ্রিকভাবে ছোটদের কাছে, যারা সমাজের ভবিষ্যতের সংগঠক, কিছু নির্দিষ্ট আশা করে। এই সামাজিক আশা আকাঙ্খাই শিক্ষার সামাজিক সম্পাদ্য কার্যাবলী নির্ধারণ করে। একটি সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রম অবশ্যই সামাজিক চাহিদা সম্পন্ন কার্যাবলী নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত/প্রতিফলন করা উচিত যা ভবিষ্যত সমাজের গঠনে সাহায্য করে।

সম্পদের লভ্যতা/প্রাপ্যতা : কোন দেশের শিক্ষা সেই দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব/স্থিরতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের যেকোনো স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রম উন্নত দেশের থেকে আলাদা হওয়া উচিত। তার মানে এই নয় যে উন্নয়নশীল দেশের পাঠ্যক্রম উন্নতদেশের পাঠ্যক্রমের থেকে দুর্বল/অনুন্নত। পাঠ্যক্রম এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে প্রাকৃতিক এবং মানবসম্পদ সর্বাধিক ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার সময় সম্পদের লভ্যতার কথাও বিবেচনা করা উচিত।

মানব বিকাশ উন্নয়ন : মানব সম্পদ উন্নয়ন শিশুদের বিকাশের স্তরসমূহ, তাদের শিখন পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গী, প্রয়োজন ও আগ্রহ নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষের বিকাশের নানান স্তর— শিশুকাল থেকে কৈশোর থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক....। প্রতিটি স্তর আরেকটি স্তর থেকে আলাদা। মনোবিদ্‌দের মানুষের বিকাশের ও জ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন আমাদের ফলপ্রসূ ও সুনিপুণ পাঠ্যক্রম রচনায় সাহায্য করে।

শিখনের প্রকৃতি ঃ শিশু কিভাবে শেখে তাও পাঠ্যক্রমের গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। শিখনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা যেমন আচরণবাদী এবং কগনিটিভ এ্যাটিচিউড (Coquitive atitude) আমাদের কিভাবে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা করতে হবে সেই বিষয়ে আলোকপাত করে। অর্থাৎ পাঠ্যক্রম এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে শিশুদের শিখনে সহায়তা করে। পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনাকারীর শিখনের তত্ত্বসমূহ অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।

জ্ঞান ও চেতনার প্রকৃতি ঃ শিশু বিভিন্ন তথ্যসংগ্রহ করে সেগুলি তার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সাহায্য

করে। পাঠ্যক্রম পরিকল্পনাকারী হিসাবে এই রূপান্তরের পদ্ধতি জানা দরকার। আমাদের চিন্তনপদ্ধতি এবং চেতনা বিকাশ পদ্ধতি এবং তৎসম্পর্কিত দক্ষতা সমূহের, তাদের সম্পর্ক বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার। প্রতিটি শিক্ষার্থীর তার নিজস্ব শিখনের ধরণ, চেতনার বিকাশ, জ্ঞানার্জনের ধরণ আলাদা। একটি ভালো পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীর নিজের ধরণ অনুযায়ী শিখনের সুযোগও থাকা দরকার।

সামাজিকভাবে আকাঙ্খিত মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং আচরণ পরবর্তী প্রজন্মে পরিবাহিত হয়; একটি পাঠ্যক্রম থেকে অন্য পাঠ্যক্রমে উপরিউক্ত ভিত্তিসমূহের গুরুত্ব পৃথক। এই পার্থক্যের কারণ হল ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহ।

1.7 পাঠক্রম গঠন পদ্ধতি ও তার বিভিন্ন স্তর (Curriculum Process and its Stages)

পাঠক্রম গঠনের পদ্ধতিকে ছয়টি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে--

* লক্ষ্য নিরুপণ/নির্ধারণ/গঠন
* শিখন অভিজ্ঞতার নির্বাচন।
* শিখন বিষয়বস্তু/কার্যাবলী প্রস্তুতকরণ।
* রূপায়ন/প্রয়োগ।
* মূল্যায়ন।

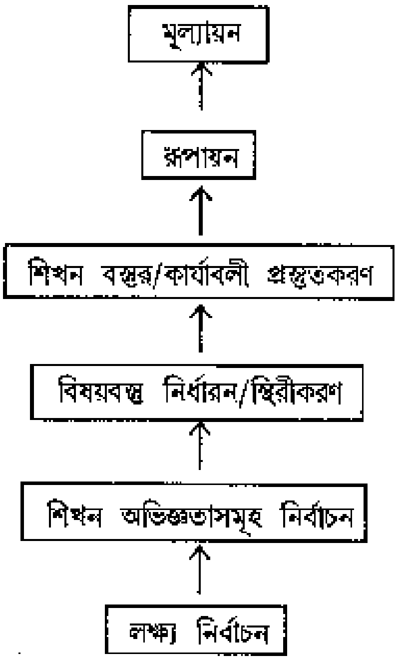

চিত্র ১.৩ : পাঠ্যক্রম পদ্ধতি / প্রক্রিয়া

1.7.1 লক্ষ্য নির্ধারণ (Formulation of Objectives)

পাঠ্যক্রম হল পরিকল্পিত শিক্ষামূলক কর্মসূচী। এর কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং কিছু পদ্ধতি আছে। লক্ষ্যসমূহ তিন প্রকারের— স্বল্পমেয়াদী, মধ্যবর্তী এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য :

দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য

মধ্য বা অন্তর্বর্তীকালীন লক্ষ্য

স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য

লক্ষ্যের শ্রেণী বিভাগ

দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য/উদ্দেশ্যসমূহ বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণভাবে পড়াশুনা করার পর অর্জন করা যায়। এই ধরনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সঙ্গে সঙ্গে বা বার্ষিক পরীক্ষার পর পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ একটি ছাত্র দশ বছর পড়াশুনা করার পর প্রয়োজনীয় দক্ষতা, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গী এবং মূল্যবোধ নিয়ে একজন পরিণত প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হল। পৃথিবীকে জানা ও পরিবেশকে বোঝা খুবই গভীর বিষয়। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য সর্বদা পাঠ্যক্রম গঠনের পূর্বে নির্ধারিত হয়।

মধ্যবর্তী লক্ষ্যসমূহ : এইগুলি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য থেকে পাওয়া যায়। এই ধরনের লক্ষ্য বলতে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাকে বোঝায়— যেমন, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম প্রভৃতি শ্রেণীতে পড়া। এটি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে বোঝায়। যেমন—ভাষা, অংক, বিজ্ঞান প্রভৃতি এই ধরনের লক্ষ্য একটি পর্যায়/ শ্রেণী সম্পূর্ণ করার পর পরিমাপ করা যায়। মধ্যবর্তীকালীন লক্ষ্যসমূহ দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করে।

স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যসমূহ : এইগুলি হল সুনির্দিষ্ট এবং আচরণগত ফলাফল/পরিবর্তন, শিক্ষক শিক্ষাদানের দ্বারা কি অর্জন/ কোন লক্ষ্য পূরণ করতে চান অথবা একটি নির্দিষ্ট পাঠের/কাজের শিক্ষার্থী কতটা শিখেছে তার নিরীখে এটি পরিমাপ/বিচার করা হয়।

1.7.2 শিখন অভিজ্ঞতার নির্বাচন (Selection of Learning Experiences)

পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতা বা তাদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা প্রদান করা উচিত। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান, পরীক্ষাগারে নানা কার্যাবলী ও বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট, সেমিনার, ডিবেট, আলোচনা, দলগত কাজ প্রভৃতি হল শিখন অভিজ্ঞতার উদাহরণ। এই ধরনের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর আচরণে পরিবর্তন আনে, যা পূর্ব নির্ধারিত পাঠ্যক্রমিক লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে।

শিখন অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর শিখন স্তর অনুযায়ী হওয়া উচিত। তাদের বয়স, পরিণমন, চেতনার বিকাশ, শারীরিক বিকাশ, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচনের সময় বিবেচনা করা উচিত। পাঠ্যক্রম

পরিকল্পনার সময় শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজ নির্ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা শিক্ষার্থীদের পূর্ব নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন সুনিশ্চিত করে। পাঠ্যক্রম অনুযায়ী কোন নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতার জন্য শিক্ষকের কার্যাবলীতেও যথেষ্ট নমনীয়তা থাকা বাঞ্ছনীয়।

1.7.3 বিষয়-বস্তু নির্ধারন (Determination of the Contents)

বিষয় হল পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার। ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনে বিষয় বস্তুর অবদান অনস্বীকার্য। সেইহেতু বিষয়বস্তুকে পাঠ্যক্রম রচনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। স্ট্যানলী এবং শোরস্ ১৯৫৭ সালে বিষয় বস্তু নির্বাচনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বলেছিলেন -

(ক) বিষয়বস্তুটি তাৎপর্যপূর্ণ কিনা ?

(খ) অস্তিত্ব বজায় রাখার পরীক্ষায় বিষয়বস্তু উত্তীর্ণ হতে সমর্থ কিনা ?

(গ) বিষয়বস্তু কি ব্যবহারযোগ্য ?

(ঘ) বিষয়বস্তু কি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ?

(ঙ) বিষয়বস্তুটির গণতান্ত্রিক সমাজের বৃদ্ধি ও বিকাশে কোনো অবদান আছে কিনা ?

1.7.4 শিখন বস্তুর/লক্ষ্যসমূহ প্রস্তুতকরন (Preparation of Learning)

শিখন বিষয়বস্তু বলতে পাঠ্যপুস্তক, পরিপুরক বইসমূহ, কাজের বই, শিক্ষক গাইড প্রভৃতিকে বোঝায়. এই বিষয়বস্তু মুদ্রিতরূপে, শোনা, দেখা বা শোনা ও দেখার বিষয়বস্তু হিসাবে থাকতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নির্বাচিত শিখন অভিজ্ঞতা ও উপাদান অনুযায়ী শিক্ষামূলক কার্যাবলীকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজানো। শিখন অভিজ্ঞতা ও কার্যাবলী সুসমঞ্জস্য হওয়া দরকার।

বার্ণার তিন ধরনের শিখনের কথা বলেছেন—

* এ্যানএ্যাকটিভ মোড (কর্মভিত্তিক)
* আইওনিক মোড (যেখানে ছবি ও লেখচিত্র ব্যবহার হয়)।
* সিম্বলিক মোড (যেখানে প্রতীক/ভাষা ব্যবহার হয়)।

উপরের বিভিন্ন ধরনের শিখন থেকে দেখা যায় শিশু সাধারণ ধারণা এবং কর্মের উপর নির্ভর করে শিখতে শুরু করে এবং পরে জটিল ধারণাসমূহ ভাষার সাহায্যে শেখে। প্রতিটি ধরনের শিখনের নির্দিষ্ট বয়স জানার জন্য নির্দিষ্ট পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য আছে, যা বিষয়বস্তু/কাজের গঠনে আলোচনা করা হবে।

1.7.5 রূপায়ন (Implementation)

বিষয়বস্তুর/কাজকর্মের প্রস্তুতকরণের পরবর্তী পদক্ষেপ হল বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের ব্যবহার। আগরওয়াল ১৯৯০ সালে পাঠ্যক্রমের সুনিপুণ ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত মুখ্য বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন—

* পর্ষদ এবং রাজ্যশিক্ষা দপ্তর দ্বারা নতুন পাঠ্যক্রমের সঙ্গে অভিযোজিত হওয়ার জন্য শিক্ষকদের যথাযথভাবে প্রস্তুত করা।

* পাঠ্যক্রমের রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক ও যন্ত্রপাতি যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা।

* জনগোষ্ঠীর নতুন পাঠ্যক্রমের গ্রহণীয়তা।

* নতুন পাঠ্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অতিরিক্ত শ্রম, অর্থ এবং সময়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর যথেষ্ট প্রস্তুতি।

* ফলপ্রসূভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে পাঠ্যক্রমের রূপায়ণের জন্য শিক্ষকদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে তদারকি এবং সাহায্যের সুযোগ সৃষ্টি করা।

1.7.6 মূল্যায়ন (Evaluation)

মূল্যায়ন হল পাঠ্যক্রম গঠন প্রক্রিয়ার শেষ স্তর। পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন দরকার। এটি গুণগত বা পরিমাণগত বা উভয় প্রকারের হতে পারে। মূল্যায়ন মাইক্রো বা ম্যাক্রো পর্যায়ে হতে পারে। মাইক্রো পর্যায়ের মূল্যায়নে বিষয়ের বা প্রতিটি শিখনমূলক কাজকর্মে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যের কতখানি অর্জন করা গেছে তা মূল্যায়ন করা হয়। ম্যাক্রো পর্যায়ের মূল্যায়নে সমগ্র পাঠ্যক্রমিক পদ্ধতি উদ্দেশ্য নির্বাচন থেকে শুরু করে রূপায়ণ পদ্ধতি পর্যন্ত সব বিষয়েরই মূল্যায়ন করা হয়।

1.8 পাঠ্যক্রমের প্রকারভেদ (Types of Curriculum)

* বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম।
* কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম।
* শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম।
* সুসমন্বিত পাঠ্যক্রম।
* কোর প্যাটার্ন পাঠ্যক্রম।

1.8.1 বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Subject-Cenred Curriculum)

এই ধরনের পাঠ্যক্রম বিষয় নির্ভর। এটি প্রচলিত পাঠ্যক্রম এবং বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ই এই ধরনের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। পাঠ্যক্রমে জ্ঞানের নানা শাখার ভাষা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। বিষয়সমূহ শিক্ষার্থীদের শিখন পর্যায় অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত বা উপযুক্ত শাখা এককে উপস্থাপনা করা হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোনো প্রকার সংযোজন বা বিয়োজন না করে বিষয়টির শিখনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করেন।

1.8.2 কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity Centred Curriculum)

কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে পাঠ্যক্রম হল নানান ধরনের কার্যকলাপের সমষ্টি যা মানবিক আত্মার/ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ এবং যেগুলি মহান এবং বিশ্বজনীনভাবে তাৎপর্যপূর্ণ তাই পাঠ্যক্রম। এই ধরনের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী, শিক্ষার্থী আকাঙ্খিত এবং উদ্দেশ্যমুখী বিষয়ের কার্যকলাপে নিজেকে যুক্ত করে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে। এটি জীবনের ব্যবহারিক বিষয়ের উপর জোর দেয়। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা এবং জীবনের সঙ্গে সংযোজিত বিষয়ে শিক্ষার উপর জোর দেয়। পরীক্ষাগারে এবং নির্দিষ্ট স্থানে হাতে কলমে অনুশীলনের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়। পরিধান তৈরী, বাক্স তৈরী, বাড়ীর ক্ষুদ্র সংস্করণ তৈরী প্রভৃতি কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু। নির্দিষ্ট বিষয় উপাদানের তুলনায় পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের স্বার্থে কাজের উপর অধিক আলোকপাত করা হয়।

1.8.3 ক্রিয়াকলাপকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Learner Centred Curriculum)

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে পাঠক্রম হল "বিভিন্ন মানবীয় গুণাবলীর চরমতম প্রকাশ। এসমস্ত মানবীয় গুণাবলী বিশ্বজগতের কাছে স্থায়ী গুরুত্ব বহন করে।" ক্রিয়াকলাপকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম ছাত্রছাত্রীদের মতে অনুমোদনযোগ্য এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ।

ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই প্রকৃত শিক্ষা হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে জীবনের বাস্তব দিকগুলির দিকেই অধিকতর জোর দেওয়া প্রয়োজন। "হাতে কলমে শেখা" এবং "জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শেখা"—এ দুটির ওপরই জোর দেওয়া হয়। আণুবীক্ষণাগারিক কর্ম ও ক্ষেত্রকর্মের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ক্রিয়াকলাপকেন্দ্রিক পাঠক্রমের অন্তর্গত হল পোষাক তৈরি, বাক্স তৈরি, বাড়ির ক্ষুদ্র প্রতিরূপ নির্মাণের মত কার্যাবলী। এই সমস্ত কার্যকলাপ পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কার্যকর হয়।

1.8.4 সুসমন্বিত পাঠ্যক্রম (Integrated Curriculum)

এটি বিষয়কেন্দ্রিক, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের ন্যায়সংগত/সুবিবেচিত মিশ্রণ। এটি শিক্ষার্থীকে ধারণা/বিষয়ের সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। উদাহরণ হিসেবে 'সভ্যতার ইতিহাস' কোর্সে সুসমন্বিত পাঠ্যক্রমে ইতিহাস, সাহিত্য, কলা, মিউজিক এবং সমাজবিদ্যা উপস্থাপনা করা যায়।

সনাতন পাঠ্যক্রম খুবই প্রত্যক্ষ, খণ্ডিত, আংশিক এবং সংযোগবিহীন। এই কারণে জীবন সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ ধারণা দিতে অসমর্থ। এটি জ্ঞানের মিলন ঘটায় না। সুসমন্বিত পাঠ্যক্রমের ধারণা এই ধরনের বাধা অপসারণের সমর্থ।

1.8.5 মৌলিক ধরনের পাঠ্যক্রম (Core Pattern Curriculum)

এটি সমস্যাকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম। এটি গণতান্ত্রিক সমাজে বসবাসের জন্য প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব দেয়। সেই কারণে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, প্রাক্ষোভিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই ধরনের পাঠক্রমে একসাথে দুই তিন পিরিয়ডের সময়ে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয়ে

ক্ষতি না করে ফিল্ড ট্রিপস এবং ছোটো এক্সকারশান করে নিতে পারে। এটি সাহায্য ও পরামর্শের উপর জোর দেয়। জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) জাতীয় পাঠ্যক্রমের কথা বলেছে। জাতীয় শিক্ষাতন্ত্র জাতীয় পাঠ্যক্রমের গঠনশৈলীর উপর নির্ভর করে হবে যেখানে একটি সার্বজনীন কেন্দ্রিক গঠনের সঙ্গে অন্যান্য নমনীয় উপাদানসমূহ থাকবে। একটি রাজ্যে বা দেশের সমস্ত শ্রেণী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম একই, বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অথবা জনগোষ্ঠী বা আঞ্চলিক প্রয়োজনানুযায়ী অকেন্দ্রীয় বিষয়ে স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা ও রূপায়ণের রূপরেখা তৈরি করতে পারে।

1.9 এককের সারাংশ (Unit Summary)

* পাঠ্যক্রম বলতে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন এবং আকাঙ্খিত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রদত্ত সবধরনের মতামত/ধারণা এবং কার্যকলাপের সমষ্টিকে বোঝায়।
* একটি সুপরিকল্পিত এবং সঠিকভাবে রূপায়িত পাঠ্যক্রম শিশুর সূক্ষ্মানুভূতি, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং বৃত্তিমূলক বিকাশের সাহায্য করে।
* জাতীয় বিকাশ/উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক জীবনের জন্য, জীবনের মান নির্ধারণের জন্য, জাতীয় সংহতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বোঝার জন্য পাঠ্যক্রম প্রয়োজন.
* পাঠ্যক্রম গঠনের ভিত্তি হল—সামাজিক চাহিদা, সম্পদের লভ্যতা, মানব উন্নয়ন, শিখনের প্রকৃতি, জ্ঞান ও চেতনার প্রকৃতি।
* পাঠ্যক্রম গঠনের নানান স্তর— লক্ষ্য নিরূপণ, শিখন অভিজ্ঞতার নির্বাচন, বিষয়বস্তু নির্ধারণ, শিখন বস্তুর প্রস্তুতকরণ, রূপায়ণ ও মূল্যায়ন।
* পাঁচটি বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম হল—বিষয়কেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, সুসমন্বিত এবং কোর প্যাটার্ন পাঠ্যক্রম।

1.10 অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। পাঠ্যক্রমের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

২। পাঠ্যক্রমের ভিত্তিসমূহ কি কি? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৩। পাঠক্রম গঠন পদ্ধতির বিভিন্ন স্তরগুলি লিখুন ও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৪। বিভিন্ন প্রকার পাঠ্যক্রমের বর্ণনা দিন। কোন ধরনের পাঠ্যক্রম আপনি পছন্দ করবেন এবং কেন?

1.11 আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Point for Discussion/Clarification)

1.11.1 আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussion)

1.11.2 ব্যাখার সূত্রাবলী (Points for Clarification)

1.12 উৎস (References)

1. Aggarwal, J. C. (1990) Curriculum Reforms in India.
2. IGNOU (1997) Blocks 1 & 2 of Course on Curriculum & Instruction (ES-331, B.Ed.). New Delhi, IGNOU.
3. IGNOU (1997) Block 1 & 2 of Course on Curriculum Development for Distance Education (ES-316, PGDDE), New Delhi, IGNOU).

একক 2 ❑ পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা ও বিকাশের স্তরসমূহ (Steps In Curriculum Planning And Development)

গঠন

2.1 ভূমিকা

2.2 উদ্দেশ্য

2.3 পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা

2.4 বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা

2.4.1 জাতীয় স্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা

2.4.2 রাজ্যস্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা

2.4.3 স্থানীয়স্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা

2.5 পাঠ্যক্রম গঠনের দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ

2.6 পাঠ্যক্রম গঠনের পদ্ধতি

2.6.1 শিক্ষামূলক চাহিদা নির্ধারণ করা

2.6.2 লক্ষ্য গঠন করা

2.6.3 শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন করা

2.6.4 বিষয়বস্তুর নির্ধারণ করা

2.6.5 শিখনবস্তু/কার্যকিলাপসমূহের প্রস্তুতকরণ

2.6.6 রূপায়ন

2.6.7 মূল্যায়ন

2.7 সারসংক্ষেপ (মনে রাখার বিষয়)

2.8 অগ্রগতির মূল্যায়ন

2.9 বাড়ীর কাজ

2.10 আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

2.11 উৎস

2.1 ভূমিকা (Introduction)

প্রথম ইউনিটে পাঠ্যক্রমের ধারণা ও সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; এই অধ্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষার জন্য, ব্যক্তিগত ও সমাজের আকাঙ্খিত ফলের জন্য পাঠ্যক্রম দক্ষতার সহিত সক্রিয়ভাবে পরিকল্পনা করা উচিত। বর্তমানে ভারতীয় বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনায় কিছু অসম্পূর্ণতা, অসাম্য এবং অভাব রয়েছে। আমাদের এই ধরনের অনুশীলনের ব্যবহার বন্ধ করতে সচেষ্ট হওয়া দরকার। বর্তমানে শিক্ষার অভাবপূরণের জন্য এবং শিক্ষা সমস্যা সমাধানের জন্য অধিকতর ভালো পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা জরুরী। সুতরাং পাঠ্যক্রম প্রয়োজনভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন।

এই অধ্যায়ে আমরা পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা ও পাঠ্যক্রম রচনা একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

2.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

* পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার অর্থ এবং বিবেচ্য বিষয়গুলির ব্যাখ্যা;
* বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার ব্যাখ্যা প্রদান;
* পাঠ্যক্রম বিকাশের বিভিন্ন প্রচেষ্টা/দৃষ্টিভঙ্গীর বর্ণনা।
* পাঠ্যক্রম বিকাশের নানান পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত ও বর্ণনা করা।

2.3 পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Designing)

"The pattern or frame work or structural organization used in selecting, planning and carrying forward educational experiences in the school." (Saylor & Alexander, 1956) পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা বলতে, বোঝায় এক কর্মসূচী যা শিক্ষক শ্রেণীতে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষণ কার্যকলাপের জন্য অনুসরণ করেন। পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার।

* আকাঙ্খিত ফল লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকারের শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।
* পরিকল্পনা শিক্ষককে একদল শিক্ষার্থীর সর্বোত্তম অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম করতে সাহায্য করবে।
* পরিকল্পনা শিক্ষণ কার্যকলাপে শিক্ষককে শিক্ষণের তত্ত্বসমূহের ব্যবহারের সুযোগ দেবে।
* শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের সঙ্গে পরিকল্পনাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
* পরিকল্পনা এমনভাবে হবে যাতে শিখন অভিজ্ঞতার ক্রমপ্রবাহমানতা বজায় থাকে।
* পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবিক, গ্রহণযোগ্য, খরচের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, পরিমাপযোগ্য এবং ব্যাপক অর্থে গ্রহণীয় হতে হবে।

পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ—

পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার সময় পাঠ্যক্রম শিক্ষক/রচনাকারীদের নিম্নলিখিত বিষয়ে মনে রাখা উচিত –

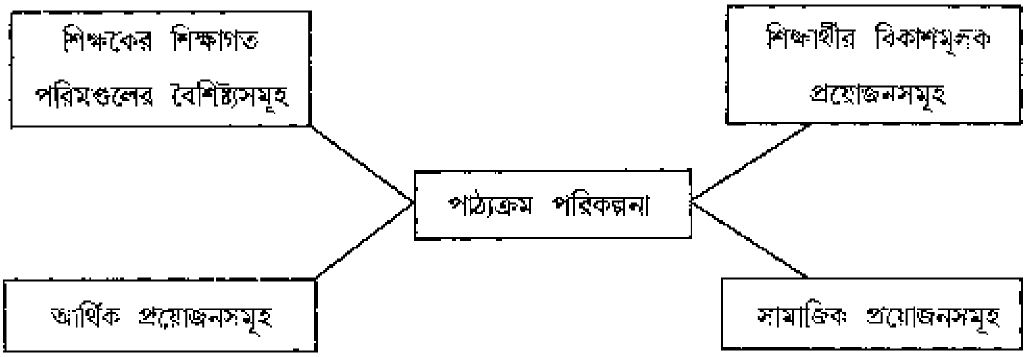

চিত্র 2.1 : পাঠ্যক্রম পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

শিক্ষার্থীদের বিকাশমূলক প্রয়োজনসমূহ : 'পিয়াঁজে'-এর কগনিটিভ বিকাশমূলক তত্ত্ব অনুযায়ী একটি শিশু সেনসরিমোটর স্তর থেকে প্রি-অপারেশানাল স্তরের দিকে এগোয়, এরপরেই কনক্রীট এবং সর্বশেষ স্তর অর্থাৎ ফর্ম্যাল অপারেশন স্তরে পৌঁছায়। অন্যদিকে ব্রুণার তিনটি স্তরের কথা বলেছেন—

এনঅ্যাকটিভ স্তর— কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আইকণিক স্তর— চিত্রকলা সম্পর্কিত।

সিম্বলিক স্তর— চিহ্ন অর্থাৎ ভাষামূলক চিন্তা সম্পর্কিত।

পিঁয়াজে এবং ব্রুনার (Brounner) ছাড়াও অন্যান্য মনোবিদগণ কগনিটিভ বিকাশের গঠনতন্ত্র নিয়ে বলেছেন। তাঁরা উপসংহারে বলেছেন বিকাশমূলক প্রয়োজন শিশুর কগনিটিভ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই কারণে কোনো একদল শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার সময় তাদের বিকাশমূলক প্রয়োজনের কথাও বিবেচনা করা উচিত। শিক্ষার্থীর শারীরিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করা উচিত।

সামাজিক প্রয়োজন/চাহিদাসমূহ : শিক্ষার্থীরা যাতে সমাজের সঙ্গে অভিযোজিত হতে পারে সেই কারণে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাঙ্গনের চেয়ে পৃথিবী অনেক বড় জায়গা। সেই কারণে বর্তমান সমাজে এবং ভবিষ্যৎ সমাজে যাতে আমরা বাস করি বা বাস করবো তাদের সমস্ত ধরনের বৈশিষ্ট্যাবলী বিবেচনা করা দরকার। একটি শিশুর একজন ভালো নাগরিক হিসাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা উচিত। যে সমস্ত সামাজিক বলসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষাতন্ত্রে প্রভাব বিস্তার করছে তাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এককথায় বলা যেতে পারে, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সামাজিক প্রয়োজন পাঠ্যক্রমে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

আর্থিক প্রয়োজনসমূহ : একটি শিশুকে শিক্ষিত করার জন্য কিছু মৌলিক নিবেশ (ইনপুট) যেমন- প্রাকৃতিক পরিবেশের সুযোগ-সুবিধা, শিখন বস্তু এবং শিক্ষক প্রয়োজন। এই ধরনের মৌলিক নিবেশগুলি সরকার, ব্যক্তিগত সংস্থা, জনগোষ্ঠী বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দিয়ে থাকে। শিক্ষক এবং পরিকল্পনাকার হিসাবে

শিক্ষার জন্য খরচ/ব্যয় বিশ্লেষণ করা উচিত। শিক্ষামূলক সম্পদের লভ্যতাও সুনিশ্চিত করা দরকার, যাতে মৌলিক নিবেশগুলি প্রদান করা সম্ভব হয়। পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার সময় পাঠ্যক্রম রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার আয়োজন করার জন্য ব্যয় হিসাবে করা দরকার।

- **শিক্ষকের শিক্ষাগত পরিমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যসমূহ** : শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে পাঠ্যক্রম রূপায়ণের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষাতন্ত্রে শিক্ষকের কার্যকলাপ অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। সেই কারণে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার সময় শিক্ষকের নেপথ্য শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য মনে রাখা দরকার, প্রত্যেক পাঠ্যক্রম-এর জন্য একদল শিক্ষকের প্রয়োজন যাদের উক্ত পাঠ্যক্রম পরিচালনা নিষ্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক যোগ্যতা, পেশামূলক সক্ষমতা ও শিখন আচরণ আছে। নির্দিষ্ট পরিচালনার জন্য শিক্ষকের লভ্যতা সুনিশ্চিত করা দরকার অথবা শিক্ষকের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা তাও দেখা দরকার।

আলোকপাত ঃ

১। পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা বলতে কি বোঝেন? নিজের ভাষায় লিখুন।

____

____

২। পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহের তালিকা তৈরী করুন। তালিকার মধ্যে কোনটি অধিকতর বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

____

____

৩। শিক্ষার্থীর বিকাশমূলক স্তর সম্পর্কিত জ্ঞান কিভাবে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনায় সাহায্য করে বর্ণনা করুন।

____

____

৪। পাঠ্যক্রম গঠনে প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক বল সমূহের বর্ণনা দিন।

____

____

৫। পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার সময় কি ধরনের আর্থিক বিবেচনা মনে রাখা দরকার?

____

____

2.4 বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Planning At Various Levels)

পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা হল কাজকর্ম যা বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদান ও শিখন পরিস্থিতির নক্সা তৈরীর সঙ্গে যুক্ত। তিনটি স্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার কার্যকলাপ সংগঠিত করা যেতে পারে।

* জাতীয় স্তরে/পর্যায়।
* রাজ্য স্তরে/পর্যায়।
* স্থানীয় স্তরে/পর্যায়।

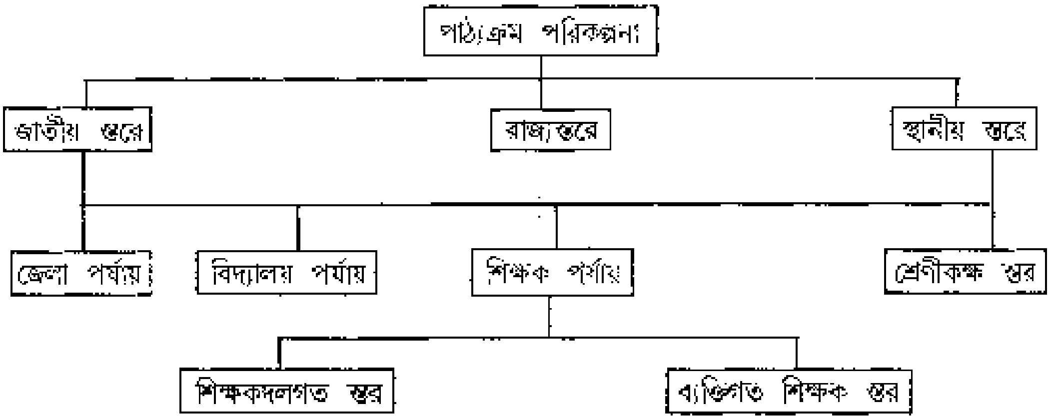

চিত্র ২.২ : বিভিন্নস্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা

2.4.1 জাতীয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Planning at the National Level)

এই পর্যায়ের পরিকল্পনায় দক্ষ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন—পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা, বিষয়বস্তু (মৌলিক শাখাসমূহ থেকে যার জন্য পাঠ্যক্রম তৈরি করা হচ্ছে, দর্শন, মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, গণমাধ্যম প্রভৃতি থেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের নিয়ে দল গঠন করা দরকার, যারা আলোচনার মাধ্যমে দেশের সর্বত্র রূপায়ণের জন্য একটি পাঠ্যক্রম গঠন করবেন।

জাতীয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত

* উপাদান বা বিষয়বস্তুর চিহ্নিতকরন।
* বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
* শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী দ্বারা সম্পাদিত কাজের নির্বাচন গঠন।

* পুর্নগঠনের জন্য পরিপূরক বিষয়বস্তুর তালিকা তৈরী করা।

* শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার নির্ধারণ করা।

উপরে উল্লিখিত কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করে শিক্ষকদের দেওয়া হয় যার গুণগত দিক বজায় রাখা হয়।

যদিও জাতীয় পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে অনেক সুবিধা/যেমন-সময় এবং অর্থসাশ্রয়, দক্ষব্যক্তিদের নিয়োগ প্রভৃতি আছে, তবুও এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। জাতীয় পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিফলিত নাও হতে পারে। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকার কারণে রাজধানী দিল্লীর শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রম নাগাল্যাণ্ডের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। জাতীয় প্রয়োজন পূরণের স্বার্থে স্থানীয় এবং রাজ্যস্তরে প্রয়োজন অপরিলক্ষিত হওয়ার কারণে পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রীকরণ অভিপ্রেত নয়।

2.4.2 রাজ্য পর্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Planning at the State Level)

রাজ্যস্তরে পরিকল্পনায় একদল রাজ্যস্তরের শিক্ষাবিদ (শিক্ষক, অধ্যক্ষ, বিদ্যালয়, তত্ত্বাবধায়ক, পাঠ্যক্রম কো-অর্ডিনেটর, শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ প্রভৃতি) রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরের অধীনে কাজ করেন তাঁরা পাঠ্যক্রমের নকশা তৈরি করেন যা রাজ্যের সর্বত্র রূপায়ন করা হয়।

রাজ্যে শিক্ষা পরিচালকের কার্যালয়, SCERTs মাধ্যমিক এবং শিক্ষা সংসদ রাজ্যস্তরের পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনার জন্য দায়বদ্ধ।

রাজ্যস্তরে পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা হল স্থানীয় আগ্রহ এবং উন্নয়ন এবং তৃণমূল স্তরের সমস্যা রাজ্য পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে প্রতিফলিত নাও হতে পারে।

2.4.3 স্থানীয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Planning at the Local Level)

স্থানীয় স্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনায় তৃণমূল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং জনগোষ্ঠী পাঠ্যক্রম পরিকল্পনায় নিযুক্ত হয়। এই ধরনের পাঠ্যক্রম শিশুকেন্দ্রিক হয়ে থাকে।

কোঠারী শিক্ষা কমিশন (১৯৪৫-৫৬) স্থানীয় স্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছে একটি রাজ্যস্তরে পাঠ্যক্রম যা গড়ে স্কুলের প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয় তা অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই ক্ষতিকর বিশেষ করে দুর্বল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে। এর একমাত্র সমাধান হল স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী পাঠ্যক্রম গঠন এবং ক্রমোন্নয়ন।

স্থানীয় স্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনাকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—

* জেলা পর্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা।

* বিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা।

* শিক্ষক পর্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা।

* শ্রেণীকক্ষ পর্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা।

জেলা পর্যায়ের পাঠ্য পরিকল্পনায় জেলা স্তরের ব্যক্তিত্বরা ও শিক্ষকরা জেলার প্রয়োজন নির্ভর উপযুক্ত পাঠ্যক্রম গঠনে নিযুক্ত থাকেন। বিভিন্ন বিষয়ে আঞ্চলিক দৃষ্টিকোন থেকে চিহ্নিত করা হয়। আঞ্চলিক এবং স্থানীয় ভূগোল পাঠ্যক্রমে যথাযথ স্থান পায়।

বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনায় অভিভাবক, পরিচালক, পরামর্শদাতা এবং শিক্ষার্থীরা নিযুক্ত থাকে, যাতে পাঠ্যক্রমে তাদের প্রয়োজনসমূহ প্রতিফলিত হয়। এই দল ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা অধিকতর ভালোভাবে বুঝে অধিকতর বাস্তবমুখী পাঠ্যক্রম করতে পারে।

শিক্ষক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়— ব্যক্তিগত ও দলগত পর্যায়ের পাঠ্যক্রম। বিভিন্ন বিষয় থেকে শিক্ষক মিলে দলও পাঠ্যক্রম গঠন করে। এই ধরনের পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি বলেও পরিচিত।

শিক্ষকের ব্যক্তিগত পর্যায়ের পাঠ্যক্রম পরিকল্পনায় একজন শিক্ষক এককভাবে তার শিক্ষাদানের লক্ষ্য স্থির করেন। তিনি শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু এবং কার্যকলাপ নির্ধারণ করেন। তিনি প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন।

শ্রেণী কক্ষমূলক পাঠ্যক্রম পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে কাজ করে। তারা স্থির করে, কাজকর্ম কি, কিভাবে, কে, কোথায়, কখন তারা গ্রহণ করবে।

আলোকপাত ঃ-

১। বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার তালিকা তৈরি করুন।

২। তিনটি পর্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা (জাতীয়, রাজ্য এবং স্থানীয়)র মধ্যে ভারতীয় পরিস্থিতিতে কোনটি উপযুক্ত? উত্তরের যথার্থতা বিচার করুন।

৩। জাতীয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রমের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লিখুন।

2.5 পাঠ্যক্রম গঠনের দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ (Approaches to Curriculum Development)

পাঠ্যক্রম গঠন করার এবং পরিচালনার নানান দৃষ্টিকোন নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে তৈরি রূপরেখা বা নকশা হল পাঠ্যক্রমিক দৃষ্টিভঙ্গী। এটি হল পরিকল্পিত বা সংগঠিত পদ্ধতি যা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা প্রদানের সময় অনুসরণ করেন।

পাঠ্যক্রম গঠনের নানা দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। IGNOU ১৯৯৭ সালে এদের চারটি বিভাগে ভাগ করেছে।

* **বিষয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী**

* **ব্রডফিল্ড দৃষ্টিভঙ্গী**

* সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী
* শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী

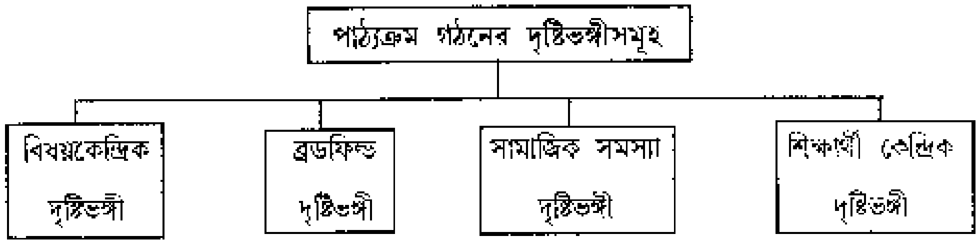

বিষয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ের আলাদা পাঠ্যক্রম তৈরী করা হয়। এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত দৃষ্টিভঙ্গী, এখানে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনাকারের প্রধান দায়িত্ব হল বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্র নির্ধারণ করা এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য ভিন্ন শিক্ষক নির্ধারণ করা! অধ্যয়নের কর্মপরিকল্পনা বিভিন্ন বিষয় যেমন ভাষা, অংক, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিভক্ত।

ব্রডফিল্ড দৃষ্টিভঙ্গী ঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী দুই বা ততোধিক নিকট সম্পর্কিত বিষয় একসঙ্গে যুক্ত করে একক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তৈরী করা হয়। উদাহরণ : জীববিদ্যা— উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি নিয়ে গঠিত।

সামাজিক সমস্যা দৃষ্টিভঙ্গী ঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সমাজ পরিলক্ষিত মুখ্য সমস্যাসমূহ নিয়ে পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে এবং তাদের সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলে। যেমন—পরিবেশ সমস্যা, ধর্ম, জনসংখ্যা, যোগাযোগ, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি কোর্স এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী গঠন করা যায়।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ঃ এটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনের উপর আলোকপাত করে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী শিশুকে বর্তমানের পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন পূরণের জন্য মনোবিদ্যাগত ভাবে বলিষ্ট এবং উদ্দেশ্যমুখী শিক্ষণ অভিজ্ঞতা নির্বাচন করা দরকার, শিখন অভিজ্ঞতা সমূহ শিক্ষার্থীর গঠনমূলক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত।

আলোকপাত ঃ

চারটি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ভারতীয় পরিস্থিতিতে কোনটি সর্বাধিক উপযুক্ত বলে মনে করেন ?

____

____

____

____

____

2.6 পাঠ্যক্রম বিকাশের পদ্ধতি (Process of Curriculum Development)

এটি একটি সুসংগঠিত কার্যকলাপ। সেই কারণে পাঠ্যক্রম গঠনের সময় সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিবেচনা করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ অনুসরণ করা দরকার। একটি গতিশীল এবং প্রয়োজন ভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ অনুসরণ করা দরকার।

* শিক্ষার প্রয়োজন নির্ধারণ করা।
* লক্ষ্য তৈরি করা।
* শিখন অভিজ্ঞতার নির্বাচন করা।
* বিষয়বস্তুর নির্ধারণ করা।
* শিখন বস্তু প্রস্তুত করা।
* রূপায়ন।
* মূল্যায়ন।

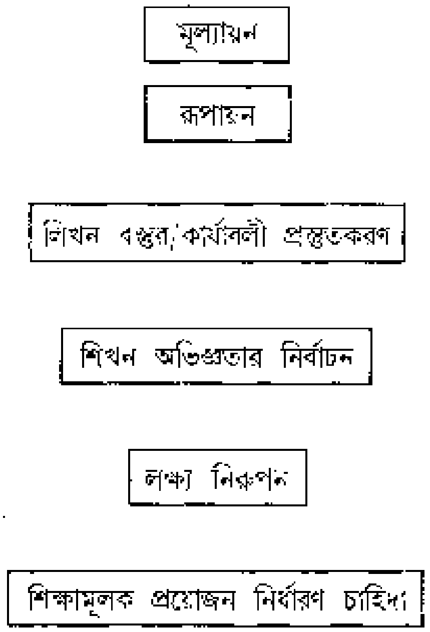

চিত্র ২.৪ ঃ পাঠ্যক্রম গঠনের ধাপসমূহ

2.6.1 শিক্ষামূলক প্রয়োজন/চাহিদা নির্ধারন (Assessment of Educational Needs)

ভারত বহু/মিশ্র সংস্কৃতিযুক্ত দেশ। শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত পরিমণ্ডল এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, সময় থেকে সময়ে এমনকি শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের চাহিদা নির্ধারণ

করা খুবই জরুরী। যে দলের জন্য পাঠ্যক্রম তৈরি করা হবে তাদের এবং তাদের সমস্যা চিহ্নিত করা দরকার।

প্রথম ধাপ হিসাবে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনাকারের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাজের বিশ্লেষণ করা দরকার। এখানে কাজের বিশ্লেষণ বলতে শিখন অভিজ্ঞতাকে বোঝানো হচ্ছে। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর কোন একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীর কাজের বিশ্লেষণ করার পর শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বা চাহিদা নির্ধারন করা হয়, এখানে চাহিদা বা প্রয়োজন বলতে কি আছে এবং কি হওয়া উচিত এই দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্য বা অভাবকে বোঝায়। যখন শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গী থাকে না তখন শিক্ষামূলক প্রয়োজন বা চাহিদা অনুভব করা হয়।

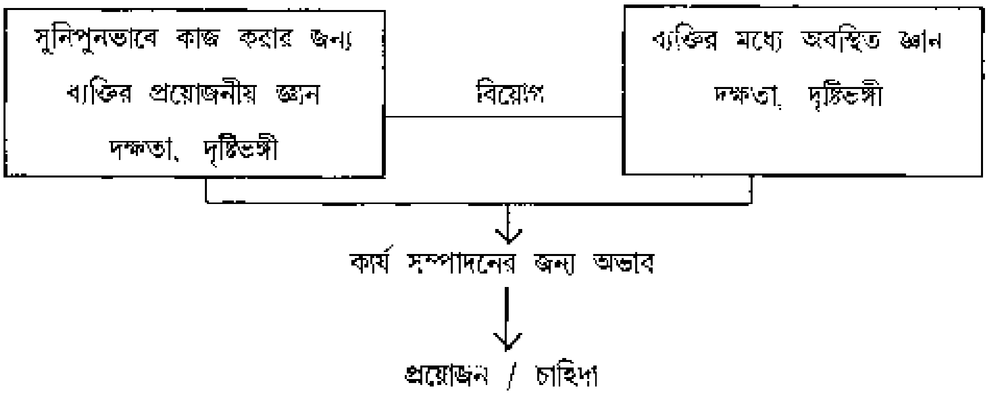

চিত্র ২.৫ : প্রয়োজনের ধারণা

শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক চাহিদা নির্ধারণ করার জন্য নিম্নলিখিত প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে:

* ডায়াগনোসটিক্ পরীক্ষা।
* প্রশ্নমালা।
* ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন।
* শিক্ষার্থীর শ্রেণী কক্ষের আচরণ পর্যবেক্ষণ।
* স্টাফদের মূল্যায়ণ।
* শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের বিশ্লেষণ।
* পর্যায়কালীন মূল্যায়ন রিপোর্ট।

আলোকপাত :

১। পাঠ্যক্রম গঠনের বিভিন্ন ধাপসমূহ পর্যায়ক্রমে লিখুন।

____

____

২। পাঠ্যক্রম গঠনের জন্য শিক্ষামূলক চাহিদার নির্ধারণ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান 'যা আপনি মনে করেন ঠিক তবে কেন ঠিক এবং যদি না তবে কেন না।'

____

____

৩। শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক চাহিদা নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ে লিখুন।

____

____

2.6.2 লক্ষ্য নিরুপন (Formulation of Objectives)

শিক্ষার্থী বিষয়ক সব তথ্য এবং চাহিদা সমূহকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যাবলীতে পরিণত করা দরকার— যেমন স্বল্পমেয়াদী, মধ্যবর্তীকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য। লক্ষ্যস্থির করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ে বিবেচনা করা দরকার।

* লক্ষ্যসমূহ কগনিটিভ, অ্যাফেকটিভ ও সাইকোমোটোর এই তিন ভাগের যে কোনো একটিতে শ্রেণীবদ্ধ হওয়া উচিত। লক্ষ্যসমূহের সঠিক দলবদ্ধকরণ অর্থবহ পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা ও গঠনের সাহায্য করে।

* শিক্ষার্থীর প্রতিটি চাহিদার জন্য লক্ষ্য থাকা উচিত। সেই কারণে চাহিদার সংখ্যা অনুযায়ী লক্ষ্যও হবে। প্রতিটি শিক্ষামূলক লক্ষ্যের জন্য শিখন অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

* যদি শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান/ইনস্ট্রাকশান/স্কুলিং এর পর তার আচরণের নিরিখে লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করা হয় তবে লক্ষ্যসমূহ সর্বাধিক ফাংশানাল হবে।

* লক্ষ্যসমূহে পৌছানো শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক লক্ষ্যে পৌছানোর পথে নিয়ে চলে।

* সমাজের পরিবর্তনশীল চাহিদা অনুযায়ী লক্ষ্যের রূপান্তর, পরিবর্তন করা উচিত। এটি শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখতে সাহায্য করে।

* লক্ষ্য যথাযথভাবে সঠিক শব্দে প্রকাশ করা দরকার যাতে শিক্ষার্থী অভীষ্টফল সম্পর্কে বুঝতে পারে। অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক কোনো কিছু থাকলে এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

আলোকপাত ঃ

মনে করুন অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার বিষয় ক্ষেত্রের জন্য লক্ষ্য গঠন করতে হবে। আপনি কি ধরনের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করবেন।

2.6.3 শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন (Selection of Learing experiences)

শিখন অভিজ্ঞতা বলতে প্রাকৃতিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক বা তাদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতাসমূহকে বোঝায়। অভিজ্ঞতারাশি শিক্ষার্থীর আচরণে আকাঙ্খিত পরিবর্তন আনে এবং শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন পাঠ্যক্রমিক লক্ষ্য পূরণের পথে পরিচালিত করে।

১৯৬৩ সালে উড শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচনের জন্য দশটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছিলেন।

* শিখন অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর স্বীকৃত চাহিদাকে সন্তুষ্ট করবে।
* এটি শিক্ষার্থীর পরিনমন ও বোধশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ হবে।
* এটি সংগতিপূর্ণ, নিরবিচ্ছিন্ন ও গতিশীল উদ্দেশ্য গঠন করা উচিত।
* এটি সামাজিক মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে হওয়া উচিত।
* এটি ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* এটি বাস্তবমুখী হওয়া দরকার।
* এটি সুনিপুন হওয়া উচিত।
* এটি কৃত্রিম বাধার যেমন শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়াল-এর মধ্যে, বিষয়বস্তুতে, শ্রেণী ঘন্টার বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।
* এটি সম্পাদনাযোগ্য হওয়া উচিত।

2.6.4 বিষয়বস্তু নির্ধারণ (Determination of Content)

বিষয়বস্তু বলতে পাঠ্য পুস্তিকা বা ঘটনা, ধারণা, সামান্যীকরন, নিয়মনীতি এবং তত্ত্বসমূহের সংক্ষিপ্তসারকে বোঝায়। গণতান্ত্রিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর অবদান অনস্বীকার্য। সেই কারণে বিষয়বস্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর নির্বাচনের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা দরকার।

* বিষয়বস্তু সংগঠিত ক্ষেত্রের জ্ঞানের সহিত তাৎপর্যপূর্ণ কিনা ?
* বিষয়বস্তু যোগ্যতা যথার্থতা নির্ণায়ক পরীক্ষাতে সফল কিনা ?
* এটি ব্যবহারযোগ্য কিনা ?

* এটি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় কিনা ?
* বিষয়বস্তুর গণতান্ত্রিক সমাজের বৃদ্ধি ও বিকাশে অবদান আছে কিনা ? এছাড়া বিষয়বস্তুর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা দরকার।
* বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করা উচিত।
* এর মৌলিক বিষয় এবং ধারণা প্রভৃতিতে অবদান থাকা উচিত।
* বিষয়বস্তু এমন হওয়া উচিত যাহাতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হয়।
* এটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির সঙ্গে পূর্ণ হওয়া দরকার।
* এটি শিক্ষার্থীর কর্ম পরিস্থিতিতে ব্যবহারযোগ্য হওয়া উচিত।
* এটি সময় ব্যয় ও সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানান সই হওয়া উচিত।

আলোকপাত ঃ

১। ধরে নিন আপনাকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন করতে বলা হয়েছে। আপনি কি ধরনের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করবেন ?

২। পাঠ্যক্রম গঠনে বিষয়বস্তু নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ তা ১০০টি শব্দে নিজের ভাষায় লিখুন।

2.6.5 শিখন বস্তুর / কাজের প্রস্তুতকরণ (Preparation of Learning Materials/Activities)

এখনও পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক প্রয়োজন, লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তুর চিহ্নিতকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর শিক্ষামূলক কার্যকলাপ শিক্ষণ অভিজ্ঞতা ও বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমিক ভাবে সাজাতে হবে। এটি শিখন বিষয়বস্তুর প্রস্তুত করার দ্বারা সম্পন্ন করা যেতে পারে। শিখন বস্তু শিখন অভিজ্ঞতাকে মুদ্রিত বা রেকর্ড আকারে সংগঠিত করে। শিখন বস্তু বা কার্যকলাপের সংগঠন, পারস্পরিক সংযোগ এবং পর্যায়ক্রমিক ভাবে সাজানো নির্ভর করে বিদ্যালয় এবং শ্রেণী কক্ষে শিখন পরিস্থিতির লক্ষতার, পরিকাঠামোগত লক্ষতা, শিক্ষার্থীর বিকাশ স্তর, শিখনের নিয়মাবলী এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক পটভূমিকার উপর। শিখন বস্তু হল পাঠ্য পুস্তক, পরিপূরক পঠন, কর্ম শিক্ষার বই, শিক্ষক গাইড, শ্রবণ ও ভিডিও কর্মপরিকল্পনা প্রভৃতি।

বিষয়বস্তুর প্রস্তুতকরন খুবই জটিল কাজ। এর জন্য শিক্ষা শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বার্ণার তিন ধরনের শিখনের কথা বলেছিলেন—এন এ্যাকটিভ (কর্মনির্ভর শিখন), আইওনিক (ছবি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে শিখন) এবং সিম্বলিক (প্রতীক ভাষার মাধ্যমে শিখন)।

১৯৬৩ সালে উড শিখন বস্তুর নির্বাচনে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছিলেন।

* সমস্ত শিখন বস্তুর শিক্ষার্থীর স্বীকৃত প্রয়োজন পূরণে নির্দিষ্ট অবদান থাকা উচিত।
* একটি দলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণে নানা ধরনের শিখন বস্তুর ব্যবহার করা উচিত।

* শিখন বস্তু যতদূর সম্ভব প্রমাণসিদ্ধ সঠিক এবং নির্ভুল হওয়া উচিত। ইহা বিশ্লেষণের ব্যক্তিনিরপেক্ষতা বাড়াতে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে।

* যোগ্যতার নিরিখে শিখন বস্তু নির্বাচন করা উচিত। যে ধরনের বস্তু অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ শিখনে সমর্থ তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

* আর্থিক বিষয় সর্বদা একটি ভাবা দরকার। একই পরিমাণ শিখনে সমর্থ সাপেক্ষ তাহাই পছন্দ করা উচিত।

2.6.6 রূপায়ন (Implementation)

শিখন বস্তু প্রস্তুত করার পরবর্তী পদক্ষেপ হল শ্রেণী কক্ষে পাঠ্যক্রম এর প্রয়োগ। এটি হল প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা শিখন বা পাঠ্যক্রম এর প্রয়োগ। শিক্ষক, অধ্যক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালন কমিটির সদস্যদের পাঠ্যক্রমের প্রকৃত প্রয়োগের জন্য প্রশিক্ষণ এর দেওয়া যেতে পারে। ১৯৯০ সালে আগরওয়াল পাঠ্যক্রমের সুনিপুন প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বলেছিলেন—

* পর্ষদ ও রাজ্য শিক্ষাদপ্তর দ্বারা শিক্ষকদের যথাযথ প্রস্তুত করা যাতে তাঁরা নূতন পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পূরণে সক্ষম হন।

* পাঠ্যক্রম রূপায়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষা সহায়ক বস্তু এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।

* জনগোষ্ঠীর নূতন পাঠ্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা।

* শিক্ষার্থীদের নূতন পাঠ্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অতিরিক্ত সময়, অর্থ ও শক্তি নিয়ে যথেষ্ট ভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার।

* পাঠ্যক্রমের সুনিপুন এবং সক্রিয় ব্যবহারের জন্য শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত তদারকি ও সাহায্যের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

2.6.7 মূল্যায়ন (Evaluation)

একটি ভালো পাঠ্যক্রমের অত্যাবশ্যকীয় গুণ হল ধারাবাহিক মূল্যায়ন। মূল্যায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার জন্য পাঠ্যক্রমের উপযুক্ত পরিবর্তন সাধন করা। মূল্যায়ন গুণগত বা পরিমেয় হতে পারে, মূল্যায়ন ম্যাক্রো বা মাইক্রো যে কোনো পর্যায়ে করা যেতে পারে। মূল্যায়ন গঠনমূলক (Formative) এবং সমষ্টিগত (Summative) স্তরেও করা যেতে পারে। পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন পাঠ্যক্রমের মান নির্ধারণ করে। এটি যে উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা পূরণ হয়েছে কিনা তা নির্ধারন করে।

দুই ধরনের মূল্যায়ন হয়

* শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন।

* পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন।

শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন—এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষামূলক লক্ষ্য কতটা শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পেরেছে তা নির্ধারণ করা। এটি নানা ভাবে করা যেতে পারে।

* মৌখিক মূল্যায়ন।
* শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাশিখন সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের পরিধি নির্ণয়ের মাধ্যমে
* লিখিত মূল্যায়ন— যেমন প্রজেক্ট রিপোর্ট, ক্লাস নোটস, নির্দিষ্ট কাজের উত্তর পত্র, ক্রমাগত শ্রেণী পরীক্ষা, পর্যায়ান্তর পরীক্ষা প্রভৃতি।

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন—পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন বলতে পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন উপাদান যেমন—লক্ষ্য, বিষয়, শিখন বস্তু, শিক্ষা পরিকল্পনা, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মূল্যায়নকে বোঝায়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন এবং পরিমার্জনের জন্য প্রতিক্রিয়া (feed back) গ্রহণ করা।

আলোকপাত :

১। মনে করুন আপনাকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন বস্তু প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। আপনি কি ধরনের বৈশিষ্ট্য অনুসরন করবেন?

২। পাঠ্যক্রমের সুনিপুন প্রয়োগের মুখ্য বিষয়গুলি কি কি?

৩। অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য আপনি কি ধরনের প্রযুক্তি অনুসরন করবেন সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

2.7 এককের সারাংশ (Unit Summary)

মনে রাখার বিষয়--পাঠ্যক্রম তৈরী করার সময় পাঠ্যক্রম রচনাকারীকে শিক্ষার্থীদের বিকাশমূলক প্রয়োজন, সামাজিক চাহিদা এবং শিক্ষকের শিক্ষাগত পটভূমি/ বৈশিষ্ট্যাবলী বিবেচনা করা উচিত। তিনটি পর্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা করা যেতে পারে। জাতীয়, রাজ্য এবং স্থানীয় স্তরে পাঠ্যক্রম গঠনের বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীগুলি হল—বিষয় কেন্দ্রিক, ব্রডফিল্ড, সামাজিক, সমস্যা, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। গতিশীল সাবলীল এবং প্রয়োজন নির্ভর পাঠ্যক্রম গঠনের জন্য নিম্নলিখিত শিক্ষামূলক পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করা দরকার--

* চাহিদা নির্ধারন।
* লক্ষ্য স্থির করা।
* শিখন অভিজ্ঞতার নির্বাচন।
* বিষয় নির্ধারন।
* শিখন বস্তু কাজ প্রস্তুত করা।
* রূপায়ন প্রয়োগ।
* মূল্যায়ন।

2.8 অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Profress

১। পাঠ্যক্রমের রূপরেখা নির্ধারণে কি কি বিষয় বিবেচনা করা উচিত? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২। বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

৩। পাঠ্যক্রম গঠনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীগুলি কি কি? প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গী উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

৪। মনে করুন আপনাকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম গঠন করতে বলা হয়েছে। এই পাঠ্যক্রমের জন্য লক্ষ্য তালিকা এবং বিষয় নির্ধারণ করুন।

2.9 বাড়ীর কাজ (Assignment)

সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য তালিকা এবং বিষয়সমূহ নির্ধারণ করুন।

2.10 আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion/Clarification)

2.10.1 আলোচনার সূত্রাবলী (Point for Discussions)

2.10.2 ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification)

2.11 উৎস (References)

1. Aggarwal. J. C. (1990) *Curriculum Reforms in India*. New Delhi : Doaba House.
2. IGNOU (1997), ES-331 : Curriculum and Instruction : Curriculum Planning, **New Delhi : IGNOU.**
3. Saylor, **J. G.** and Alexander, W.M. (1956) Curriculum Planning for Better Teaching and Learning. New York : Kehart & Company.
4. Singh, L. C. Singh, A (1999) 'Paradign for teacher development through distance education a concept paper' IGNOU-UNESCO Chair, **New Delhi, IGNOU**
5. Wilson, Bob (1987) *The System Design of Training Courses*. Lancashire : The Parathenon Group Limited.
6. Wood, H. B. (1963) *Foundation of Curriculum Planning and Development*. The American - Nepal Educational Foundation. Oregon : Eugene.

একক ৩ ❑ মুক্ত শিক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম (Modular Curiculum In Open Learning)

গঠন

3.1 ভূমিকা

3.2 উদ্দেশ্য

3.3 মডিউলার পাঠ্যক্রমের অর্থ

3.4 দূর শিক্ষায় মডিউলার কোর্স

3.5 শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতার সহিত সংযুক্ত সমস্যাবলী

3.6 মুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলী

3.7 কোর্সের বিষয়বস্তু প্রস্তুতকরন

3.8 এককের সারাংশ

3.9 অগ্রগতির মূল্যায়ন

3.10 বাড়ীর কাজ

3.11 আলোচনার সূত্রাবলী

3.12 উৎস

3.1 ভূমিকা (Introduction)

আমরা এক এবং দুই নম্বর ইউনিটে পাঠ্যক্রমের অর্থ এবং তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এই ইউনিটে 'মুক্ত শিক্ষায় মডিউলার পাঠ্যক্রম' এ আমরা মডিউলার কোর্সের অর্থ, দূর শিক্ষায় মডিউলার পাঠ্যক্রমের ভূমিকা কোর্সের বিষয়বস্তু তৈরীর সময় বিবেচ্য বিষয় এবং কোর্সের বিকাশ সাধনকারীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব।

3.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

* মডিউলার পাঠ্যক্রমের ধারণা ব্যাখ্যা।

* দূর শিক্ষায় মডিউলার পাঠ্যক্রমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা।
* মুক্ত শিক্ষার কোর্সের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করার সময় বৈশিষ্ট্যাবলী মনে রাখা।
* শিক্ষার্থী কেন্দ্রিকতার সম্বন্ধীয় সমস্যাবলী আলোচনা।
* বিষয়বস্তুর প্রস্তুতকরনে সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা।

3.3 মডিউলার পাঠ্যক্রমের অর্থ (Meaning of Moduler Curriculum)

একটি মডিউলার কোর্সের একাধিক আত্মশিক্ষামূলক একক থাকে। যেমন একজন ব্যক্তি মেকানিকস কোর্সে অধ্যয়ন করার সময় 'ইঞ্জিন', 'ট্রান্সমিশন', 'ব্রেকস', 'স্টিয়ারিং ও সাপেনশান' এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে মডিউল নিতে হয় বা একটি মডিউল নিতে পারে। মডিউলসগুলো একক ভাবে সমৃদ্ধ কোর্সের বিষয়বস্তু এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি মডিউলস একটি নির্দিষ্ট শিক্ষার লক্ষ্য বা লক্ষ্যসমূহ, জ্ঞান, দক্ষতা এবং কার্যসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকিলাপ নিয়ে গঠিত। মডিউলার কোর্সের গঠন নমনীয় শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য আদর্শ। এখানে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ এবং বাহির হওয়ার সুযোগ থাকে।

3.4 দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় মডিউলার কোর্স (Modular Course in Distance Learning)

বেশির ভাগ দূর শিক্ষার কোর্সগুলি হল মডিউলার এবং শিক্ষার্থীর পছন্দ নির্ভর যাতে তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণ হয়। কিছু সমালোচকের মতে এই নূতন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা মর্যাদা এবং সহজলভ্যতার জন্য বিকাশলাভ করেছে। কারণ এখানে স্টাফের উন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং সাধারণভাবে বয়স্ক শিক্ষার জন্য কম ব্যয় সাপেক্ষ। অনেক শিক্ষক, ম্যানেজার এবং অন্যান্য পেশাদারগণ মুক্ত এবং দূর শিক্ষার দ্বারা তাদের পেশাদায়িত্ব বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন, এমন কি মাস্টার ডিগ্রী বা ডক্টরেট ডিগ্রীও অর্জন করা সম্ভব। যে বৃত্তিজীবীদের শ্রেণীকক্ষে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এবং সময় খুবই কম তাদের কাছে এ কোর্স খুবই জনপ্রিয়।

মডুলারাইজেশন হল নমনীয় পাঠ্যক্রমকে শিখনের একাধিক ছোটোছোটো ব্লকে ভাগ করার পদ্ধতি যাতে প্রতিটি ব্লক পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত থাকে। মডুলারাইজেশন হল পাঠ্যক্রমকে স্বতন্ত্র এবং অপেক্ষাকৃত ছোটো শিখন অভিজ্ঞতায় বিভক্ত করা, এই ধরনের কোর্স (মডিউলের) সম্পূর্ণ করার পর পূর্ণ সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি নাও পাওয়া যেতে পারে, বা পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় তৎসংযুক্ত কোর্স সম্পূর্ণ করলে সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী পাওয়া যেতে পারে।

প্রাথমিক ভাবে মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের মডিউলারাইজেশনের দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ নতুন ধরনের শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রমিক ভিত্তি গঠন এবং স্বীকৃতি প্রদান করা যা প্রযুক্তিগত এবং কর্মমুখী শিক্ষা উদ্যোগ (TVEI-Technical and Vocational Education Initiative) দ্বারা উৎসাহিত করা হচ্ছে, কিন্তু প্রচলিত বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যক্রমে চালু করার সুযোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি মডিউলের শেষে মূল্যায়ন

প্রথাগত অন্তিম মূল্যায়নের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সেইহেতু প্রতিটি মডিউলের পরিসমাপ্তি সার্টিফিকেটের পথে পরিচালিত করে যা পূর্ণ সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী নয়।

3.5 শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতার সঙ্গে সংযুক্ত সমস্যাবলী (Some Problems Associated with Learner-Centedness)

মডিউলারাইজেশন শিক্ষার্থীকে তার নিজের শিখনের ম্যানেজার হিসাবে তুলে ধরে যার পুনর্নিবেশ (Feed-back) প্রয়োজন এবং যা নিজের শিখন পরিকল্পনার উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। যদি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল লক্ষ্য শিক্ষকের ভূমিকা এবং খরচ কমানো হয় তবে এটা খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু কম শিক্ষাদান নির্ভর এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা যোগ্যতায় কতখানি অতিরিক্ত দক্ষতামান বাড়াতে সক্ষম তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়। শিক্ষার্থীকে চেষ্টা এবং ভুলের মাধ্যমে শিক্ষাদানে উৎসাহিত করা ছাড়া শিক্ষার্থী নিজেই কতটা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ তা নির্ণয় করা খুবই জটিল। এই ব্যবস্থার দ্বারা পৃথিবীর কর্মযজ্ঞের জন্য যুব সম্প্রদায়কে কতটা উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব, যেখানে বেশির ভাগ কাজের জন্য ধারণামূলক জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রয়োজন যা এককভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়, তা নিয়েও চিন্তাভাবনার অবকাশ থেকে যায়।

3.6 মুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলী (Features of Open Leaning Material)

মুক্ত শিক্ষার বিষয় বস্তু সাধারণ পাঠ্যপুস্তকের ন্যায় লেখা যায় না। পাঠ্যপুস্তক বিষয় বস্তুর উপর আলোকপাত করে সাহায্য/পরামর্শ প্রদান করে না। পাঠ্যপুস্তক তুলনামূলকভাবে বিষয়ের যুক্তি অনুযায়ী সংগঠিত করা হয়। শিখনের যুক্তি অনুযায়ী নয়। পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর তুলনায় বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। মুক্ত শিখনের বিষয় বস্তু গঠনগত এবং কার্যগতভাবে পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে আরও জটিল।

* যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মুক্ত শিক্ষাকে তাদের কোর্সের সঙ্গে যুক্ত করতে চায় তাঁরা প্রায়শই নতুন বিষয় বস্তু গঠনের চেয়ে বর্তমান বিষয়বস্তু এবং প্যাকেজ যেমন—গুনমান সম্পন্ন পাঠ্য পুস্তক, ভিডিও এবং কম্পিউটারের প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে চান। তাঁরা তাঁদের সম্পদ অনুযায়ী বিষয়বস্তুর রূপরেখা এবং উৎপাদন তৈরি করতে চান না। এই ধরনের সমস্যার সমাধান হল বর্তমান বিষয়বস্তুর পরিপূরক স্টাডি গাইড তৈরী করা, বিষয় বস্তুর দুর্বলতা পূরণ করা, এবং শিক্ষার্থীদের সম্পদের সাহায্যে গাইড করা।

একটি স্টাডি গাইডে নিম্নলিখিত যেকোনো একটি বা সবগুলিই থাকা উচিত। (পাওয়েল, ১৯৯১'র, ৪৫-৪৮ থেকে অভিযোজিত)।

* বিশেষ বিষয়ের এক নজরে পর্যবেক্ষণ এবং সংক্ষিপ্তকরন।
* কিভাবে মূল বিষয় এবং ধারণাসমূহ পরস্পর সম্পর্কিত সেই বিষয়ে ম্যাপ বা অন্যান্য রেখ চিত্র থাকা।
* শিখন উদ্দেশ্যাবলী।

* কোন অধ্যায়/ বিভাগ অধ্যয়ন করা অধিক প্রয়োজনীয় তার পরামর্শ থাকা।
* বিষয়বস্তুর যে অংশ, পক্ষপাতদুষ্ট, সমকালীন নয় বা গোলেমেলে মনে হয় সেই বিষয়ে বিশেষ ভাবে লিখিত (বা অডিও টেপ) বিকল্প ব্যাখ্যা থাকা উচিত।
* স্থানীয় উদাহরণ বা ব্যক্তি ইতিহাস যা তৈরি করা হয়েছে তা (যদি থাকে) অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
* পাঠ্য বিষয়ে অনুচ্ছেদ যুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করা দরকার।
* প্রতিটি বিভাগে বিষয়ের উপর প্রশ্ন এবং কার্যকলাপ থাকা দরকার।
* কার্যকলাপের এবং / বা যাচাই তালিকার মডেল বা নমুনা উত্তর থাকা দরকার যাতে শিক্ষার্থী তাদের নিজের উত্তর / প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করতে পারে।
* ব্যবহারিক কাজ বা পরীক্ষামূলক কার্যকলাপের জন্য পরামর্শ যেমন গাইডলাইন বা কর্মতালিকা থাকা দরকার।
* প্রযুক্তিগত পরিভাষার পরিভাষাকোষ থাকা দরকার।
* লক্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মমূল্যায়নমূলক পরীক্ষা থাকা দরকার।
* সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রশ্ন থাকা দরকার।
* কোনো নির্দিষ্ট কাজ (assignment) শিক্ষকের কাছে মতামত এবং মার্কিং-এর জন্য পাঠানোর নির্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয়।
* টীকাযুক্ত গ্রন্থপঞ্জি থাকা দরকার। রাউনট্রী (১৯৯৭ ঃ ১৩) মুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধীয় একটি সর্বাঙ্গীন তালিকা দিয়েছিলেন।
* পরিষ্কার ভাবে বিবৃত লক্ষ্য।
* কিভাবে বিষয়বস্তুর অধ্যয়ন করতে হবে সেই সম্বন্ধে পরামর্শ।
* ব্যবহারকারীর জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ তুমি ও আমি ধরনের রচনাশৈলীতে লেখা।
* সংক্ষিপ্ত, নির্বাহযোগ্য শিখন বস্তুগুচ্ছ।
* সাধারণ প্রতি পাতার তুলনায় কম শব্দ (স্ক্রিনে)।
* পর্যাপ্ত সাহায্যকারী উদাহরণ।
* শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার উদাহরণ, তথ্য সহায়িকার ব্যবহার।
* যেখানে শব্দের তুলনায় চিত্রায়ন অধিকতর ভালো তার ব্যবহার করা।
* শিক্ষার্থীদের পথ প্রদর্শনের জন্য বিষয়ের শিরোনাম থাকা বাঞ্ছনীয়।
* উপযুক্ত অন্য মাধ্যমের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন।
* বিভিন্ন শিক্ষার্থীর চাহিদা আবশ্যিক সচেতনতা।
* শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তুর ব্যবহারে বাধ্য করার জন্য অনুশীলনী।
* শিক্ষার্থীদের নিজের মতামত লেখার জন্য জায়গা।
* শিক্ষার্থীর নিজের উন্নয়ন যাচাই করতে সাহায্য করার জন্য (Feed back) বিষয়বস্তু।
* অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য পরামর্শ।

3.7 কোর্সের বিষয়বস্তু প্রস্তুতকরণ (Preparation of Course Material)

শিক্ষাবিদ্ বা শিক্ষকের দ্বারা প্রস্তুত বিষয়বস্তু মুদ্রণযোগ্য হলে মুদ্রিত করা এবং অডিও ভিডিও বিষয়বস্তু সম্প্রচার করা দরকার, অর্থাৎ কোর্সের শুরু হওয়ার আগে বিষয়বস্তু ভালোভাবে তৈরী হওয়া দরকার। বিষয়বস্তুর আয়তন সীমিত হওয়া দরকার। যেমন— বিষয়বস্তুগুলি (২-৩ বছর পর পুর্ণালোচনা এবং পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে, কোর্সের প্যাকেজগুলি (এককসমূহ) নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হওয়া উচিত যাতে ন্যূনতম ডাকখরচ হয়। কিছুটা শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং ঝোঁক / প্রবণতা তৈরী করতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপনা করার আগে কোর্সের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার।

কোর্সের বিষয়বস্তুর গঠন করার জন্য যে সমস্ত বিষয় মনে রাখা দরকার সেগুলি হল—

* কারা শিক্ষার্থী ?
* উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সমূহ কি ?
* বিষয় উপাদান কি হবে ?
* কিভাবে বিষয় উপাদান সংগঠিত এবং পর্যায়ক্রমিক ভাবে সাজানো হবে ?
* কিভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে ?

কোর্সের বিষয়বস্তুর গঠনে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই ক্ষেত্রে 'Course team' করা হয়, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাদানমূলক রূপকার, শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্, বিষয় উপাদান এবং ভাষার জন্য সম্পাদক, গ্রাফিক শিল্পী, কপি সম্পাদক, অডিও ভিডিও কর্মসূচীর জন্য মিডিয়া প্রডিউসার দরকার। IGNOU দ্বারা সাধারণভাবে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গী হল সংযোজক লেখক, সম্পাদক, ইন-হাউস ডেভেলপমেন্ট দৃষ্টিভঙ্গী, সহযোগিতামূলক কর্মশালা, দৃষ্টিভঙ্গী, অভিযোজন মডেল প্রভৃতি। IGNOU তে জাতীয় কোর্স গঠন পদ্ধতি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত যা আত্মব্যাখ্যামূলক।

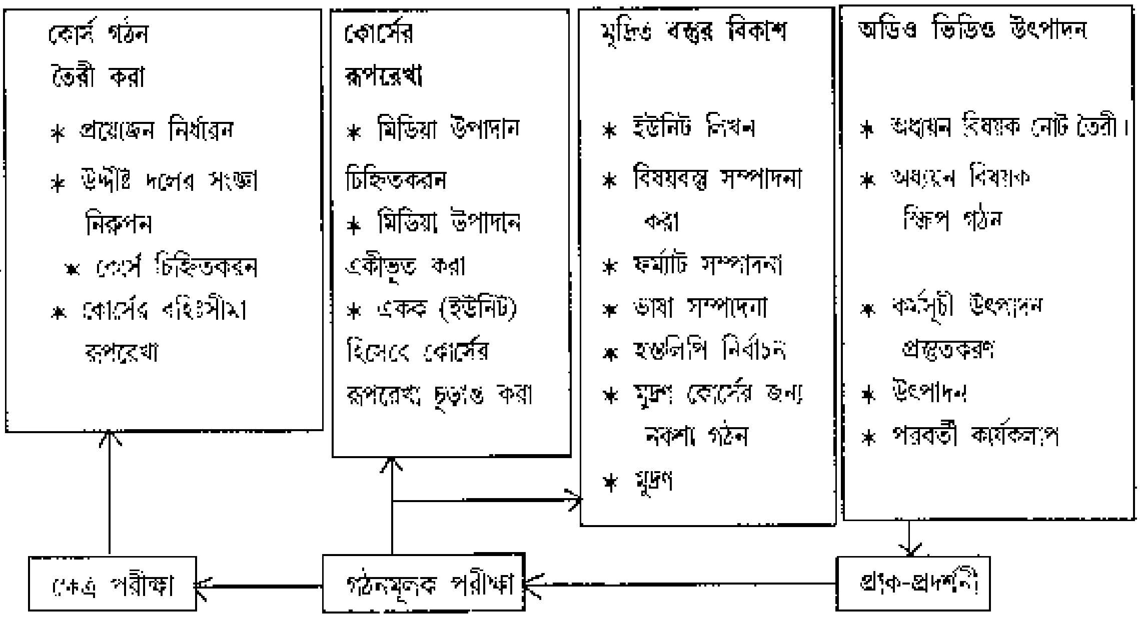

কোর্স গঠন / বিকাশে প্রক্রিয়া

ইউনাইটেড কিংডম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়... এর শিখন বস্তু বাস্তবমুখী এবং গুনমান সম্পন্ন। শিক্ষাবিদরা দূর শিক্ষা একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখেন। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখকদের তথ্য পরিষ্কার ভাবে এবং সহজবোধ্য ভাবে পরিবেশন করা উচিত। যে পরিসরে শিক্ষার্থীকে কাজ করতে হবে সেই ইউনিটের গঠন সম্পর্কে স্পষ্ট গাইড লাইন থাকা দরকার। সমস্যা হল আমরা সামগ্রিক সাহায্য পাই না। বর্তমানে আত্মশিক্ষামূলক উপকরণ, লক্ষ্যের স্থাননির্বাচন, শিক্ষার্থীরা আত্ম মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন করবে কিনা, শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন উপদেশ প্রয়োজন কিনা, পাঠ্য বিবয়িক যোগাযোগ নিয়ে একাধিক গবেষণা কাজ চলছে, কিন্তু সমস্ত বিষয়কে একসঙ্গে রাখার জন্য সে ধরনের কাজ খুবই কম।

কোর্স কো- অর্ডিনেটরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, কোর্স কো - অর্ডিনেটর হলেন শিক্ষক শিক্ষাবিদ যিনি কোর্সের রূপরেখা তৈরি এবং আত্মশিখন মূলক অধ্যয়ন উপকরনের তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় সমন্বয়সাধন করেন। কো-অডিনেটরের ভূমিকা হল—

* কোর্সের লেখকদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দান।
* লেখকদের কাজের গুনমান বৃদ্ধির জন্য তাদের সঙ্গে কাজ করা। কোর্সের বিষয়বস্তু ভালোভাবে শিক্ষাদানে সমর্থ কিনা, ভাষা এবং শিক্ষানির্দেশনা স্পষ্ট কিনা তা সুনিশ্চিত করা।
* মুদ্রণের জন্য বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা এবং কোর্সের অন্যান্য বিষয় উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত কিনা, তা যাচাই করা।
* উৎপাদন তালিকা প্রস্তুত করা।
* মুদ্রণের জন্য পাঠাংশ গঠনশৈলী তৈরি এবং বিশদে যাচাই করা।
* কোর্স বিকাশ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রন করা।

কোর্স বা প্রোগ্রাম কো-অডিনেটরও প্রত্যেক বছরের কারেকশন ফাইল ব্যবহার করেন। যাতে প্রত্যেক বছর বিষয়বস্তুর সংশোধন এবং আংশিক পরিমার্জন করা যায়। পরবর্তীকালে কর্মসূচীর মূল্যায়ন এবং চূড়ান্ত সংশোধনের এবং মুদ্রণের জন্য কো অডিনেটর দায়বদ্ধ।

3.8 এককের সারসংক্ষেপ (Unit Summary)

মডিউলারাইজেশন হল নমনীয় পাঠ্যক্রমকে একাধিক শিখন ব্লকে সংগঠিত করার পদ্ধতি যাতে প্রতিটি ব্লক পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এটি শিক্ষার্থীকে নিজের শিক্ষার গ্রহণের পরিচালক হিসাবে দেখে। মুক্ত শিক্ষা গ্রহণের পরিচালক হিসাবে দেখে। মুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠ্যপুস্তকের ন্যায় লেখা যায় না। পাঠ্য পুস্তক শিখনের যুক্তি তুলনায় বিষয়ের যুক্তি নির্ভর ভাবে সংগঠিত। মুক্ত শিক্ষার বিষয় বস্তু বাস্তবমুখী এবং ইহা ভবিষ্যতে মূল্যায়িত হওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত এবং দূরত্ব নির্ভর শিক্ষার জন্য গঠিত। দূরত্ব শিক্ষার বিষয়বস্তু গঠনে দলগত প্রচেষ্টা কাজ করে, যেখানে প্রত্যেকের ভূমিকা বিশেষভাবে উদ্দীষ্ট। বিষয়বস্তুর সময়ান্তর সংশোধন এবং মূল্যায়ন করা হয় যাতে গুণগতমান, প্রাসঙ্গিকতা এবং সমসাময়িকতা সুনিশ্চিত করা যায়।

3.9 অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। মডিউলার কোর্স বলতে কি বোঝায় লিখুন।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) --- কে একাধিক লিখন ব্লকে সংগঠিত করার পদ্ধতি হল মডিউলারাইজেশন

৩। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতার সমস্যাবলী কি কি?

৪। মুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যবলী লিখুন?

৫। কোর্সের বিষয় বস্তু গঠন কালে কোর্স কো-অর্ডিনেটরের ভূমিকা লিখুন।

3.10 বাড়ীর কাজ (Assignment)

কোর্সের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করার সময় বিবেচ্য বিভিন্ন কার্যকলাপের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

3.11 আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion/Clarification)

3.11.1 আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussion)

3.11.2 ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification)

3.12 উৎস (Reference)

1. Panda, S. Khan, A. R. and Garg, S. (1999) growth and development of the National and Distance Education : Policies, Practices and Quality Concerns. New Delhi, ABI.
2. Powell (1991)
3. Rowntree, D (1997) preparing materials for o, ~n, Distance and Flexible Learning, London : Kogan Page.

একক ৪ ❑ পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন ও নবীকরণ (Evaluation and Renewal of Curriculum)

গঠন

4.1 ভূমিকা

4.2 উদ্দেশ্য

4.3 ধারণা

4.4 পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের প্রয়োজন ও গুরুত্ব

4.5 পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের উৎসবলী

4.6 পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের বিষয়াবলী

4.6.1 প্রাক্ পরীক্ষা

4.6.2 নির্দেশক পরীক্ষা ও বৈশিষ্ট্য সূচক পরীক্ষা

4.6.3 গঠনমূলক মূল্যায়ন

4.6.4 সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন

4.7 পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের মডেলসমূহ

4.7.1 টাইলার-এর মডেল

4.7.2 স্টেক-এর মুখাবয়ব মডেল

4.7.3 সি.আই.পি.পি. মডেল

4.7.4 হিলডা টাবা মডেল

4.8 এককের সারসংক্ষেপ

4.9 অগ্রগতির মূল্যায়ন

4.10 বাড়ীর কাজ

4.11 আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

4.12 উৎস

4.1 ভূমিকা (Introduction)

একক-১এ তোমরা পাঠ্যক্রমের ধারণা ও তথ্যসংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যয়ন করেছ। এছাড়া পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন, তাৎপর্য এবং পাঠ্যক্রমের ভিত্তি সম্পর্কেও অধ্যয়ন করেছ। একক-২এ আমরা পাঠ্যক্রমের রূপরেখা, রূপরেখা গঠনকালে বিবেচ্য বিষয়, বিভিন্নস্তর পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা গঠনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং পাঠ্যক্রম গঠনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি। এই এককে আমরা পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের প্রয়োজন ও গুরুত্ব। পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের উৎসাবলী, বিষয়াবলী এবং মডেল সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এই অধ্যায়ে পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা ও পাঠ্যক্রম রচনা একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

4.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

* পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারা।
* পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারা।
* পাঠ্যকরম মূল্যায়নের বিভিন্ন সনাক্তকরণ ও ব্যাখ্যা করতে পারা।
* পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের কিছু মডেল ব্যাখ্যা করতে পারা।

4.3 ধারণা (The Concept)

পাঠ্যক্রমের কার্যকারীতা পরীক্ষা করার জন্য পাঠ্যক্রমের সফল দিক ও দুর্বলতার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। পাঠ্যক্রম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা যায় যেমন—

* শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের দ্বারা পাঠ্যক্রমের অভীষ্ট কতটা অর্জন করা গেছে।
* শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যক্রম পরিচালনাকালীন কি ঘটছে।
* পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন পাঠ্যক্রমের মূল্য নির্ধারণ করে অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রম গঠন করা হয়েছিল তা পাঠ্যক্রম পূরণে সমর্থ কিনা।

পাঠ্যক্রম পরিকল্পনার জন্য বিবেচ্যবিষয়সমূহ-

একটি ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যক্রম জটিল সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ভুল ধারণা ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম গঠিত হলে সমাজের প্রয়োজন পূরণ নাও হতে পারে। পাঠ্যক্রম তার উদ্দেশ্যপূরণ সমর্থ কিনা তা জানার জন্য পর্যায়ান্তর মূল্যায়ন করা জরুরী।

বিস্তৃত অর্থে পাঠ্যক্রম দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে—

* শিক্ষাদানমূলক লক্ষ্য/উদ্দেশ্য কতটা অর্জন করা গেছে জানার জন্য শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন।
* শিখন অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষাদানকালে শ্রেণীকক্ষে প্রকৃত কি ঘটছে তা জানা।

এই সমস্ত শিখন অভিজ্ঞতা সীমিত সময়ে শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর মধ্যে অন্যান্য কার্যকলাপ যেমন বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোষাক পরিধান, বিদ্যালয়ে প্রদর্শনমূলক কাজে শিক্ষার্থীর কার্যকলাপ, স্কুলের প্রার্থনায় যোগদান, ক্ষেত্রসমীক্ষা, পঠনমূলক ভ্রমণ, বিতর্ক প্রভৃতি।

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন হল নিরবিচ্ছিন্ন পদ্ধতি। মূল্যায়নের পর পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা হয়ে থাকে।

4.4 পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের প্রয়োজন ও গুরুত্ব (Need and Improtance of Curriculum Evaluation)

আমাদের সমাজ খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃষিনির্ভর সমাজ থেকে বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির যুগে পৌঁছেছি। পাঠ্যক্রম গঠন কেবলমাত্র একবারে পদ্ধতি নয়। এটা নিরবিচ্ছিন্ন পদ্ধতি এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে বর্তমানে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা পাঠ্যক্রমের সংশোধন বা পরিবর্তন করে থাকি।

যে কোনো বিষয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবন হচ্ছে। যদি সাম্প্রতিকতম পরিবর্তন বর্তমান পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা না হয় তবে শিক্ষার্থী সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে না। পাঠ্যক্রমে নতুন পরিবর্তন বা উদ্ভাবিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন ও নবীকরণ বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান বিষয়-উপাদানে এমন কিছু ধারণা এবং অনুশীলন আছে যা পুরনো এবং যাদের কোনো ব্যবহার নেই। এই ধরনের বিষয় উপাদান চিহ্নিত করা খুবই জরুরী যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন দ্বারা সম্ভব।

অভিপ্রেত পাঠ্যক্রম এবং প্রয়োগগত পাঠ্যক্রমের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'অভিপ্রেত পাঠ্যক্রম' বলতে লিখিত পাঠ্যক্রমকে বোঝায় যাতে এর মধ্যে প্রয়োগ কৌশল ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত। 'প্রয়োগগত পাঠ্যক্রম' বলতে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক দ্বারা অভিপ্রেত পাঠ্যক্রমের প্রকৃত রূপায়ণ পদ্ধতিকে বোঝায়। অভিপ্রেত পাঠ্যক্রম এবং প্রয়োগগত পাঠ্যক্রমের মধ্যে ফাঁক ন্যূনতম করার জন্য পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন জরুরী।

পাঠ্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাঠ্যক্রমের উপাদানসমূহের প্রয়োগ, পদ্ধতি এবং ফলের বিশ্লেষণ প্রয়োজন যাতে সংশোধন করা যায়। এটি কেবলমাত্র পাঠ্যক্রমের মূল্যায়নের দ্বারা সম্ভব।

পাঠ্যক্রমিক বিষয়বস্তু ফলপ্রসূত। অর্থবহ এবং প্রয়োজন নির্ভর হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীর আকাঙ্খিত আচরণমূলক পরিবর্তন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকে এবং শিক্ষকও শিক্ষার্থী দ্বারা গ্রহণীয় হয়। পাঠ্যক্রমের শিক্ষার্থীর এবং সমাজের ব্যবহারিক উপযোগীতা বাঞ্ছনীয় এবং বর্তমানের পাঠ্যক্রমিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া উচিত। এটি কেবলমাত্র পাঠ্যক্রমের সুসংগঠিত মূল্যায়নের দ্বারাই সুনিশ্চিত করা যায়।

নতুন পাঠ্যক্রমের গঠনে অভিষ্টমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বর্তমান পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন জরুরী। মনে করা যাক মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার শিক্ষার নতুন পাঠ্যক্রম গঠন করতে চাই। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদ্যালয় বা অঞ্চলে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা করা দরকার। প্রচলিত পাঠ্যক্রমের মূল্যায়নের দ্বারা বর্তমান পাঠ্যক্রমে নতুন বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

আলোকপাত ঃ

১। পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন বলতে কি বোঝেন? ৫০টি শব্দে ব্যাখ্যা করুন।

____

____

____

____

____

২। বিদ্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট স্তরের পাঠ্যক্রমের মল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা কি?

____

____

____

____

____

4.5 পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের উৎসসমূহ (Sources of Curriculum Evaluation)

বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্যসংগ্রহ করে পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এই উৎসগুলি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, জনগোষ্ঠীর সদস্য, পাঠ্যক্রম বিশারদ, শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ, বিষয়বস্তু বিশারদ, নীতি প্রণয়নকরী, নিয়োগকারী প্রভৃতি হতে পারে। নিম্নে কিছু উৎস নিয়ে আলোচনা করা হল—

শিক্ষার্থী ঃ শিক্ষার্থী হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কোনো নির্দিষ্ট কোর্সের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য কতখানি এবং কত ভালোভাবে শিক্ষার্থীরা অর্জন করেছে তা বোঝা যায়। এমনকি, যারা কোর্সের মধ্যে আছে এবং কোর্স সম্পূর্ণ করেছে তাদের প্রতিক্রিয়া পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত শিক্ষার্থী কোনো একটি নির্দিষ্ট কোর্সে অসফল হয়েছে তাদের মূল্যায়ন হল একটি অন্যতম উৎস। অসফলতা সম্পর্কে তাদের পাঠ্যক্রমিক বিষয়ে মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষক ঃ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যক্রম পরিচালনা করেন। শিক্ষাদান কালীন তাঁর অনুভূত সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তিনি পাঠ্যক্রমের সবলতা ও দুর্বলতা বিষয়ে মূল্যবান মন্তব্য করতে পারেন। তাঁর মতামত অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের সুনিপুণতা মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী গ্রহণ করা যেতে পারে।

অভিভাবক ঃ পাঠ্যক্রম এমনভাবে গঠিত হতে হবে যাতে অভিভাবকরা গ্রহণ করেন। বেশীরভাগ সময়ই শিক্ষার্থীরা অভিভাবকের সঙ্গে থাকে। সেইকারণে অভিভাবকরা নির্দিষ্ট কোর্সের পরে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বে প্রয়োনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধের প্রতিফলন হয়েছে কিনা সহজেই বুঝতে পারেন। পাঠ্যক্রম পরিকল্পনাকারের

অভিভাবক দ্বারা পাঠ্যক্রমের গ্রহণীয়তা সুনিশ্চিত করা উচিত। সেইকারণে পাঠ্যক্রম মূল্যায়নকারীর অভিভাবকদের থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী হওয়া দরকার। শিশুদের শিক্ষামূলক প্রয়োজন প্রভৃতি সম্পর্কে অভিভাবকের মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ ঃ বিদ্যালয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সামাজিক প্রয়োজন, সামাজিক শক্তি ও পরিবর্তনসমূহ পাঠ্যক্রমে প্রতিফলিত হয়। বিদ্যালয়ে পরিচালনা করা হয়। কোর্স সম্পূর্ণ করার পর শিক্ষার্থীর সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী কতটা সাহায্য করতে পারছেন তা অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার। সমাজের সদস্যরা কোর্সটি জনগোষ্ঠী নির্ভর এবং অথবা প্রয়োজন নির্ভর কিনা সে বিষয়ে মতামত জানাতে পারেন। অর্থাৎ জনগোষ্ঠী থেকে সংগ্রহ করা প্রতিক্রিয়ারাশি পাঠ্যক্রমটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক প্রয়োজনপূরণে সমর্থ কিনা তা প্রকাশ করে। সেই কারণে সমাজের মতামত পাঠ্যক্রমের মূল্যায়নে খুবই মূল্যবান।

পাঠ্যক্রম বিশারদ ঃ পাঠ্যক্রমের কার্যকারিতা সম্পর্কে পাঠ্যক্রম বিশারদদের মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের পাঠ্যক্রমে গঠনের তত্ত্বগত অভিজ্ঞতারাশি আছে। তাঁরা পাঠ্যক্রম গঠনের আধুনিকতম প্রযুক্তি বিষয়ে তথ্যরাশি প্রদান করতে পারেন, তাঁরা সহজেই চলিত পাঠ্যক্রমের ত্রুটিগুলি খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী অথবা পরিবর্তন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন, সেই কারণে পাঠ্যক্রমবিশারদরা হলেন পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের অন্যতম উৎস।

বিষয় বিশারদ ঃ বিষয় বিশারদরা বিষয় উপস্থাপনার ফাঁক ফোকরগুলি সহজেই বের করতে পারেন। তাঁরা বিষয় পরিচালন গুণমান এবং নির্ভুলতা নিয়ে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন। পাঠগুলি যুক্তিসংগত এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে কিনা, উদাহরণরাশি ব্যাখ্যামূলক কিনা, বিষয়গুলি বয়স এবং শ্রেণীর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিনা প্রভৃতি বিষয় বিশারদরা মূল্যায়ন করতে পারেন।

নীতির প্রণয়নকারী ঃ শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন জাতীয় শিক্ষামূলক পরিকল্পনা ও পরিচালনা প্রতিষ্ঠান (NIEPA), জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পর্ষদ (NCTE), জাতীয় শিক্ষামূলক পরিকল্পনা ও পরিচালনা প্রতিষ্ঠান (NIEPA), জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পর্ষদ (NCTE), মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক (MHRD), জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় (NOS), কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (CBSE), রাজ্য শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদসমূহের (SCERT) দক্ষ ব্যক্তিত্ব এবং নীতি প্রণয়নকারীরা পাঠ্যক্রমের মূল্যায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। শীর্ষস্থানে থেকে তাঁরা সমাজের, বিভিন্ন দেশের এবং সরকারী নীতিসমূহের বর্তমান পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত থাকেন। এছাড়া তাঁরা শিল্প, ব্যবসা, অর্থনীতি, কৃষি প্রভৃতিতে সাম্প্রতিকতম পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন। এই সমস্ত বিভাগের পরিবর্তন ও উন্নয়ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব আছে। এছাড়া সরকারের পরিবর্তনের ও পাঠ্যক্রমের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে, সেইকারণে নীতিপ্রণয়নকারীদের অভিমত পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের অন্যতম উৎস।

নিয়োগকর্তা ঃ শিক্ষার্থীরা তাদের কোর্স সম্পূর্ণ করার পর বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগ দেয়। তাই বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তাগণ বর্তমান পাঠ্যক্রম তাদের প্রয়োজন পূরণে সমর্থ কিনা বা তাদের প্রয়োজন পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা বলতে পারেন শিক্ষাব্যবস্থার উৎপাদনের ব্যবহারকারী হিসাবে পাঠ্যক্রমের গুণমান বিষয়ে মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনি যে সমস্ত স্নাতকরা স্বনির্ভর তাদের মতামত ও পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের অন্যতম উৎস। তাঁরা বর্তমান শিক্ষা

ব্যবস্থার ভালো ও দুর্বলদিকগুলি এবং স্বনির্ভর হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অর্জনের জন্য উপযুক্ত বিষয় উপাদানের সংক্রান্ত তথ্য দিতে পারে।

আলোকপাত :

১। মূল্যায়নের বিভিন্ন উৎসগুলি তালিকাভুক্ত করুন। যে কোনো একটি উৎস সম্পর্কে ৫০টি শব্দে লিখুন।

২। পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের জন্য জনগোষ্ঠীকে উৎস হিসাবে কেন গ্রহণ করা উচিত?

4.6 পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের দৃষ্টিকোন সমূহ (Aspects of Curriculum Evaluation)

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন পদ্ধতিকে সর্বাঙ্গীন এবং সামগ্রিক করার জন্য পাঠ্যক্রম বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়িত হওয়া দরকার। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোনের আলোচনা করা হল—

4.6.1 প্রাক্ ও পরবর্তী মূল্যায়ন (Pre-testing & Post-testing)

পরীক্ষা করার জন্য দুটি একই প্রশ্নপত্র গঠন করা হয়। প্রথমটি পাঠ্যক্রম পরিচালনা করার আগে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের স্তর দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং অন্যান্য সক্ষমতাবলী নির্ধারণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়। তার ফলে শিক্ষার্থীদের স্কোর, পাঠ্যক্রমের লক্ষ্যাবলী ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায়। এরপর, পরিকল্পিত পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করে, কোর্সের শেষে দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রটির দ্বারা শিক্ষার্থীদের স্কোর নেওয়া হয়। এই দুই ধরনের স্কোর তুলনা করা হয়। যদি তাৎপর্যজনক পার্থক্য দেখা যায় তবে ধরে নেওয়া যায় ইহা পাঠ্যক্রমের কার্যকারীতার জন্য হয়েছে। যদি তা না হয় তবে পাঠ্যক্রম ফলপ্রসূ নয় এবং এর সংশোধন বা উন্নয়ন দরকার।

প্রাক-পরীক্ষা → প্রয়োগ → পরবর্তী পরীক্ষা

পাঠ্যক্রমের প্রাক্ এবং পরবর্তী পরীক্ষা

উৎস—IGNOU : ES-331 Curriculum & Instruction Block-1, New Delhi.

4.6.2 নিয়ম-সূচক মূল্যায়ন এবং বৈশিষ্ট্য-সূচক মূল্যায়ন (Norm-Referenced testing and Interim Referenceed testing)

নিয়ম-সূচক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের নিরিখে মূল্যায়ন করা হয়। এই ধরনের মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কোর্সের জন্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বা মেধার তালিকা অনুসারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য খুবই মূল্যবান।

পাঠ্যক্রম মূল্যায়নে, যে সকল শিক্ষার্থী যারা নতুন পাঠ্যক্রমে পড়েছে তারা পুরানো পাঠ্যক্রমে পড়াশুনা করা শিক্ষার্থীদের তুলনায় অধিকতর ভালো শিখেছে কিনা তা অনুসন্ধান করা হয়। এইক্ষেত্রে একটি নিয়ম-সূচক পরীক্ষা দুই দলের উপর করা হয়ে থাকে এবং দুই দলের স্কোর তুলনা করা হয়। যদি নতুন পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদলের স্কোর তাৎপর্যজনকভাবে পুরনো পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদলের চেয়ে অধিকতর বেশী হয়, তবে ধরে নেওয়া যায় নতুন পাঠ্যক্রম কার্যকরী। অন্যথায় নতুন পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য চিন্তাভাবনা করা উচিত।

বৈশিষ্ট্যসূচক পরীক্ষাতে একগুচ্ছ বৈশিষ্ট্যের নিরিখে মূল্যায়ন করা হয়। সমস্ত উদ্দেশ্য আচরণগতভাবে তালিকাবদ্ধ করা হয় এবং কোন অবস্থায় তা প্রকাশ পাবে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে। যদি বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই লক্ষ্যাবলী অর্জনে সমর্থ হয় তবে পাঠ্যক্রম কার্যকরী বলে পরিগণিত হয়। অন্যথায় পাঠ্যক্রমের সংশোধন প্রয়োজন।

4.6.3 গঠনমূলক মূল্যায়ন (Farmative Evaluation)

পাঠ্যক্রমের গঠন ও প্রস্তুত করার সময় পাঠ্যক্রমের উন্নয়নের জন্য এই ধরনের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। পাঠ্যক্রমের ব্যবহারের সময় পাঠ্যক্রম মূল্যায়নকারীর, প্রকৃত পক্ষে কি ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করা উচিত ; কোর্সের অগ্রগতির সাথে সাথে বিভিন্ন শিক্ষামূলক হাতিয়ার যেমন প্রশ্নমালা, তালিকাসমূহ এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণমূলক ও রিপোর্ট তৈরি করার পদ্ধতিসমূহগুলিরও গঠনমূলক মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এইভাবে সংগৃহীত তথ্য পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় সংশোধনের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়।

4.6.4 সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন (Summative Evaluation)

এই ধরনের মূল্যায়ন পাঠ্যক্রমের গঠন এবং প্রয়োগের পর করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে পড়াশুনা করার পর সবশেষে কি অর্জন করেছে তা দেখার জন্য এই ধরনের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এটা অবশ্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের কোর্স সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণারও মূল্যায়ন করে থাকে।

আলোকপাত ঃ

১। নিয়মসূচক এবং বৈশিষ্ট্যসূচক মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য কি ?

২। পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের মধ্যে শ্রেণী পাঠ্যক্রমের জন্য কোনটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ?

____

____

____

____

____

____

____

____

৩। গঠনমূলক এবং সমষ্টিমূলক মূল্যায়নের মধ্যে আপনার মতে কোনটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন ?

____

____

____

____

____

____

____

4.7 পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের মডেল সমূহ (Models of Curriculum Evaluation)

বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন মডেলের কথা বলেছেন। আমরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ মডেলের আলোচনা করব।

4.7.1 টাইলার-এর মডেল ঃ (Tyler's Model)

১৯৫০ সালে টাইলার সম্ভবত সবথেকে বেশী পরিচিত মডেলের কথা বলেছিলেন। তিনি শিক্ষাকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করেছেন যেখানে তিনটি বিষয় আলাদা থাকা উচিত, এগুলি হল শিক্ষার লক্ষ্য, শিখন অভিজ্ঞতা এবং সাফল্যের পরীক্ষণ।

নিম্নে টাইলারের মডেল সুসংগঠিতভাবে দেওয়া হল—

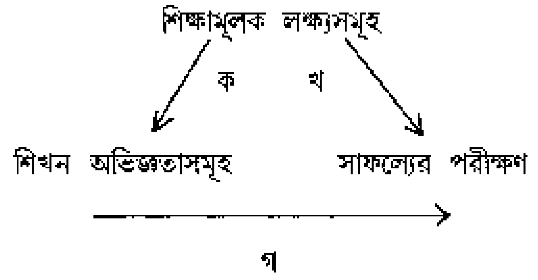

টাইলারের মূল্যায়ন মডেল

উৎস – Lewy, A (1977), Handbook of curriculum Evaluatio, UNESCO, Paris, P. 11.

উপরের মডেলে মূল্যায়ন তীর চিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। এই ধরনের মডেল প্রধানত একক শিক্ষার্থীর বা একদল শিক্ষার্থীর সাফল্য লাভের স্তর মূল্যায়নে ব্যবহার করা হয়। মূল্যায়নকারী এই মডেলের সাহায্যে শিক্ষার্থী আকাঙ্ক্ষিত নম্বর অর্জনে কতটা সমর্থ হয়েছে তা জানতে আগ্রহী থাকেন। এই মডেলে কগনিটিভ ও অ্যাফেকটিভ (Coquitive and diffective) ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

টাইলারের মডেলে শিক্ষামূলক লক্ষ্য ও শিক্ষার্থীর সাফল্য লাভের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন বিষয়টি নিয়ে মডেলের একটি অংশ গঠিত। সুসংগঠিতভাবে অন্যান্য সম্পর্ক অধ্যয়নেরও বর্ণনা আছে এই মডেলে। তীর 'ক' পাঠ্যক্রমে প্রস্তাবিত লক্ষ্যসমূহ এবং শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ ও প্রকৃত অভিজ্ঞতা সমূহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। তীর 'গ' প্রকৃত শিক্ষা অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের মধ্যে সম্পর্কের মূল্যায়ন করে।

4.7.2 স্টেকের মুখাবয়ব মডেল (Shakis Countenance Model)

স্টেক ১৯৬৯ সালে পূর্ববর্তী অবস্থা (antecedents) পরিচালনা / সম্পাদন (transactions), পরিণাম / ফলাফল (outcomes) এই তিনটি বিষয়ের উপর পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন ব্যাখ্যা করেছিলেন। পূর্ববর্তী বলতে সেই বিষয়সমূহকে বোঝায় যাতে পাঠ্যক্রমের শিক্ষাদান করা হয়। যেমন প্রাপ্ত সময় এবং অন্যান্য উৎসাবলী। পরিচালনা বলতে পঠনে প্রকৃত যা ঘটে, এর মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দ্বারা সম্পাদিত কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত। ফলাফল বলতে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর উপর পাঠ্যক্রমের প্রভাব এবং পাঠ্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষকের অনুভূতিকে বোঝায়।

বিভিন্ন ব্যক্তি পাঠ্যক্রম দেখে এবং সেই মতো মূল্যায়ন করে বলে এই মডেল মুখাবয়ব মডেল নামে পরিচিত। স্টেকের মূল্যায়ন মডেল পরপৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করা হল—

পরিভাষা	তথ্যের ধরন	পদ্ধতি
পূর্ববর্তী	* প্রতিষ্ঠানিক পটভূমি	* সময় তালিকা
	* সম্পদ সমূহ	* পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্যপুস্তক সমূহ
	* পরিচালকমণ্ডলী এবং অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গী	* সাক্ষাৎকার সমূহ
	* প্রাপ্ত পরীক্ষাসমূহ	
	* পাঠ্যক্রমের উপাদান / বিষয়	
	* শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতাসমূহ	
পরিচালনা	**শিক্ষকগণ ঃ**	
পঠনে	* গৃহীত ভূমিকাসমূহ	* কার্যাবলীর বিবরণী
	* সময় এবং সম্পদরাশির ব্যবহার	* শ্রেণী পর্যবেক্ষণ
	* শিক্ষার্থীদের সহিত সম্পর্ক	
	শিক্ষার্থীগণ ঃ	
	* কগনিটিভ প্রক্রিয়াসমূহ	* শিক্ষকের তৈরী রিপোর্ট
	* আগ্রহ এবং যোগদান	* শিক্ষার্থীদের তৈরী রিপোর্ট
	* সময়ের ব্যবহার	
ফলাফল		
	* শিক্ষার্থীদের সিদ্ধিলাভ	* পরীক্ষা ও লিখিত কাজ
	* শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ ব্যাখ্যাসমূহ	* প্রশ্নমালা
	* শিক্ষকগণের দৃষ্টিভঙ্গী সমূহ ও ব্যাখ্যা	
	* প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অংশের উপর প্রতিক্রিয়া/প্রভাব	

উৎস Aggarwal, J. C. (1990) Curriculum Reforms in India, Doaba House, New Delhi.

4.7.3 সি.আই.পি.পি. মডেল (The CIPP Model)

১৯৭১ সালে স্টাফেলবীম এই মডেলের সাহায্যে বিষয় (content- C), নিবেশ (input - I), প্রক্রিয়া (Process - P) এবং উৎপন্নফল (Prouduct-Pr) এই বিষয়গুলির উপর জোর দিয়েছিলেন।

বিষয় মূল্যায়ন : এখানে পাঠ্যক্রম মূল্যায়নকারী যে পরিবেশে পাঠ্যক্রম পরিচালনা করা হবে সেই পরিবেশ অধ্যয়ন করেন। এটি লক্ষ্য নির্বাচনের যুক্তি প্রদান করে। বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন একবারের কাজ নয়। এটি সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য মূল তথ্য সংগ্রহ করার একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

নিবেশ মূল্যায়ন : পাঠ্যক্রমের লক্ষ্যসমূহ পূরণের জন্য কিভাবে সম্পদসমূহ সন্তোষজনক ভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া হল এই ধরনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। কিছু প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক নিবেশ যেমন—প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের লভ্যতা, সময় এর মূল্যায়ণ, বাজেটের মূল্যায়ন এই ধরনের মূল্যায়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে পরবর্তী ফলাফল, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা এবং উচ্চাকাঙ্খা ও অর্ন্তভুক্ত।

প্রক্রিয়া মূল্যায়ন : এটি হল এই মডেলের সব থেকে জটিল উপাদান। উৎপাদিত পন্যের (ফলাফল) গুনমান বেশীর ভাগ এর উপর নির্ভর করে। এটি পাঠ্যক্রম এর ব্যবহারিক সিদ্ধান্তসমূহকে সূচিত করে। স্টাফেলবীম প্রক্রিয়ার মূল্যায়নের জন্য নিম্নের তিনটি কৌশল উপস্থাপনা করেছিলেন।

* প্রক্রিয়াগত রূপরেখার ত্রুটিগুলি নির্ণয় বা চিহ্নিত করা বা এর পরিচালনার পরিব্যাপ্তি সময় ভুলগুলি চিহ্নিত বা নির্ণয় করা : — পরিকল্পনা বা পাঠ্যক্রমের ত্রুটি সমূহ নিয়ে আলোচনায় পাঠ্যক্রমের ব্যর্থতার অন্তর্নিহিত উৎসগুলির ধারাবাহিকভাবে নজর রাখা ও চিহ্নিত করা উচিত। উৎস যুক্তিগত, আর্থিক প্রভৃতি হতে পারে।

* পাঠ্যক্রমের সিদ্ধান্তের জন্য তথ্য যোগান দেওয়া : এখানে পাঠ্যক্রমের প্রকৃত রূপায়নের আগে পরীক্ষা গঠন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। পাঠ্যক্রমের প্রকৃত রূপায়নের আগে কিছু ইন-সার্ভিস পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করা দরকার, যা পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।

* প্রক্রিয়াসমূহ যেমন ভাবে ঘটছে তার রেকর্ড বজায় রাখা : এটি পরিকল্পনা নকশার মূল বৈশিষ্ট। উদাহরস্বরূপ নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিক্ষাদানমূলক নির্দেশনা কৌশল, এই ধরনের কাজের পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ সময় ইত্যাদি।

উৎপন্ন ফলের মূল্যায়ন : এটি পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যবলী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। সংগ্রহ করা তথ্য পাঠ্যক্রমের সংশোধন, পরিবর্তন এবং বাতিল করা হবে না বজায় রাখা হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

4.7.4 হিলডা টাবা মডেল (Hilda taba Modal)

হিলডা টাবার সামাজিক অধ্যয়ন মডেল পাঠ্যক্রম প্রক্রিয়ার কার্যকারণ সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। অধ্যয়নের বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষামূলক নিয়ন্ত্রণ ও তার প্রভাব এবং শিক্ষার্থীদের সফলতার উপর তার প্রভাব এই সকল বিষয়ের উপর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ভর করে। গবেষক অধ্যয়নের বিষয়বস্তুর বিভিন্ন সেট তৈরি করেন, প্রতিটি সেট অন্যের থেকে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে আলাদা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে বিষয়বস্তুর পরিচালনা করার পর পাঠ্যক্রম মূল্যায়িত করা হয়। পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের ফলাফল নতুন কর্মপরিকল্পনা গঠনের জন্য নিয়মসমূহ নির্ধারণ করে।

আলোকপাত ঃ

১। উপরে বর্ণিত মডেলগুলির মধ্যে যে কোনো একটি মডেল ৫০টি শব্দে বর্ণনা করুন।

২। উপরের মডেলগুলির মধ্যে আপনার মতে কোনটি বর্তমান বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম ব্যবস্থায় সব থেকে বেশী উপযুক্ত এবং কেন?

৩। স্টাফেলবীমের সি.আই.পি.পি. মডেলটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করুন।

4.8 এককের সারাংশ (Unit Summary)

* পাঠক্রম গঠন হল একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। মূল্যায়নের ভিত্তিতে সমাজের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী আমরা পাঠ্যক্রমের সংশোধন বা পরিবর্তন করে থাকি।
* পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের উৎসগুলি হল—শিক্ষার্থীরা, শিক্ষকগণ, অভিভাবকগণ, জনগোষ্ঠীর সদস্যগন, পাঠ্যক্রম, বিশেষজ্ঞ, বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ, নীতিপ্রণয়নকারীগণ, নিয়োগকর্তা প্রভৃতি।
* পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হল—প্রাক ও পরবর্তী পরীক্ষন, নিয়ম ও বৈশিষ্ট্যসূচক পরীক্ষণ, গঠনমূলক এবং সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন।

* টাইলার-এর মডেল শিক্ষাকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করেছে যেখানে তিনটি আলাদা দিক যুক্ত আছে - শিক্ষামূলক লক্ষ্যাবলী, লিখন অভিজ্ঞতারাশি এবং ফলাফলের মূল্যায়ন।

* স্টেকে এর মুখাবয়ব মডেলে পূর্ববর্তী অবস্থা পরিচালনা এবং ফলাফলের নিরীক্ষে পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন করেছেন।

* সি.আই.পি.পি. মডেলে পূর্বাপর সম্বন্ধ (C), নিবেশ (I), প্রক্রিয়া (P) এবং শেষটি সমষ্টিমূলক মূল্যায়নকে সূচিত করে।

* হিলডা টাবা সামাজিক অধ্যয়ন মডেল পাঠ্যক্রম প্রক্রিয়ার কার্যকারণ সম্পর্কের উপর জোর দেয়।

4.9 অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

* পাঠ্যক্রম গঠন হল একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। মূল্যায়নের ভিত্তিতে সমাজের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী আমরা পাঠ্যক্রমের সংশোধন বা পরিবর্তন করে থাকি।

১। পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। সংক্ষেপে পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎস বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করুন।

৩। পার্থক্য লেখ ঃ

(ক) প্রাক ও পরবর্তী পরীক্ষা।

(খ) নিয়ম ও বৈশিষ্ট্যসূচক পরীক্ষন।

(গ) গঠনমূলক ও সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন।

৪। পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের টাইলারের মডেলটি ব্যাখ্যা কর।

4.10 বাড়ীর কাজ (Assignment)

মনে কর তোমাকে সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন করতে দেওয়া হল। তুমি অনুসৃত ধাপগুলি তালিকা তৈরী করে বর্ণনা দাও।

4.11 আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion / Clarfication)

4.11.1 আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussion)

4.11.2 ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification)

4.12 উৎস (References)

1. Lewy, A (Ed.) (1977) Handbook of curriculum Evaluation, Paris : UNESCO.
2. Stake. Robert R.E. (1969) : In ornstein and Hunkings P., Curriculum Foundation : Principles & Issues. New Jersey : Prentice Hall.
3. Stufflebeam (1971) In Ornstein, Cand Hunken, P., Curriculum Foundations, principles and Issues, New Jersery : Prentice Hall.
4. Tyler, R. W. (1950) Basic Principles of Curriculum and Instruction, Chicago : University of chicago Press.

S.E.C.P. - 03
BLOCK - 03
Evaulation
মূল্যায়ন

পর্যায়-৩ মূল্যায়ন (Evaluation)

ভূমিকা (Introduction)

মূল্যায়ন হল দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কর্মক্ষেত্রে আমরা সচেতনভাবে বা নিজেদের অজান্তে মূল্যায়ন করে থাকি বা কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হই। শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল শিক্ষাদানমূলক লক্ষ্য কতটা অর্জন করা গেছে তা নির্ধারণ করা। এছাড়া পাঠ্যক্রমিক পরিচালনার সবল ও দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত করা যাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য শিক্ষা-শিখন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা যায়।

একক - ১এ শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের ভূমিকা, মূল্যায়নের ধারনা, পরিমাপ ও মূল্যায়ন এবং টেস্ট ও পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য, মূল্যায়ন রিপোর্টের বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একক-২এ উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নের শ্রেণী পার্থক্য, শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে নিয়ম ও বৈশিষ্ট্যসূচক মূল্যায়নের ভূমিকা বহি ও অন্ত মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য, শিক্ষা-শিখন জ্ঞানমূলক এবং অন্যান্য বিষয়ের মূল্যায়নের গুরুত্ব, মার্কিং ও গ্রেড প্রথার সংজ্ঞা এবং মার্কিন প্রথার থেকে গ্রেড প্রথার উৎকর্ষতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একক-৩এ সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষার উদ্দেশ্য, নিয়ম সূচক ও অপ্রচলিত শ্রেণী কক্ষের সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য। পদ্ধতি এবং উৎপাদন মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য, ধারণা স্কেলের গঠন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একক-৪এ মূল্যায়নের যন্ত্র এবং পদ্ধতি ও তার শ্রেণীবিভাগ, শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষা ও নির্দিষ্টমান সম্পন্ন পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য। আত্ম প্রতিবেদনমূলক পদ্ধতি যেমন প্রশ্নমালা এবং সাক্ষাৎকার তালিকার বর্ণনা, পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি যেমন— পূর্ববর্তী নথিপত্র, রেটিং স্কেল, যাচাই তালিকা, মূল্যায়ন রিপোর্টের উপাদান / রিপোর্ট লিখনে সমস্যা ক্ষেত্র এবং তাদের বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একক ১ ❑ মূল্যায়নের প্রয়োজন, ধারণা এবং উদ্দেশ্য (Need, Concept and Purpose of Evaluation)

গঠন

১.১ ভূমিকা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের ভূমিকা

  ১.৩.১ শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের স্থান

১.৪ মূল্যায়নের ধারণা

  ১.৪.১ মূল্যায়ন কি ?

  ১.৪.২ পরিমাপ ও মূল্যায়ন

  ১.৪.৩ পরীক্ষা এবং অভীক্ষা

১.৫ ভালো মূল্যায়ন হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য

  ১.৫.১ বৈধতা

  ১.৫.২ বিশ্বাস যোগ্যতা

  ১.৫.৩ বস্তুনিরপেক্ষতা

  ১.৫.৪ ব্যবহারিকতা

১.৬ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

  ১.৬.১ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের উন্নয়ন

  ১.৬.২ শিখন পদ্ধতির উপর নজরদারী

  ১.৬.৩ শিখন সমস্যার সনাক্তকরণ ও তার প্রতিবিধান

  ১.৬.৪ সঠিক বৃত্তি নির্বাচন ও ভবিষ্যৎবাণী

  ১.৬.৫ সাহায্য ও পরামর্শ

  ১.৬.৬ গ্রেডিং

  ১.৬.৭ বিদ্যালয় পরিচালনা

  ১.৬.৮ গবেষণায় ব্যবহার

১.৭ এককের সারাংশ

১.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন

১.৯ বাড়ীর কাজ

১.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.১১ উৎস

১.১ ভূমিকা (Introduction)

মূল্যায়ন প্রাত্যহিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কর্মক্ষেত্রে আমরা সচেতনভাবে বা নিজেদের অজান্তে মূল্যায়ন করে থাকি বা কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। যখন কোন ব্যস্ত রাস্তা অতিক্রম করি তখন সিদ্ধান্ত নিই রাস্তা অতিক্রম করবো কিনা।

শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শিক্ষককে শিক্ষার্থীকে বুঝতে, শিখন অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা করতে এবং শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যাবলীর কতটা এবং কোনটি অর্জন করা গেছে তা জানতে সাহায্য করে। এই কারণে প্রত্যেক শিক্ষকের শ্রেণী কক্ষের কাজ কর্মের উন্নয়নের জন্য মূল্যায়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। এই ইউনিটে আমরা শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের স্থান, ধারণা প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করব।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।

* শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের অবদান জানতে পারবে।
* মূল্যায়নের ধারণা সম্বন্ধে জানতে পারবে।
* মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে।
* টেস্ট ও পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে।
* মূল্যায়ন রিপোর্টের অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যাবলী জানতে পারবে।
* মূল্যায়নের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে।

১.৩ শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের ভূমিকা (Role of Evaluation in the Teaching-Learning Process)

স্কুল পরিবেশে যেকোনো ধরনের কাজকর্ম শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনার প্রত্যাশিত পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এজন্য শিক্ষকের শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়ে সঠিক শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন ও সংগঠিত করেন এবং সঠিক পদ্ধতি ও মাধ্যম ব্যবহার করে তা পরিচালনা করেন। শিক্ষাদানের পরবর্তী যৌক্তিক কাজ হল কোন নির্দিষ্ট পাঠের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যের কতটা শিক্ষার্থী দ্বারা অর্জিত হয়েছে তা মূল্যায়ন করা। শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের স্থান নিম্নে দেওয়া হল—

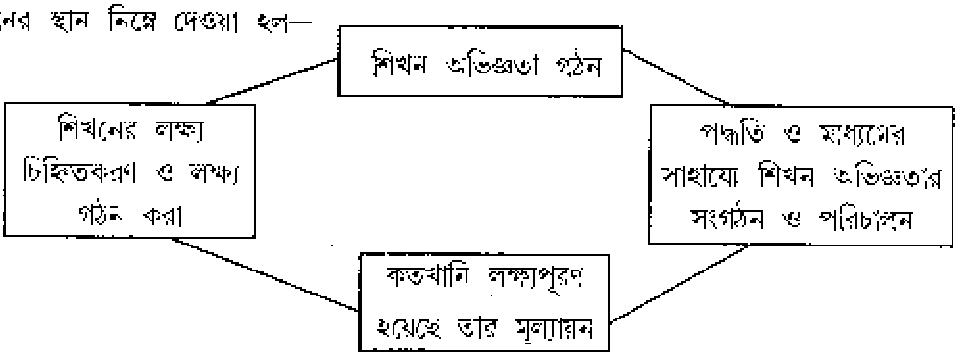

শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের স্থান

উপরের গঠন থেকে পরিষ্কার যে শিক্ষা শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়ন অপরিহার্য্য, একটি উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। মনে কর, ইতিহাসের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের 'সিন্ধু সভ্যতা' নিয়ে শিক্ষাদান করতে চান। এক্ষেত্রে সাধারণ লক্ষ্য হতে পারে — শিক্ষার্থীরা সিন্ধু সভ্যতার বৃদ্ধি ও ধ্বংস সম্পর্কে জানতে পারবে। একইভাবে তিনি নির্দিষ্ট শিখন উৎপাদন হিসাবে ধরতে পারেন—শিক্ষার্থীরা মানচিত্রে সিন্ধু সভ্যতার অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে।

এই লক্ষ্যগুলির উপর নির্ভর করে শিক্ষক তাঁর শিখন অভিজ্ঞতাবলী প্রস্তুত স্থির করবেন। এই শিখন অভিজ্ঞতাবলীকে অন্যভাবে উপাদান নিবেশ বিনিয়োগ বলা হয়, এই উপাদান ক্ষেত্রের মধ্যে সিন্ধু উপত্যকার বৃদ্ধি, জনগণের ধর্মমত, আর্থিক এবং সামাজিক জীবন ও ধ্বংস থাকতে পারে।

শিখন অভিজ্ঞতা স্থির করার পর শিক্ষক সঠিক পদ্ধতি এবং মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে তা পরিচালনা/শিক্ষাদান করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক 'বক্তৃতা/ভাষণ ও আলোচনা' বা 'প্রশ্নোত্তর' প্রভৃতি পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। তিনি তালিকা, মানচিত্র, মডেল, অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্লিপিংস, কম্পিউটার নকশা/চিত্রলেখ প্রভৃতি ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষা-শিখন পদ্ধতির শেষ স্তর হল মূল্যায়ন যেখানে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বিচার করা হয়। মূল্যায়ন শিক্ষককে লক্ষ্য অর্জনের পরিধি জানতে ও নানান তথ্য জানতে সাহায্য করে। এটি শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে—

* লক্ষ্যের সংশোধন বা বাদ দেওয়ার দরকার আছে কিনা জানতে সাহায্য করে।
* শিখন অভিজ্ঞতা পুনর্গঠন বা বাতিল করতে হবে কিনা জানতে সাহায্য করে।
* নির্বাচিত পদ্ধতি এবং মাধ্যম পরিবর্তন / বদল করার প্রয়োজন আছে কিনা জানতে সাহায্য করে।
* নির্বাচিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা বা পরীক্ষনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা জানতে সাহায্য করে।

উপরের আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়ার নানা দশা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মূল্যায়নের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যরাশি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন বিদ্যালয় শিক্ষা প্রসঙ্গে মূল্যায়নের ধারণা বুঝতে চেষ্টা করা হবে।

১.৪ মূল্যায়নের ধারণা (Concept of Evaluation)

এখন মূল্যায়ন সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছে তার সংজ্ঞা দিন। নিজের মতো করে মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিন— নিশ্চয় নিম্নের যে কোন একটি বা অন্যভাবে মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিয়েছেন—

- শ্রেণীকক্ষমূলক শিক্ষাদানের সাফল্য / কার্যকারিতা জানার পদ্ধতি হল মূল্যায়ন।
- শিক্ষার লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা জানার পদ্ধতি হল মূল্যায়ন
- শিক্ষার্থীর কৃতকার্য / সাফল্য জানার পদ্ধতি হল মূল্যায়ন।

উপরি উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি যদিও মূল্যায়নের ধারণা সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেয় তবুও আরো সুনির্দিষ্টভাবে মূল্যায়নের সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন।

১.৪.১ মূল্যায়ন কি ? (What is Evaluation)

শিক্ষামূলক মূল্যায়ন নিয়ে বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। ১৯৮১ সালে গ্রোনলাণ্ড-এর মতে—"evaluation is a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils"। এই সংজ্ঞা দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়। প্রথমতঃ সংগঠিত পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীদের সাধারণ অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ পরিহার করে। দ্বিতীয় শিক্ষাদানের লক্ষ্য শিক্ষক দ্বারা পূর্বনির্ধারিত।

১৯৭৭ সালে C.E. Beeby-র মতে মূল্যায়ন হল "the systematic collection and interpretation of evidence leading as a part of process to a judgement of value with a view to action." এই সংজ্ঞা থেকে মূল্যায়নের চারটি উপাদান পাওয়া যায়। এগুলি হল—

(ক) সংগঠিতভাবে তথ্য বা প্রমাণের সংগ্রহ। (খ) সংগ্রহ করা প্রমাণের বিশদীকরণ/ব্যাখ্যা করা। (গ) প্রমাণের বিশদীকৃত/ব্যাখ্যাত অর্থের মূল্য বিচার করা। (ঘ) মূল্য বিচারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রতিবিধান গ্রহণ করা।

১.৪.২ পরিমাপ এবং মূল্যায়ন (Measurement and Evaluation)

পূর্ববর্তী সংজ্ঞা থেকে বিবেচনা করে মূল্যায়নের দুটি মুখ্য উপাদান লাভ করা যায়। সেগুলি হল—

(ক) পরিমাপ, (খ) মূল্যায়ন।

পরিমাপ বলতে সাধারণভাবে একটি পরীক্ষাতে শিক্ষার্থীর কৃতকর্মের/সাফল্যের সংখ্যাগত মানকে বোঝায়। উদাহরণ—বার্ষিক পরীক্ষাতে হরি অঙ্কে ৯০ নম্বর, রাম ইংরাজীতে ৫৫ নম্বর, জোসেপ বিজ্ঞানে ৭৫ নম্বর পেয়েছে। এখানে ৯০, ৫৫, ৭৫ হল তাদের সাফল্যের/কৃতকার্যের সংখ্যাগত মান। এইভাবে পরিমাপ হল পরিমেয় প্রকৃতির। পরিমাপ পদ্ধতিতে নানা প্রক্রিয়া— মৌখিক, লিখিত প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে— একজন তথ্যসংগ্রহ করতে পারে এবং বিভিন্ন পরীক্ষন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

অনেক পরিস্থিতি আছে যেখানে শিক্ষার্থীর সাফল্য/কৃতকার্যের সংখ্যাগত মূল্য/মান দেওয়ার পরিবর্তে বর্ণনা দেওয়া হয়। এইগুলি হল গুণগত বর্ণনা এবং এদের অপরিমেয় পরিস্থিতি বলা হয়। উদাহরণ শ্যামের হাতের লেখা খুব পরিষ্কার। কিন্তু এই পরিমেয় এবং গুণগত বর্ণনা থেকে শিক্ষাদানের লক্ষ্যের কতখানি শিক্ষার্থী দ্বারা অর্জিত হয়েছে সেই সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারা যায় না। সেইহেতু 'কতবেশী', 'কত কম' আরও কত, কত বড় প্রভৃতির পরিভাষা অনুযায়ী গুণগত পরিমেয় এবং গুনমান সম্পন্ন ফলের প্রকাশ আকাঙ্ক্ষিত।

উদাহরণ—

* গনেশ অঙ্কে ৯৫ নম্বর পেয়েছে- চমৎকার (Excellent)
* রবীন্দ্র অঙ্কে ৫০ নম্বর পেয়েছে- সাধারণ (Average)
* গজেন্দ্র অংকে ৩০ নম্বর পেয়েছে—সাধারণের নীচে (Below Average)

উপরের উদাহরণের প্রথম অংশ শিক্ষার্থীদের অংকে সাফল্যলাভের পরিমেয় বর্ণনা সূচিত করে এবং চমৎকার', 'সাধারণ', 'সাধারনের নীচে' শিক্ষার্থীর সাফল্যের মূল্য বিচার করে। সেই কারণে মূল্যায়ন হল - পরিমাপ (পরিমেয় সংখ্যাগত বর্ণনা) এবং/অথবা অপরিমেয় (গুণগত বর্ণনা) + মূল্য বিচার।

পরিমাপ এককভাবে মূল্যায়নের সমতুল্য নয়। সংস্কৃত পরিভাষায় পরিমাপের জন্য 'মাপন' এবং মূল্যায়নের জন্য 'মূল্য-মাপন' এদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে সূচিত করে। মূল্যায়ন হল অধিকতর সর্বাঙ্গীণ/ব্যাপক যাতে পরিমেয় এবং অপরিমেয় বর্ণনা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

মূল্যায়নের অন্য একটি বিষয় হল মূল্যায়িত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কর্মসূচী গ্রহণ করা। এই পদক্ষেপ/কর্মসমূহের শ্রেণী কক্ষের শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংশোধন বা উন্নয়নের জন্য করা হয়ে থাকে। কখনো কখনো বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত কিছু কাজ ও এই মূল্যায়িত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়ে থাকে।

১.৪.৩ অভীক্ষা ও পরীক্ষা (Tests and Examination)

অনেক সময় অভীক্ষা এবং পরীক্ষাকে আমরা মূল্যায়নের সঙ্গে তুলনা করি। কিন্তু অভীক্ষা এবং পরীক্ষার দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করি। অভীক্ষাতে শিক্ষার্থীকে এক বা একাধিক পরিস্থিতি দেওয়া হয় যাতে একটি নির্দিষ্ট পথে শিক্ষার্থী তার সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে। মানুষের সমস্ত ক্ষমতা রাশি পরিমাপ করার জন্য অভীক্ষা গঠন করা যেতে পারে। অভীক্ষা বুদ্ধিমত্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, অন্তর্নিহিত প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অভীক্ষা কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব সাফল্য পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অভীক্ষাকে তার ব্যবহারের সময়ের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন নামে যেমন—ইউনিট টেস্ট, সাপ্তাহিক টেস্ট, মাসিক অভীক্ষা প্রভৃতি বলা হয়। যখন অনেক সময় পর বা কোর্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অভীক্ষা ব্যবহার করা হয় তখন তাকে সেমিস্টার এবং বছরের শেষে হলে তাকে পরীক্ষা (Examination) বলে। বাস্তবিক অর্থে অভীক্ষা এবং পরীক্ষার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

১.৫ ভালো মূল্যায়ন হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of A Good Evaluation Tools)

উপরে আলোচনা করা হয়েছে মূল্যায়ন ফল মূল্যায়নের বিভিন্ন হাতিয়ারের সাহায্য পাওয়া যায়। এই হাতিয়ারগুলি হল বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত নানান পরীক্ষা ও অভীক্ষা সমূহ যেমন কৃতিত্বের / সাফল্য অর্জনের পরীক্ষা শিক্ষার্থীর নির্বাচন, নিয়োগ, সনাক্তকরণ অথবা কোন একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর দখল সম্পর্কে প্রশংসাপত্র প্রদান করার জন্য করা হয়ে থাকে। দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিখন কর্মসূচীতে বা পেশায় সাফল্যলাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। কোন নির্দিষ্ট মূল্যায়ন হাতিয়ার ব্যবহার করার সময় তার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখা উচিত। এইগুলি হল—বৈধতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, বস্তুনিরপেক্ষতা, ব্যবহারিকতা।

১.৫.১ বৈধতা (Validity)

গ্রোনলাণ্ড (১৯৮১)-এর মতানুযায়ী বৈধতা বলতে অভিপ্রেত কাজের জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল কতখানি সক্ষম তাকেই বোঝায়। অর্থাৎ যে কাজের জন্য হাতিয়ার খানি ব্যবহার করা হচ্ছে তা কতখানি করতে সক্ষম। এটা ট্রেনের টিকিটের মতো। যদি টিকিটের দ্বারা নির্দিষ্ট তারিখে যে ট্রেনের জন্য কাটা হয়েছে সেই ট্রেনে ভ্রমণ করা যায় তবে তাকে বৈধ টিকিট বলা হয়। বৈধতা চার প্রকারের হয় এইগুলি হল—বিষয়বস্তুর বৈধতা, ভবিষ্যৎবাণীর বৈধতা, সহাবস্থিত বৈধতা এবং গঠন বৈধতা।

বিষয়বস্তুর বৈধতা (Content Validity) : বিদ্যালয়ে, শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট শিক্ষা ক্ষেত্রে বা বিষয়ে দক্ষতা জানার জন্য আমরা অভীক্ষা (প্রশ্নপত্র) গঠন করি। কিছু অ্যাচিভমেন্ট অভীক্ষা শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট শিক্ষণ ক্ষেত্রে কতটা শিক্ষণ লাভ করেছে তা পরিমাপ করতে সক্ষম হয়। এই ধরনের সাফল্য নির্ণায়ক টেস্ট যদি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয় তবে সেই টেস্টের বিষয়বস্তুর বৈধতা আছে বলে মনে করা হয়।

ভবিষ্যৎ বাণীর বৈদ্ধতা (Predictive Validity) : কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কৃতিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য যে ধরনের টেস্ট গঠন করা হয় তার বৈধতা থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ ঐ টেস্টের দ্বারা শিক্ষার্থী বিষয়ক কোন ভবিষ্যৎবাণী যদি সঠিক হয় তবে ঐ টেস্টের বৈধতা আছে বলে মনে করা হয়। যেমন শিক্ষার্থীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরীক্ষা শিক্ষককে শিক্ষার্থীর ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে সক্ষম করে।

সহবর্তী বৈধতা (Concurrent Validity) : যখন একটি টেস্ট স্কোর সমসাময়িক অন্য একটি টেস্ট স্কোরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তখন আমরা টেস্টের সহবর্তী বৈধতা আছে বলে মনে করি। উদাহরণ—শিক্ষা সংক্রান্ত সক্ষমতা টেস্টের বৈধতা জানার জন্য টেস্ট রেজাল্ট আমরা শিক্ষার্থীর বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারি।

গঠন বৈধতা (Construct Validity) : অনেক সময় আমরা শিক্ষার্থীর মনোবিদ্যাগত বৈশিষ্ট্য যেমন—বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা, আগ্রহ, যৌক্তিক সক্ষমতা প্রভৃতি পরিমাপ করতে আগ্রহী হয়ে থাকি। যখনই আমরা পরীক্ষার সাফল্য গুনমানের নিরিখে ব্যাখ্যা করতে চাই তখনই আমরা গঠন বৈধতা নিয়ে আলোচনা করি। এই মনোবিদ্যাগত প্রণালী বা গঠনগুলি বিমূর্ত প্রকৃতির যাদের মনোবিদ্যামূলক গুনমানের পরিভাষা অনুযায়ী সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়ে থাকে। বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষার স্কোর অবশ্যই শিক্ষার্থীর বুদ্ধি পরিমাপে সম্যক হবে। একইভাবে সৃজনশীলতা বিষয়ক পরীক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে এর মাত্রা নির্ণয়ে সক্ষম হওয়া উচিত। একটি টেস্টের গঠন বৈধতা আছে বলে মনে করা হবে যদি এর প্রাপ্ত স্কোর জ্ঞাত মনোবিদ্যামূলক ধারনা/প্রণালীর সঙ্গে একই হয়।

১.৫.২ বিশ্বাসযোগ্যতা (Reliability) :

মনে করুন আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের অংক পরীক্ষা নিয়েছেন এবং তাদের স্কোর করেছেন কিছুদিন পর, এক সপ্তাহ, বা ১৫ দিন পর বা এক মাস পর একই প্রশ্নে একই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর যদি আগের পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে একই হয় তখন সেই পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্য আছে বলে মনে করা হয়। পরীক্ষার বিশ্বাস যোগ্যতা বলতে বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষার ফলের সংগতি বোঝায়। যখন কোন পরীক্ষা একই দলের উপর খুব অল্প সময়ের পার্থক্যে পরপর দুবার নেওয়া হয় তখন শিক্ষার্থীর স্মৃতি, মনোযোগ, প্রচেষ্টা, ক্লান্তি, প্রাক্ষোভিক চাপ, অনুমান প্রভৃতির পার্থক্য হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। আবার যদি দীর্ঘ সময় পরে একই পরীক্ষা নেওয়া হয় তবে শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি, শারীরিক পরিবর্তন, বিস্মৃতি, প্রভৃতির কারণেও প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। সেই কারণে একটি পরীক্ষা বিশ্বাসযোগ্যতার মাত্রা (উচ্চ বা নিম্ন) নির্ভর করে একটি পরীক্ষা থেকে অন্য পরীক্ষা অবস্থিত ভুলের পরিমাণ বা বহিরাগত দলের উপস্থিতির উপর—পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতার পরিমাপের অনেক পথ রয়েছে। যেমন

(ক) পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা (Test-Retest Reliability) : এই পদ্ধতিতে একই পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একই শিক্ষার্থীদের উপর দুবার প্রয়োগ করা হয়। যেমন একজন শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের ইতিহাসের

একটি পরীক্ষা নেন এবং এক মাস পর আবার ঐ একই পরীক্ষা নেন। যদি পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষার ফলাফল একই বা একই ধরনের হয় তবে সেই পরীক্ষাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

(খ) সমতুল্য গঠন বৈধতা (Equivalent Forms of Reliability) : একই পরীক্ষার জন্য দুটি সমতুল্য প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীরা দুটোতেই পরীক্ষা দেওয়ার পর যদি প্রাপ্ত নম্বর একই হয় তবে পরীক্ষার সমতুল্য গঠন পদ্ধতির বিশ্বাস যোগ্যতা আছে বলে মনে করা হয়।

দ্বিধা-বিভক্ত বিশ্বাসযোগ্যতা (Split half -Reliability) :

পরীক্ষার প্রাপ্ত মানের বিশ্বাসযোগ্যতা একই প্রশ্নের একবার পরীক্ষা নেওয়ার পরও নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি দুটি সমান অংশে ভাগ করা হয়। প্রতিটি অংশ একে অন্যের সঙ্গে সমতুল্য। এই ধরনের বিভাজনের ভিত্তি হল একটি পরীক্ষার সমস্ত বিষয়বস্তু (প্রশ্নসমূহ) কোনো ব্যক্তির সদ্‌গুণের পরিমাপের জন্য গঠিত। যখন পরীক্ষাটি ভাগ করা হয় সাধারণত যুগ্ম সংখ্যার বিষয়গুলির স্কোর এবং অযুগ্মসংখ্যার বিষয়গুলির স্কোর আলাদাভাবে যোগ করা হয়। যেহেতু বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষাকে দুইভাগে ভাগ করে এবং প্রত্যেক ভাগের স্কোর আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয় তাই একে দ্বিধা-বিভক্ত বৈধতা বলা হয়।

১.৫.৩ বস্তুনিরপেক্ষতা (Objectivity)

এটি মূল্যায়ন হাতিয়ারের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য। বিশ্বাস যোগ্যতা বলতে শিক্ষার্থীদের একটি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে অন্য পরীক্ষার সংগতি/সামঞ্জস্যকে বোঝায়। তেমনি বস্তুনিরপেক্ষতা বলতে বিভিন্ন স্কোরারের স্কোরের সংগতিকে বোঝায়। মনে কর, শিক্ষকের দ্বারা গৃহীত পরীক্ষার উত্তর পত্রের মূল্যায়নের পর প্রদত্ত নম্বর অন্য একজন শিক্ষকের দ্বারা একই উত্তর পত্রের মূল্যায়নের পর প্রদত্ত নম্বর যদি একই হয় তবে মূল্যায়নের বস্তুনিরপেক্ষতা আছে বলে মনে করা হয় যেহেতু এক স্কোরারের সঙ্গে অন্য স্কোরারের মূল্যায়নের সংগতি আছে। এখানে স্কোরারের ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব মূল্যায়নে নম্বর প্রদানে কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার করে না।

১.৫.৪ ব্যবহারিকতা (Usability) :

ব্যবহারিকতা বলতে পরীক্ষার সম্ভাব্যতা / সুসাধ্যতাকে বোঝায়। ভিন্ন শিক্ষাদানমূলক লক্ষ্যের নানান হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য এই সমস্ত হাতিয়ারগুলি পরিচালনার পদ্ধতি, স্কোরিং, সময়ের প্রয়োজন এবং খরচের নিরিখে ভিন্ন। এই কারণে কোন একটি হাতিয়ার নির্বাচন কালে শিক্ষকের এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত।

১.৬ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Purpose of Evaluation)

মূল্যায়িত তথ্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই নানান উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে।

১.৬.১ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানমূলক নির্দেশনার উন্নয়ন (Improvement of Classroom Instruction)

শ্রেণীকক্ষে সুসংগঠিত ভাবে মূল্যায়নের অন্যতম মুখ্য সুবিধা হল এটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানমূলক নির্দেশনা বা শিক্ষা-শিখন পদ্ধতির উন্নয়নে সাহায্য করে। শিক্ষা-শিখন পদ্ধতির বিভিন্ন মুখ্য কার্যকলাপ নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমটি হল শিক্ষাদানমূলক উদ্দেশ্যাবলী। এই সমস্ত উদ্দেশ্যাবলী শিক্ষক এবং

শিক্ষার্থীদের সঠিক পথনির্দেশ করে এবং কার্যকরী শিখন অভিজ্ঞতার উৎস হিসাবে কাজ করে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে শিখন অভিজ্ঞতারাশি চিহ্নিত করা হয় এবং সঠিক পদ্ধতি ও মাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের পরিবেশন করা হয়। শিখন অভিজ্ঞতা প্রদানের আগে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান ও নেপথ্য / পশ্চাৎপট জানা জরুরী। এই গঠনতন্ত্রের সর্বশেষ কাজ হল শিক্ষার্থীর সাফল্য মূল্যায়ন করা। এটি পরবর্তী শিক্ষামূলক কাজে যাওয়ার আগে করা হয়ে থাকে। যদি মূল্যায়িত ফল শিক্ষকের কাছে সন্তুষ্টিজনক বা পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর অনুরূপ হয় তবে শিক্ষা-শিখন পদ্ধতি কার্যকরী ফলপ্রসূ বলে ধরা যেতে পারে যদি তা না হয় তবে মূল্যায়িত ফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষন অভিজ্ঞতা পুনরায় পরিকল্পনা করা উচিত। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা-শিখন পদ্ধতির প্রতিটি ধাপ পরীক্ষা করে শিখন পদ্ধতির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করা দরকার।

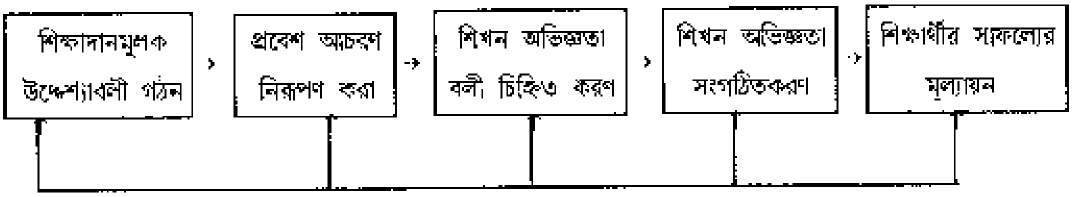

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানে মূল্যায়নের ভূমিকা/অবদান উপরে রেখাচিত্র/নকশা থেকে স্পষ্ট যে মূল্যায়ন ফল শিক্ষক শিক্ষাদানমূলক পদ্ধতির প্রতিটি ধাপের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করেন।

১.৬.২ শিখন পদ্ধতির উপর নজরদারী (Monitoring of Learning Process)

মূল্যায়ন ফল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন এবং পরামর্শদানের জন্য ব্যবহার করেন এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য উন্নয়নের নিয়ন্ত্রণ করেন। শিক্ষক মূল্যায়নের ফলের সাহায্যে তাঁর নিজের শিক্ষাদানমূলক নির্দেশনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেন।

উদাহরণ—রচনা লেখার পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের নিম্নমানের উৎকর্ষতা প্রমাণ করে ধারনার সংগঠন ও প্রকাশ করার জন্য শিক্ষার্থীদের অধিক অনুশীলনের প্রয়োজন।

শিক্ষক মূল্যায়নের ফল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক লক্ষ্যে কাজ করার জন্য এবং শিখন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়—জ্ঞান প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করতে পারেন। উৎসাহ এবং আগ্রহ ছাড়া উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করা শিক্ষার্থীদের কাছে অর্থবহ নয়। মূল্যায়ন ফল সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য এবং বিষয়ের শিখন উন্নয়নে পুনর্নিবেশ করে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে সাহায্য করে। সর্বাধিক ফললাভের জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতির কোর্সের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী উপস্থাপিত করা উচিত, এবং পুনর্নিবেশ সক্রিয় এবং নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

১.৬.৩ শিখন জটিলতাসমূহের সনাক্তকরণ ও তার প্রতিবিধান (Diagnosis and Remediation of Learning Difficulties)

মূল্যায়ন তথা শিখন জটিলতার সনাক্তকরণ ও তার প্রতিবিধান সমূহ প্রদান করে। শিখন জটিলতা নিম্নলিখিত উপায়ে সনাক্তকরণ করা যেতে পারে—

(ক) কোন শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যা আছে তা নির্ধারণ করা।

(খ) শিখন জটিলতার / সমস্যার মাত্রা নির্ধারণ করা।

(গ) শিখন জটিলতার / সমস্যার কারণ সমূহ নির্ধারণ করা।

(ঘ) সঠিক প্রতিবিধান ব্যবহার করা।

(ক) কোন শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যা আছে তা নির্ধারণ করা (Determining which Students Are Having Learning Difficulties) : শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য নানা পদ্ধতি আছে। একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল নির্দিষ্টমান সম্পন্ন সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষার ফল শিক্ষাসংক্রান্ত প্রবনতা পরীক্ষার ফলের সঙ্গে তুলনা করা। যদি শিক্ষার্থীর সাফল্যমান শিক্ষা-প্রবণতার চেয়ে কম হয় তবে ধরে নেওয়া যায়—শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যা আছে। কখনো কখনো এই ধরনের পরীক্ষার সামগ্রিক ফল শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যাকে সূচিত করে না। সেই কারণে পরের পরীক্ষায় পরীক্ষার একক বিষয়ের পুনরায় পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। শিখন সমস্যা চিহ্নিতকরণের অন্য পদ্ধতি হল— অপ্রত্যক্ষ শ্রেণীকক্ষ মূল্যায়ন পদ্ধতি, সেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তার সমস্যা নির্ণয়ে সাহায্য করবেন।

(খ) শিখন সমস্যার মাত্রা নির্ণয় করা (Determining the Degree of Learning Difficulties) : এটি নানা মাত্রার হতে পারে। কিছু সমস্যা পুনরালোচনা করে ঠিক করা যায়। কিছু ক্ষেত্রে পুনরায় সনাক্তকরণমূলক অধ্যয়ন পরিচালনা করা দরকার। এবং কিছু ক্ষেত্রে শিখন সমস্যা এতই তীব্র যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সনাক্তকরণের জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো প্রয়োজন হয়।

(গ) শিখন সমস্যার কারণবাচক উপাদান সমূহের নির্ধারণ (Determining the Factors Causing the Learning Difficulties) : শিখন সমস্যার জন্য অনেক বিষয় দায়বদ্ধ থাকতে পারে। শিখন বা অর্জন করা সম্ভব নয় এমন অনেক শিক্ষা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। অনুপযুক্ত শিখন অভিজ্ঞতা, বেঠিক শিখন পদ্ধতি, ভুল মাধ্যমের ব্যবহার, জটিল কোর্স উপাদান, শিখন অভিজ্ঞতার ভুল পরিচালনা প্রভৃতি শিখন সমস্যার কারণ হতে পারে। এই ধরনের দুর্বলতা, ভুলগুলি চিহ্নিত করে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত : এইভাবে মূল্যায়ন ফলের শিক্ষাদানের উন্নয়নে প্রভূত অবদান আছে।

(ঘ) প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ (Applying Remedial Procedures) : শিখন সমস্যার সমাধানের একাধিক পথ আছে: প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে সমস্যার তীব্রতার উপর। কিছু ক্ষেত্রে এটি শিক্ষা-শিখন পদ্ধতির পর্যালোচনা এবং পুনরায় শিক্ষাদান হতে পারে। কিছু অন্য ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানের জন্য সুসংগঠিত সনাক্তকরণমূলক পদ্ধতি এবং ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। প্রতিবিধানমূলক কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হল পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন এবং অধিকতর ভালো ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভাবন।

১.৬.৪ সঠিক পেশার নির্বাচন ও ভবিষ্যৎবাণী (Prediction and Selection for the Right Profession)

পরীক্ষন এবং মূল্যায়নের কাজ হল একটি নির্দিষ্ট পেশায় শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা। এছাড়া পেশা নির্বাচনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। আমরা সাধারণ সক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য নানা বুদ্ধিমত্তা ও গবেষণা কৃতলব্ধ পরীক্ষা সম্বন্ধে জানি। এছাড়া অনেক প্রবনতা পরীক্ষা আছে যেগুলি ব্যক্তির বিভিন্ন পেশামূলক যেমন— কলা, মিউজিক, নাটক, চিকিৎসা, শিক্ষা, যান্ত্রিক, কম্পিউটার, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কাজের প্রতি প্রবনতা পরিমাপ করে।

বিজ্ঞান ও শিক্ষক প্রশিক্ষনে কিছু প্রবনতা পরিমাপক টেস্ট আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে। যেমন—

- Scientific Aptitude Test for college students by A.K.P. Sinha and L.N.K. Sinha.
- Scientific Aptitude Test Battery (Hindi) by K. K. Agarwal.
- Teaching Aptitude Test Battery by Shamon Karim and A. K. Dixit.
- Teaching Aptitude Test Battery by R. P. Singh and S. N. Sharma.

প্রবণতা পরীক্ষাসমূহ সাধারনত কি ধরনের কাজ একজন ব্যক্তি করতে পারে তা নিরুপন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তির কম্পিউটার অপারেটর হিসাবে কাজের সক্ষমতা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে হয় তবে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু বিশদভাবে প্রবণতা পরীক্ষার অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত।

১.৬.৫ সাহায্য ও পরামর্শ (Guidance and Counselling)

সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য মূল্যায়ন ফল খুবই জরুরী। শিক্ষক মূল্যায়ন ফল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত, শিক্ষাগত, কর্মগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করতে পারেন। এছাড়া, পাঠ্যক্রমিক এবং সহপাঠ্যক্রমিক নির্বাচন। সামাজিক ও ব্যক্তিগত অভিযোজন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারেন। সাহায্য-দানকালে শিক্ষক আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবনতা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ের পরীক্ষাগুলি ব্যবহার করতে পারেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সাহায্য ও পরামর্শদানমূলক কাজের খুবই দরকার। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা অনেক ব্যক্তিগত, শিক্ষাগত এবং কর্মগত সমস্যার সম্মুখীন হয়। তারা তাদের ভবিষ্যৎ পছন্দের কোর্স নির্বাচনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে চায়। তারা তাদের সর্বাপেক্ষা অধিক পছন্দের পেশা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে চায়। তারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যারও মুখোমুখী হয়। যদি তারা নূতন বিদ্যালয়ে যায় তবে নূতন বিদ্যালয় পরিবেশের সম্মুখীন হয়। সাহায্য ও পরামর্শদান একজন ব্যক্তিকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এটি ব্যক্তিকে বিভিন্ন বিষয়ে তার সরল দিক ও দুর্বল দিকগুলি জানতে সাহায্য করে। তার নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা উপলব্ধি করতে এবং সমস্যা বুঝতে ও এককভাবে সমাধান করতে সাহায্য করে।

১.৬.৬ গ্রেডিং (Grading)

পরীক্ষন ও মূল্যায়নের কাজ হল স্তর বিন্যাস করা। মূল্যায়ন ফলের উপর নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট দলের শিক্ষার্থীর স্তর বিন্যাস করা হয়। প্রান্তিক পরীক্ষার ফল শিক্ষককে প্রাপ্ত নম্বর বা স্তরের উপর নির্ভর করে স্থান ও ক্রম নির্বাচনে সাহায্য করে।

১.৬.৭ বিদ্যালয় পরিচালনা (School Administration)

বিদ্যালয় পরিচালনায় মূল্যায়নের যথেষ্ট অবদান আছে। পরিচালকমণ্ডলীর বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের কতখানি পরিচালিত হয়েছে তা জানা দরকার। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সংশোধন করতে (যদি প্রয়োজন হয়) শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা অনুযায়ী তাদের দলবদ্ধ করতে এবং তাদের পরবর্তী উচ্চশ্রেণীতে প্রেরণ করার জন্য মূল্যায়নের প্রয়োজন।

১.৬.৮ গবেষণায় ব্যবহার (Use in Research)

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের কার্যকারিতা, শিখন অভিজ্ঞতা প্রদানকালে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও মাধ্যমের কার্যকারিতা এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাফল্যের উপর বিদ্যালয় সংগঠনের প্রভাব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য বিদ্যালয় মূল্যায়ন ফল ব্যবহার করে গবেষণা করতে পারে।

১.৭ এককের সারাংশ (Unit Summary)

মনে রাখার বিষয়—

- শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।
- শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণ ও গঠন, শিখন অভিজ্ঞতার গঠন, শিখন অভিজ্ঞতার সংগঠিতকরন/পরিচালন এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্যের কতখানি অর্জিত হয়েছে তার মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষা-শিখন পদ্ধতি গঠিত।
- পরিমাপ বলতে সাধারনত সাফল্যের সংখ্যাগত মানকে বোঝায়, সেই কারণে এটি পরিমেয় প্রকৃতির।
- মূল্যায়ন হল পরিমাপ + মূল্যবিচার এবং সেই কারণে এটি গুণগত প্রকৃতির।
- টেস্টস এবং পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর সাফল্য মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।
- ভালো মূল্যায়ন হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—বৈধতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, বস্তুনিরপেক্ষতা এবং ব্যবহারিকতা।

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল—

- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন।
- শিখন সমস্যার সনাক্তকরণ ও তার প্রতিবিধান।
- সঠিক পেশার নির্বাচন ও তৎসংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী করা।
- সাহায্য ও পরামর্শ দান করা।
- স্তর বিন্যাস করা।
- বিদ্যালয় পরিচালনায় সাহায্য করা।
- গবেষনায় ব্যবহার করা।

১.৮ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check your Progress)

১। শিক্ষা-শিখন পদ্ধতির ধাপসমূহ কি কি?

২। মূল্যায়ন বলতে কি বোঝায়?

৩। নিম্নে মন্তব্যগুলির যেটি পরিমাপ সূচিত করে সেখানে 'M' এবং যেটি মূল্যায়ন সূচিত করে সেখানে 'E' লিখুন।

(ক) রাম প্রতি মিনিটে ৫০টি শব্দ টাইপ করে।

(খ) শ্রেণী পরীক্ষায় হরির উন্নয়ন সাধারণ।

(গ) সি.বি.এস.সি. পরীক্ষায় আমিন ৭৫ স্কোর করেছে।

(ঘ) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শোহন প্রথম হয়েছে।

৪। অভীক্ষা এবং পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৫। মূল্যায়ন হাতিয়ারের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬। পার্থক্য লিখুন—

(ক) উপাদান বৈধতা ও গঠন বৈধতা।

(খ) পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা বিশ্বাসযোগ্যতা ও দ্বি-বিভক্ত বিশ্বাসযোগ্যতা।

৭। মূল্যায়নের উদ্দেশ্যাবলী কি কি?

৮। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের উন্নয়নে মূল্যায়ন কিভাবে সাহায্য করে?

১.৯ বাড়ীর কাজ (Assignment)

১। অভীক্ষা ও পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

২। মূল্যায়ন হাতিয়ারের অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? সংক্ষেপে লিখুন।

৩। পার্থক্য লিখুন—

(ক) উপাদান বৈধতা ও গঠন বৈধতা।

(খ) পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা ও দ্বি-বিভক্ত বিশ্বাসযোগ্যতা।

১.১০ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion)

____

____

____

____

____

১.১১ উৎস (References)

1. Anansta,Ji A. (1976) Psychological Testing, 4th ed. New York : MacMillan Publishing Co.
2. Cronbeach, L. J. (1970) Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. New York: Harper and Row.
3. Gronlound, Norma E. (1981) Measurement and Evaluation in teaching, 4th ed. New York : MacMillan Publishing Co.
4. Throndike, R. L. and Wagen, E.P. (1977) Measurement and Evaluation in Psychological and Education, 4th ed. New York : John Wiley and Sons.

একক ২ ❑ মূল্যায়নের প্রকারভেদ (Types of Evaluation)

গঠন

২.১ ভূমিকা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ গঠনমূলক এবং সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন

২.৩.১ গঠনমূলক এবং সমষ্টিমূলক মূল্যায়নের প্রয়োজন

২.৩.২ গঠনমূলক এবং সমষ্টিমূলক মূল্যায়নের পার্থক্য

২.৪ আদর্শ / নিয়মভিত্তিক মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং মান / বৈশিষ্ট্যভিত্তিক মূল্যায়ন পরীক্ষা

২.৪.১ আদর্শ / নিয়ম ভিত্তিক মূল্যায়নের সুবিধা ও অসুবিধা

২.৪.২ মান / বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক মূল্যায়নের সুবিধা ও অসুবিধা

২.৫ বহির্মূল্যায়ন বনাম আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন

২.৫.১ বহির্মূল্যায়ন

২.৫.২ অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন

২.৬ কগনিটিভ এবং নন্-কগনিটিভ ফলাফলের মূল্যায়ন

২.৬.১ কগনিটিভ এবং নন্-কগনিটিভ আচরনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

২.৬.২ কগনিটিভ এবং নন্-কগনিটিভ আচরনের ক্ষেত্রসমূহ

২.৬.৩ কগনিটিভ এবং নন্-কগনিটিভ আচরনের মান নির্ধারনের হাতিয়ার এবং পদ্ধতিসমূহ

২.৭ মূল্যায়নের উদ্ভূত প্রবণতা ঃ মার্কিং বনাম গ্রেডিং

২.৭.১ মার্কিং প্রথা কি ?

২.৭.২ মার্কিং প্রথার অসুবিধাসমূহ

২.৭.৩ গ্রেডিং প্রথা কি ?

২.৭.৪ গ্রেডিং প্রথার কলাকৌশল

২.৮ এককের সারাংশ

২.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন

২.১০ বাড়ীর কাজ

২.১১ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

২.১২ উৎস

২.১ ভূমিকা (Introduction)

আগের এককে আমরা মূল্যায়নের ধারণা শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের স্থান, মূল্যায়ন হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং মূল্যায়নের উদ্দেশ্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনা থেকে এবং প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আপনি বিদ্যালয়ে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়ন সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকতে পারেন।

কর্মশীলতা—

মূল্যায়নের জন্য অনুসৃত নানা কাজকর্ম সম্পর্কে নিজের ভাষায় লিখুন—

আপনি মূল্যায়নের প্রকারভেদ সম্পর্কে নিম্নের বা তার থেকে বেশি বিষয়ে বলতে পারেন।

- অর্দ্ধ-বার্ষিক এবং বাৎসরিক পরীক্ষা।
- বিভাগীয় পরীক্ষা, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা।
- নাটক, খেলাধূলা প্রভৃতিতে শিক্ষার্থীদের সাফল্য মূল্যায়ন।
- বিতর্ক সভা, আলোচনা এবং একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সাফল্য/কৃতিত্বের মূল্যায়ন।
- বিদ্যালয়ে প্রশ্ন-প্রতিযোগিতা।

উপরের সমস্ত ধরনের মূল্যায়নগুলি শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের গুনের মূল্যায়নের জন্য করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত মূল্যায়ন কলাকৌশল সমূহকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের উদ্ভূত প্রবনতা/ধারা যেমন—মার্কিং ও গ্রেডিং নিয়ে আলোচনা করব।

২.২ উদ্দেশ্য (Objecives)

- উদ্দেশ্য সাধনের উপর নির্ভর করে মূল্যায়নের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জানতে পারা।
- গঠনগত ও সমষ্টিগত মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য জানতে পারা।
- শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে বৈশিষ্ট্যসূচক ও নিয়মসূচক মূল্যায়নের অবকাশ জানতে পারা।
- বহির্মূল্যায়ন ও অন্তর্মূল্যায়নের পার্থক্য জানতে পারা।
- শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ (Cognitive & non-cognitive) মূল্যায়নের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারা।
- মার্কিং ও গ্রেডিং বর্ণনা করতে পারা।
- মার্কিং-এর চেয়ে গ্রেডিং পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা/প্রাধান্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারা।

২.৩ গঠনগত ও সমষ্টিগত মূল্যায়ন (Formative And Summative Evaluation)

বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রায়শই একটি পাঠের শেষে ছোটোখাটো পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। কিছু শিক্ষক আবার কয়েকটি পাঠ সম্পূর্ণ হওয়ার পর পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এই সমস্ত অল্প সময় ব্যবধানে গৃহীত পরীক্ষাসমূহ শিক্ষার্থীর কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে উন্নয়ন নির্ধারণ/নিয়ন্ত্রণ করতে/বুঝতে সাহায্য করে। এই ধরনের পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কৃতকার্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এই ধরনের মূল্যায়নকে গঠনগত মূল্যায়ন এবং ব্যবহৃত পরীক্ষাগুলিকে গঠনগত পরীক্ষা বলে।

অন্যদিকে, শিক্ষক একটি কোর্সের মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর পরীক্ষা নিতে পারেন। প্রান্তিক অথবা বাৎসরিক মূল্যায়ন নির্দিষ্ট বিভাগের কোর্সের মেয়াদের শেষে পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। এই ধরনের পরীক্ষাকে সমষ্টিগত পরীক্ষা বলে এবং মূল্যায়নকে সমষ্টিগত মূল্যায়ন বলে।

২.৩.১ গঠনগত ও সমষ্টিগত মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা (Need for Formative and Summative Evaluation)

গঠনগত মূল্যায়নের প্রয়োজন এটি প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ এটি শিক্ষার্থীদের শিখন উন্নয়ন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। দ্বিতীয়তঃ এটি শিক্ষকদের শিক্ষাদানের কৃতকার্যতা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

শিক্ষার্থীর শিখন ও শিখনের গুণগত মানের ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। প্রতিটি শিক্ষার্থী তার ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী শিক্ষালাভ করে। সুতরাং শিখনের হার এবং প্রয়োজনীয় সময়ে পার্থক্য থাকে। গঠনগত মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অর্জিত শিক্ষার পরিমাণ, গুনমান, অগ্রগতির হার সম্পর্কে জানতে পারেন। মূল্যায়ন ফলাফলের উপর নির্ভর করে শিক্ষক প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীর দুর্বলতার জন্য প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মতামত ছাড়া গঠনগত মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষক শিক্ষাদানে সক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারেন। কতটা ভালোভাবে শিক্ষাদান করেন? মূল্যায়নের আলোকে তাঁর শিক্ষাদানে প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষক জানতে পারেন। এই ধরনের মূল্যায়ন শিক্ষা-শিখন পদ্ধতির অন্তর্নিহিত বন্ধন জোরালো করে। গঠনগত মূল্যায়ন সাধারনত কাগজ-পেন্সিল পরীক্ষা দক্ষতা, পরীক্ষা বা মৌখিক পরীক্ষা হিসাবে পরিচালিত করা হয়ে থাকে। এটি পাঠের বা বিভাগের বা একটি অধ্যায়ের শেষে বা শিখনের প্রতিটি স্তরে করা হয়ে থাকে। গঠনগত মূল্যায়নের একটি আধুনিকতম ফরমাট হল ফ্লোচার্ট যাতে শিক্ষা নির্দেশনা, নিরাপদ যাচাই, সনাক্তকরনমূলক প্রশ্নাবলী এবং প্রতিবিধান সব একই সঙ্গে আছে।

সমষ্টিগত মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা—

সাধারনত এই ধরনের মূল্যায়ন কোর্সের শেষে বা শিক্ষাদানমূলক নির্দেশনার শেষে করা হয়ে থাকে। এটি প্রধানত কোর্সের শেষে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক সাফল্য/কৃতিত্ব মূল্যায়নের জন্য করা হয়ে থাকে। এটি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের কতখানি অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব/সাফল্য মূল্যায়িত এবং শংসায়িত হয়ে থাকে। সমষ্টিগত মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নয়ন, নূতন কর্মসূচীতে ভর্তি, নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্বাচন প্রভৃতি বিষয় সুনিশ্চিত করা হয়।

সমষ্টিগত মূল্যায়নে ব্যবহৃত কলাকৌশলগুলি হল—শিক্ষকের তৈরী উন্নতির পরীক্ষা। কৃতিত্বমূলক বিভিন্ন কাজ যেমন—পরীক্ষাগারের এবং মৌখিক রিপোর্টস-এর উপর রেটিং করা।

২.৩.২ গঠনগত ও সমষ্টিগত মূল্যায়নের পার্থক্য (Distinction between Formative and Summative Evaluation)

উপরের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত পার্থক্যগুলি হল—

(ক) শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন—গঠনগত মূল্যায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিখন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সাহায্য করা। সমষ্টিগত মূল্যায়নে ডিগ্রীর জন্য সাধারন মূল্যায়ন করা হয় যার মধ্যে সম্পূর্ণ কোর্সের বা এর সারগর্ভ অংশের বৃহত্তর এবং সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ—ছয় মাস পরে অর্দ্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় ইতিহাস পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধারনা, ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভৃতি তারা নূতন পরিস্থিতিতে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে কতখানি সমর্থ হয়েছে তা জানার জন্য সমষ্টিগত মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সমষ্টিগত মূল্যায়ন অনেক শিখন অভিজ্ঞতার সমষ্টি যেখানে একাধিক বিভাগ থাকতে পারে গঠনগত মূল্যায়ন ঐ নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতা যা একটি ধারনা, একটি তত্ত্ব বা একটি বিভাগ নিয়ে মূল্যায়ন করে থাকে। বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে—গঠনগত মূল্যায়ন কেবলমাত্র নিউটনের প্রথম সূত্রের পর বা সূত্রাবলীর পর করা যেতে পারে।

(খ) মূল্যায়নের পর্যাবৃত্তি—গঠনগত মূল্যায়ন নির্দিষ্ট সময় অন্তর করা হয়ে থাকে কিন্তু সমষ্টিগত মূল্যায়ন কোর্সের শেষে বা দীর্ঘসময়ের পর করা হয়ে থাকে।

(গ) শিখনের ও গঠনগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিখনপ্রাপ্ত জ্ঞানের/বিষয়ের পরিবর্তনের সুযোগ কেবলমাত্র সে বিষয়ের উপর মূল্যায়ন করা হচ্ছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সমষ্টিগত মূল্যায়নে শিখন প্রাপ্ত জ্ঞানরাশি/বিষয় যে কোনো অভিনব পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায় কারণ সমষ্টিগত মূল্যায়ন বৃহৎ এবং বিস্তৃত পরিস্থিতি সমূহের মূল্যায়ন হয়ে থাকে।

২.৪ আদর্শ / নিয়মভিত্তিক মূল্যায়ন পরীক্ষা (NRT - Norm Referenced Test) এবং মান/বৈশিষ্ট্যভিত্তিক মূল্যায়ন পরীক্ষা (CRT - Criterion Referenced Evaluation Test)

পরীক্ষার ফলাফলের বিশদ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে মূল্যায়নকে NRT এবং CRT এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার পর তাদের কৃতকার্যতা নম্বর বা গ্রেডে প্রকাশ করা হয়। এই নম্বর বা গ্রেড অর্থহীন হয়ে যায় যদি না তাদের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। সেই কারণে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন নির্দিষ্ট নিয়ম বা বৈশিষ্ট্যের নিরিখে করা হয়। নিয়ম স্থানীয় বা আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে এবং বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষকের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

এখন আমরা কিছু উদাহরনের সাহায্যে এই দুই ধরনের মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্যগুলি পরীক্ষা করে দেখব।

* **শিবম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে।**
* **মনিন্দরের বিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর মোটামুটি।**
* **নটরাজন সি.বি.এস.ই. পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান পেয়েছে।**

* জগদীশ ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।

উপরের উদাহরণগুলি ছাত্রদের নম্বর বা গ্রেডকে সুনির্দিষ্ট করছে না। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের শ্রেণী স্থানীয় রাজ্য বা জাতীয় স্তরে শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট স্থানকে ব্যাখ্যা করছে।

যখন কোনো পরীক্ষা বিদ্যালয়ে নেওয়া হয় তখন সেটা শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষা হতে পারে কিন্তু যখন এটি একটি এলাকা রাজ্য বা জাতীয় স্তরে হয় তখন এটি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী হয়। আমরা ৩নং এককে শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষা এবং নির্দিষ্টমান সম্পন্ন পরীক্ষা (Standardized Test) নিয়ে আলোচনা করব।

যখন পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর (Test score) কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের (Norms) উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করা হয় তখন তাকে নিয়ম নিরিখে মূল্যায়ন (NRE) বলে।

উদাহরণ ঃ

৫টির বেশি ভুল না করে অ্যান্টনি সর্বাধিক প্রতি মিনিটে ৫০টি শব্দ টাইপ করতে পারে।

তুষার ১০০টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মধ্যে ৬০ মিনিটে ৯৫টি সঠিকভাবে করতে পারে।

উপরের মন্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শিক্ষার্থীদের সাফল্য পূর্বনির্ধারিত কৃতিত্বের নিরিখে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম উদাহরনে শিক্ষক অ্যান্টনির কৃতিত্ব টাইপ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্টমান ৫০টি শব্দ প্রতি মিনিট-এর নিরিখে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় উদাহরনে শিক্ষক ১০০টির মধ্যে ৭৫টি প্রতিটি শিক্ষার্থীর সঠিক করতে হবে এই বৈশিষ্ট্য স্থির করেছেন। এখানে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য শিক্ষক নির্ধারিত লক্ষ্যের/উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে সময়ান্তরে পরিবর্তিত হতে পারে। যেহেতু পরীক্ষার কৃতিত্ব/সাফল্য বর্ণনা করার জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয় তাই এই ধরনের মূল্যায়নকে CRE বলা হয়।

২.৪.১ আদর্শ/নিয়মভিত্তিক মূল্যায়নের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Norm Referenced Evaluation)

সুবিধা—

* এটি শিক্ষার্থীদের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবদ্ধ করতে সাহায্য করে।
* এটি অভিভাবককে শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য যোগায়।
* নিয়োগকারীকে একটি দলে শিক্ষার্থীর আপেক্ষিক অবস্থান জানতে সাহায্য করে।
* চাকুরীর জন্য শংসাপত্র প্রদানে সাহায্য করে।
* শিক্ষার্থীকে শিক্ষামূলক এবং কর্মমূলক পরামর্শদানে শিক্ষককে সাহায্য করে।
* বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমের উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে।

অসুবিধা—

এই ধরনের মূল্যায়নের মুখ্য অসুবিধা হল দুইজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ৫৯ এবং ৬০ হলে তাদের সক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করা খুবই জটিল।

২.৪.২ মান/বৈশিষ্ট্যভিত্তিক মূল্যায়নের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Criterion Referenced Evaluation)

সুবিধা—

(ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাদানে সাহায্য করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাফল্যের বিচার নির্দিষ্ট নিয়মের উপর ভিত্তি করে করা হয়।

(খ) এটি শিক্ষককে শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যার সনাক্তকরনে সাহায্য করে।

(গ) এই ধরনের মূল্যায়ন থেকে শিক্ষক অনেক প্রতিক্রিয়া (feed back) বুঝতে পারেন যা শিক্ষককে শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিখন বস্তুর প্রস্তুতকরনে সাহায্য করে।

(ঘ) বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জনের মাত্রা সম্পর্কে পরিস্কার চিত্র প্রকাশ করে।

অসুবিধা—এই ধরনের মূল্যায়ন নিয়োগকারীকে বৈশিষ্ট্য নির্ভর কাজে শিক্ষার্থীর নির্বাচনে সাহায্য নাও করতে পারে।

২.৫ বহির্মূল্যায়ন বনাম অভ্যন্তরীন মূল্যায়ন (External Vs. Internal Evaluation)

কোন সংস্থা বা যারা পরীক্ষা পরিচালনা করেন তাঁদের উপর নির্ভর করে বহিঃ ও অন্তর্মূল্যায়নের পার্থক্য ঠিক করা হয়।

২.৫.১ বহির্মূল্যায়ন (External Examination)

শিক্ষা-শিখন কার্যাবলী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন বাইরের সংস্থা যখন পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করে তখন সেই পরীক্ষাকে বর্হিপরীক্ষা বলে এবং মূল্যায়ন হল বহির্মূল্যায়ন। দশম বা দ্বাদশ শ্রেণীর পর গৃহীত সব পরীক্ষাই হল এই ধরনের পরীক্ষা। এই পরীক্ষাগুলি সাধারনত কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (CBSE) বা ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (ICSE) প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হয়। শিক্ষক এবং বিদ্যালয় প্রত্যক্ষভাবে এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকে না। এই ধরনের পরীক্ষার ফল শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীর সাফল্য এই পরীক্ষা দ্বারা শংসায়িত হয়। এই ফলের দ্বারা বিদ্যালয়ের সক্ষমতা ও দুর্বল দিকগুলি পর্যালোচিত হয়।

২.৫.২ অন্তর্মূল্যায়ন (Internal Examination)

বাইরের সংস্থা দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষার বিপরীত অর্থাৎ বিদ্যালয়ের এক্তিয়ারে পরিচালিত পরীক্ষাগুলি হল অভ্যন্তরীন পরীক্ষা এবং মূল্যায়নকে অভ্যন্তরীন বা অন্তর্মূল্যায়ন বলা হয়। অনেক সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষা-শিখন পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত নয় এমন বাইরের ব্যক্তি বা শিক্ষক দ্বারা পরীক্ষা পরিচালিত হয়। এই ধরনের পরীক্ষাকে অভ্যন্তরীন পরীক্ষা বলা যায় না কারণ পরীক্ষক বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সঙ্গে পরিচিত বা যুক্ত নয়। পরীক্ষক কোর্সের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য গঠন করেননি। তিনি শিক্ষাদানমূলক কার্যসূচীর রূপরেখা এবং তার প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত নন। সেই কারণে তিনি শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন না। অতএব একটি পরীক্ষাকে অভ্যন্তরীন পরীক্ষা বলতে নিম্নের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়—

(ক) শিক্ষাদানমূলক কাজে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সংযোগ।

(খ) শিক্ষক নিজেই প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন।

(গ) শিক্ষকের দ্বারাই পরীক্ষা পরিচালনা এবং উত্তরপত্রের মূল্যায়ন।

২.৬ কগনিটিভ ও নন্-কগনিটিভ ফলাফলের মূল্যায়ন (Evaluation of Cognitive and Non-Cognitive Behaviours)

মানুষের আচরণকে প্রধানত দুটি মুখ্য বিভাগে ভাগ করা হয়—(ক) কগনিটিভ আচরণ, (খ) নন-কগনিটিভ আচরণ।

শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক (কগনিটিভ) আচরন বলতে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, কোন জিনিস সম্পর্কে তার বোধ, অভিনব পরিস্থিতিতে নূতন জ্ঞানের ব্যবহারের সক্ষমতা, নূতন জ্ঞানের বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন-এর সক্ষমতাকে বোঝায়।

নন্-কগনিটিভ আচরণ বলতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবনতা, মতামত, প্রতিক্রিয়া এবং পছন্দ ও অপছন্দসমূহকে বোঝায়। এই সমস্ত শিক্ষার্থীর সামাজিক প্রাক্ষোভিক জীবনের সঙ্গে জড়িত।

শিক্ষার্থীর আচরনের উপর নির্ভর করে মূল্যায়নকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—

শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের জন্য বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষামূলক কর্মসূচীতে কগনিটিভ এবং নন্-কগনিটিভ আচরনের মূল্যায়ন খুবই জরুরী। বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে নন-কগনিটিভ মূল্যায়নের চেয়ে কগনিটিভ ফলাফলের মূল্যায়নের উপর অধিক জোর দেওয়া হয় কিন্তু একজন ভালো শিক্ষকের শিক্ষার্থীর কগনিটিভ এবং নন্-কগনিটিভ বিকাশের উপর জোর দেওয়া উচিত।

২.৬.১ কগনিটিভ ও নন্-কগনিটিভ আচরনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Objectives of Evaluating Cognitive and Non-Cognitive Behaviours)

কগনিটিভ ও নন্-কগনিটিভ আচরনের মূল্যায়নে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই কিছু উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

এটি শিক্ষককে নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্য করে—

- শিক্ষা-শিখন পদ্ধতির কার্যকারিতা বিচার করতে।
- শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করতে এবং তার প্রতিবিধান গ্রহণ করতে।
- শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে :
- শিক্ষকের নিজের শিক্ষা-শিখন কাজের সংশোধন এবং উন্নয়ন করতে :
- শিক্ষার্থীদের প্লেসমেন্ট এবং সনাক্তকরনমূলক পরিষেবা প্রদান করতে।
- শিক্ষার্থীদের পরামর্শ ও সাহায্যদান করতে :

এটি শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্য করে--

- শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত, কর্মগত, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য স্থির করতে

- নিজস্ব আগ্রহ ক্ষেত্র সম্বন্ধে সচেতন হতে
- কোন বিষয়, ব্যক্তি বা নিজের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি জানতে
- বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ক উন্নতি জানতে
- একজনের অভ্যাস, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য জানতে এবং
- নিজস্বতা সম্পর্কে একটি সর্বাঙ্গীন চিত্র পেতে।

২.৬.২ কগনিটিভ এবং নন্-কগনিটিভ আচরনের ক্ষেত্রসমূহ (Areas of Cognitive and Non Cognitive Behaviours)

যদিও এই দুই ধরনের আচরন একে অপরের সঙ্গে জড়িত তবুও আমরা এই আচরনসমূহ দুটি আলাদা ক্ষেত্রে বিভক্ত করতে পারি—

কগনিটিভ আচরনের ক্ষেত্রে—

ব্লুম Bloom (1956) কগনিটিভ আচরনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করেছেন—

ক্ষেত্র	আচরনের প্রবেশ
১। জ্ঞান	— সাধারন পরিভাষা জানে
	-- নির্দিষ্ট ঘটনা জানে
	— পদ্ধতি ও কার্যক্রম জানে
	— মৌলিক ধারণা এবং তত্ত্বসমূহ জানে।
২। বোধশক্তি	— ঘটনা তত্ত্ব এবং ধারনাসমূহ বোঝে।
	--- মৌখিক বিষয়বস্তু, তালিকা, লেখচিত্র সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারে।
৩। প্রয়োগ ব্যবহার	— প্রদত্ত নূতন পরিস্থিতিতে বা আগের ঘটনা বহুল তথ্যে, ধারনা, তত্ত্বে, পদ্ধতিসমূহে তত্ত্বসমূহ প্রয়োগ করতে পারা।
৪। বিশ্লেষণ	-- ঘটনা এবং অনুমান সমূহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারা।
	-- তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করতে পারা।
	--- যুক্তিসংগত ভ্রান্তিসমূহ বুঝতে পারা।
	— অন্তর্নিহিত ধারনাসমূহ চিহ্নিত করতে পারা।
৫ সারসংক্ষেপ	-- তথ্য ধারনা। তত্ত্ব-পদ্ধতি সমূহ প্রভৃতির যুক্তকরণ ও সংগঠিতকরন—যাতে নূতন/ভিন্ন ধরণ গঠন করা যায়।
৬। মূল্যায়ন	--- বাইরের নির্দিষ্টমান ব্যবহার করে লিখিত বিষয়বস্তুর সংগতি এবং যথার্থতা, কাজের মূল্য (কলা, মিউজিক, কবিতা) বিচার করতে পারা।

নন্-কগনিটিভ আচরণসমূহের ক্ষেত্রসমূহ—

সাধারণত এই ধরনের আচরনের পরিমাপ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে করা হয়—

(ক) অভ্যাস।

(খ) আগ্রহ।

(গ) সামাজিক গুণমান।

(ঘ) ব্যক্তিগত গুনমান।

(ঙ) অভিযোজন।

(চ) দৃষ্টিভঙ্গি।

(ছ) সামাজিক মর্যাদা।

(জ) প্রশংসা।

(ঝ) মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি।

(ঞ) মূল্যবোধ।

(ট) প্রতিক্রিয়া।

২.৬.৩ কগ্‌নিটিভ ও নন্‌ কগনিটিভ আচরনের পরিমাপ ও মূল্যায়নের কলাকৌশল ও হাতিয়ার (Tools and Techniques for Assessing Cognitive and Non-Cognitive Behaviours)

শিক্ষার্থীদের কগনিটিভ ও নন্‌-কগনিটিভ আচরণের পরিমাপ এবং মূল্যায়ন করার জন্য নানা হাতিয়ার ও কলাকৌশল ব্যবহার করা হয়। কগনিটিভ আচরনের পরিমাপের মুখ্য হাতিয়ার বা টুলসগুলি হল—

* পরীক্ষাসমূহ—একক, সাপ্তাহিক, মাসিক, অর্দ্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক।
* প্রশ্নপ্রতিযোগিতা— মৌখিক বা লিখিত।
* ব্যবহারিক পরীক্ষাসমূহ।

নন্‌-কগনিটিভ ক্ষমতার পরিমাপের জন্য হাতিয়ার ও কলাকৌশলগুলি হল—

* আগ্রহ নির্ণয়
* দৃষ্টিভঙ্গি স্কেল
* পূর্ববর্তী রেকর্ড
* রেটিং স্কেল
* যাচাই তালিকা
* সোসিওমেট্রিক টেস্ট
* গেস্‌ হু পদ্ধতি
* ব্যক্তিত্ব নির্ণয়
* আত্মজীবনী

* ব্যক্তিত্ব ডায়েরী
* আঁকা ও পেন্টিং
* প্রশ্নকরন
* হাজিরা খাতা
* শিক্ষার্থীর ইতিহাস
* প্রক্ষেপন কলাকৌশল যেমন--
* ইঙ্কব্লট কলাকৌশল।
* খেলার কলাকৌশল।
* ছবির উপস্থাপনের কলাকৌশল।
* বাক্য পূর্ণ করা কলাকৌশল।

২.৭ মূল্যায়নের উদ্ভূত ধারা / প্রবনতাঃ মার্কিং বনাম গ্রেডিং (Emerging Trends in Evaluation : Marking Vs. Grading)

২.৭.১ মার্কিং প্রথা (Marking System) / পদ্ধতি

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়ার পর তাদের সাফল্যের মূল্যায়ন করা হয়। সাধারনত তাদের সাফল্য গানিতিক মান দিয়ে নির্ধারণ করা হয়। মনে করা যাক অঙ্কের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত নম্বর পেয়েছে--

* রাম অঙ্ক পরীক্ষায় ৯৫ পেয়েছে।
* শীতল অঙ্ক পরীক্ষায় ৬০ পেয়েছে।
* আহমেদ অঙ্ক পরীক্ষায় ৭৫ পেয়েছে।
* হরি অঙ্ক পরীক্ষায় ৩০ পেয়েছে।
* রাম অঙ্ক পরীক্ষায় ৯৫ পেয়েছে।

৯৫, ৬০, ৭৫, ৩০ এই সবগুলি হল চারজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত গানিতিক মান। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সাফল্য মূল্যায়ন করাকে মার্কিং পদ্ধতি বলে।

এই ধরনের মার্কিং পদ্ধতি বিদ্যালয় পরীক্ষায় খুবই প্রচলিত এবং সর্বজনবিদিত। নিয়োগকর্তা অভিভাবক এবং জনগন এর সম্বন্ধে খুবই পরিচিত। এটি শূন্য থেকে একশ অথবা ১০১ পয়েন্ট স্কেলে গঠিত। এটি একটি পারস্পারিক বা একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব যুক্ত স্কেল। এই স্কেল থেকে আমরা শিক্ষার্থীর পারস্পারিক সাফল্য জানতে পারি। এর ব্যপক জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কিছু পরিমাপ/মূল্যায়নগত ত্রুটি আছে।

২.৭.২ মার্কিং ব্যবস্থার অসুবিধাসমূহ (Drawbacks of Marking Systems)

মার্কিং ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি বোঝার জন্য নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল--

উদাহরণ-১ (ক) ছাত্র 'A' বিজ্ঞানে ৬০ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে স্থান পেয়েছে।

(খ) ছাত্র 'B' বিজ্ঞানে ৫৯ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পেয়েছে।

উদাহরণ-২ (ক) ইংরেজীর শিক্ষক 'X' শিক্ষার্থীকে অর্দ্ধ-বাৎসরিক পরীক্ষায় ৫০ নম্বর দিয়েছেন।

(খ) একই শিক্ষক 'X' এর একই উত্তর পত্র ১৫ দিন পর পুনরায় মূল্যায়ন করে ৪৫ নম্বর দিয়েছেন।

উদাহরণ-৩ (ক) মাসিক পরীক্ষায় ইতিহাসের শিক্ষক 'Y' শিক্ষার্থীকে ৩০ নম্বর দিয়েছেন।

(খ) অন্য একজন ইতিহাসের শিক্ষক 'Y' এর একই উত্তর পত্র মূল্যায়ন করে ২৫ নম্বর দিয়েছেন।

উপরের তিনটি উদাহরণ থেকে স্পষ্ট যে শিক্ষার্থীদের নম্বর ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন হয়েছে। এক নং উদাহরনে ছাত্র-B এর থেকে ছাত্র A কেবলমাত্র এক নম্বর বেশি পেয়েছে এবং অধিকতর ভালো। দুই নং উদাহরনে একই শিক্ষকের ভিন্ন সময়ে মূল্যায়ন ভিন্ন। তিন নং উদাহরনে একই উত্তর পত্রের দুই জন ভিন্ন শিক্ষকের প্রদত্ত নম্বর ভিন্ন। এর কারণ পরীক্ষকগন ভিন্ন মানের নিরিখে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সক্ষমতাগুলি—জ্ঞান, বোঝার ক্ষমতা, প্রয়োগ ক্ষমতা, বহিঃপ্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি একই উত্তর পত্র থেকে নির্ধারণ করেন। গবেষণা করে মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়িত নম্বর পাঁচ শতাংশ বেশি হতে পারে। যদি কোনো শিক্ষার্থী ৫৫ নম্বর পেয়ে থাকে তবে শতকরা ৫০ জন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর বেড়ে ৬০ বা কমে ৫০ হতে পারে।

২.৭.৩ গ্রেডিং ব্যবস্থা (Grading System)

মার্কিং ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যায় শ্রেণী বিভাজন যোগ্য একক (classificatory units) থাকার ফলে শিক্ষার্থীর সাফল্য শ্রেণীবদ্ধ করা খুবই জটিল। এই সমস্যা দূর করার জন্য শিক্ষার্থীদের সাফল্য শ্রেণীবদ্ধ করার সময় ১০১ পয়েন্ট স্কেলের পরিবর্তে কম সংখ্যার ৫ অথবা ৭ সংখ্যার শ্রেণী বিভাজন যোগ্য একক ব্যবহার করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের সাফল্য স্তর ৫ অথবা ৭ পয়েন্ট স্কেলে ৫ অথবা ৭টি দলে ভাগ করা হয়। ৫ পয়েন্ট স্কেলে শিক্ষার্থীদের সাফল্য স্তরগুলি খুব ভালো, ভালো, সাধারণ বা গড়, সাধারনের নীচে এবং খারাপ, এই পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। এই পাঁচটি স্তরকে গ্রেড-এ, গ্রেড-বি, গ্রেড-সি, গ্রেড-ডি, গ্রেড-ই দ্বারা সূচিত করা যায়।

যখন শিক্ষার্থীদের সাফল্য স্তর অক্ষর দ্বারা সূচিত করে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় তখন সেই মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে গ্রেডিং বলা হয়। কতিপয় শ্রেণীবদ্ধকরণ একক ব্যবহার করে মার্কিং ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি অপসারণ করা যেতে পারে।

গ্রেডিং ব্যবস্থা অধিকতরভাবে বিজ্ঞানসম্মত কারণ এর সাহায্যে খুব অল্প পার্থক্য সম্পন্ন মূল্যায়ন সমস্যার সমাধান করা যায়। মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীকে ১০১ পয়েন্ট স্কেলে মূল্যায়ন না করে শিক্ষার্থীর সাফল্য স্তর চিহ্নিত করেন। এইসব কারণে মার্কিং-এর থেকে গ্রেডিং অধিকতর ভালো এবং উন্নত।

২.৭.৪ গ্রেডিং-এর কলাকৌশল (Mechanics of Grading)

কিভাবে গ্রেডিং করা হয় তা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। মনে

ধর একটি পরীক্ষায় ছাত্র 'X' চারটি প্রশ্নের সবগুলিরই উত্তর লিখেছে। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করে পাঁচ পয়েন্ট স্কেলে একটি করে গ্রেড দেওয়া হয়। এইসব গ্রেডের প্রত্যেকটির গ্রেড পয়েন্ট থাকে। যেমন—এ-৫, বি-৪, সি-৩, ডি-২, ই-১ নিম্নের টেবিলে ছাত্র 'X' -এর গ্রেড এবং গ্রেড পয়েন্ট দেওয়া হল–

টেবিল ২.১ সার্বিক গ্রেড নির্ণয়

প্রশ্ন নং	১	২	৩	৪	যোগফল
গ্রেডসমূহ	'এ'	'এ'	'বি'	'সি'	
গ্রেড পয়েন্ট	৫	৫	৪	৩	১৭

গ্রেড পয়েন্টের গড় = ১৭/৪ = ৪.২৫

সামগ্রিক/সার্বিক গ্রেড হল—'বি'

গ্রেড পয়েন্টগুলি যোগ করে উত্তর দেওয়া প্রশ্ন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে গ্রেড পয়েন্ট গড় নির্ণয় করা হয় এবং তার ভিত্তিতে সামগ্রিক গ্রেড নির্ধারণ করা হয়।

নিম্নের টেবিলে কিভাবে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক গ্রেড নির্ণয় করা হয় তা দেখানো হল—

টেবিল—২.২ : সামগ্রিক গ্রেড স্থির করার জন্য ব্যবহৃত গ্রেড পয়েন্টের বিস্তৃতি নিম্নে দেওয়া হল—

গ্রেড পয়েন্টের বিস্তৃতি	সামগ্রিক গ্রেড
৪.৫০—৫.০০	'এ'
৩.৫০—৪.৪৯	'বি'
২.৫০—৩.৪৯	'সি'
১.৫০—২.৪৯	'ডি'
০.০০—১.৪৯	'ই'

উপরিউক্ত গ্রেডিং কলাকৌশল প্রত্যক্ষ গ্রেডিং ব্যবস্থার অর্ন্তগত। কিন্তু শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর রূপান্তর টেবিলের সাহায্যে গ্রেডে পরিবর্তন করা যায়। রূপান্তর টেবিল সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নম্বরের মাঝে অবস্থিত নম্বর সমূহ নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত করে প্রস্তুত করা যেতে পারে— যেমন যদি পাস নম্বর ৩০ হয় এবং বিগত তিন বছরে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৯০ হয় তবে স্কোরের বিন্যাস / পরিবেশন পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে—

৮০ এবং অধিক	'ও' এখানে 'ও' হল অসাধারন
৭০—৭৯	'এ'
৬০—৬৯	'বি'
৫০—৫৯	'সি'
৪০—৪৯	'ডি'
৩০—৩৯	'ই'
২৯ এবং তার নীচে	'এফ' এফ.হল অকৃতকার্য্য

২.৮ এককের সারাংশ (Unit Summary)

* উদ্দেশ্য সাধনের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নকে নানা ভাগে ভাগ করা হয়।

* যখন মূল্যায়ন অল্প সময়ের ব্যবধানে এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন যাচাই করার জন্য করা হয় তখন তাকে গঠনগত মূল্যায়ন বলে।

* সমষ্টিগত মূল্যায়ন শিক্ষাদানের শেষে এবং প্রধানত শিক্ষার্থী সাফল্য শংসায়িত করার জন্য করা হয়ে থাকে।

* পরীক্ষার ফলের ব্যাখ্যাদানের উপর নির্ভর করে মূল্যায়নকে নিয়ম বা আদর্শভিত্তিক এবং মান বা বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক মূল্যায়নে ভাগ করা হয়।

* যখন পরীক্ষার স্কোর নির্দিষ্ট নিয়ম বা আদর্শের নিরিখে ভিত্তিতে ব্যাখ্যাত হয় তখন সেই মূল্যায়নকে নিয়ম/আদর্শভিত্তিক মূল্যায়ন বলে।

* যখন পরীক্ষার সাফল্য কোন নির্দিষ্ট মান বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বর্ণনা করা হয় এবং ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তখন সেই মূল্যায়নকে মান বা বৈশিষ্ট্যভিত্তিক মূল্যায়ন বলে।

* সংস্থা বা ব্যক্তির দ্বারা পরীক্ষা পরিচালনার উপর নির্ভর করে মূল্যায়নকে বহিঃ ও আভ্যন্তরীন মূল্যায়নে ভাগ করা হয়।

* শিক্ষার্থীর আচরনের পরিমাপ এবং মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নকে কগনিটিভ এবং নন-কগনিটিভ মূল্যায়নে ভাগ করা হয়।

* মার্কিং ব্যবস্থা ১০১ পয়েন্ট স্কেলে তৈরি যা পরিমাপ মূলক নানা ত্রুটি যুক্ত।

যখন অক্ষর স্তর ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর সাফল্য স্তর কতিপয় শ্রেণী বিভাজনযোগ্য এককে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় তখন সেই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে গ্রেডিং বলে। গ্রেডিং-এর মাধ্যমে মার্কিং পদ্ধতিতে পরিমাপের ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

২.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। মূল্যায়নের শ্রেণী বিভাগের মুখ্য ভিত্তিগুলি কি কি?

২। পার্থক্য লিখুন—

(ক) গঠনমূলক এবং সমষ্টিমূলক মূল্যায়ন

(খ) আদর্শভিত্তিক ও মানভিত্তিক মূল্যায়ন

(গ) বহির্মূল্যায়ন ও আভ্যন্তরীন মূল্যায়ন

(ঘ) কগনিটিভ ও নন-কগনিটিভ আচরনের মূল্যায়ন

৩। মার্কিং-এর থেকে গ্রেডিং উন্নত—যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

৪। নিম্নের কোনটি মান / বৈশিষ্ট্যভিত্তিক মূল্যায়নের উদাহরণ—

(ক) রাম ভূগোলে ৫০ নম্বর পেয়েছে।

(খ) অভিষেক শ্রেণীতে তৃতীয় হয়েছে।

(গ) সংগীত একটি পরীক্ষা ৬০ মিনিটে ১০০টির মধ্যে ৮০টি সঠিক করেছে।

(ঘ) টমাস শ্রেণীর একজন সাধারণ শিক্ষার্থী।

২.১০ বাড়ীর কাজ (Assignment)

আপনার বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত মূল্যায়নমূলক কার্যসমূহের তালিকা তৈরি করুন এবং তাদের নিম্নের শ্রেণীভূক্ত করুন—

(ক) গঠনগত ও সমষ্টিগত মূল্যায়ন।

(খ) নিয়ম বা আদর্শ এবং মান / বৈশিষ্ট্যভিত্তিক মূল্যায়ন।

২.১১ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion)

২.১২ উৎস (Reference)

1. Bloom, B. S., et. al (1956) *Taxonomy of Educational Objectives : Handbook I Cognitive Domain.* New York : Davind McKay Co.
2. Gronlound, N. E. (1981) *Measurement and Evaluation in Teaching* (4th ed.) New York MacMillan.
3. Gronlound, N. E. (1973) *Preparing Criterion - referenced Tests for Classroom Instruction.* New York : MacMillan.
4. Hopkins, Kenneth D. and Stanley. Jubian (1981) *Educational and Psychological Measurement and Evaluation* (6th ed.) Prentice-Hall : New Jersey.

একক ৩ ❑ বিশেষ শ্রেণীর শিশুদের জন্য অভীক্ষা ও পরীক্ষা (Tests and Examination for Special Group Children)

গঠন

৩.১ ভূমিকা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষা

৩.৩.১ সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষার উদ্দেশ্য

৩.৩.২ নির্দিষ্ট মানযুক্ত সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষা ও অপ্রচলিত শ্রেণীকক্ষের পরীক্ষা

৩.৩.৩ শিক্ষাগত সাফল্যের পরীক্ষাসমূহ

৩.৪ পদ্ধতি বনাম উৎপাদক মূল্যায়ন

৩.৪.১ পদ্ধতির মূল্যায়ন

৩.৪.২ উৎপাদকের মূল্যায়ন

৩.৫ মনোভাবের পরিমাপ

৩.৬ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষাসমূহ

৩.৭ অন্যভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য পরীক্ষাসমূহ

৩.৭.১ বুদ্ধ্যাংক ও প্রবনতার পরীক্ষাসমূহ

৩.৭.২ ভাষা বিকাশের পরীক্ষা

৩.৭.৩ পঠন দক্ষতার পরীক্ষা

৩.৭.৪ অঙ্কের মূল্যায়ন

৩.৭.৫ বিশেষ শিশুদের আগ্রহের পরীক্ষা

৩.৮ এককের সারাংশ

৩.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন

৩.১০ বাড়ীর কাজ

৩.১১ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

৩.১২ উৎস

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

প্রথম ইউনিটে টেস্ট এবং পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ইউনিটে আমরা বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য তৈরি কিছু টেস্ট এবং প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয় তা নিয়ে আলোচনা করব। পরীক্ষাগুলি সাধারণত প্রকৃতিগতভাবে মানসম্পন্ন এবং জাতি অথবা বিশ্বে এটি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। আমরা একক ৪-এ শিক্ষক তৈরি পরীক্ষা এবং নির্দিষ্ট মানযুক্ত পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য করব। এই এককে আমাদের মুখ্য বিষয় হল প্রতিবন্ধী শিশুদের অ্যাচিভমেন্ট অভীক্ষাসমূহ আচরনের অভীক্ষা এবং অন্যান্য বিশেষ অভীক্ষাসমূহ অভীক্ষা ছাড়াও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং কেমনভাবে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষা পত্র প্রস্তুত হবে তাও আলোচনা করব।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা—

- অ্যাচিভমেন্ট টেস্টের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিয়ম/আদর্শভিত্তিক এবং ইনফর্মাল শ্রেণীকক্ষ অ্যাচিভমেন্ট টেস্টের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- পদ্ধতি ও উৎপাদন মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- দৃষ্টিভঙ্গি স্কেল গঠন করতে পারবেন।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রশ্নপত্র / টেস্ট প্রস্তুত করতে পারবেন।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য গঠিত কিছু টেস্ট নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

৩.৩ অ্যাচিভমেন্ট অভীক্ষাসমূহ (Achievement Tests)

বিশ্বের সর্বত্র প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে অ্যাচিভমেন্ট অভীক্ষা খুব জনপ্রিয়। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কোম্পানী এবং প্রকাশকরা লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর পরিচালনার জন্য অ্যাচিভমেন্ট অভীক্ষাকেই উন্নত মনে করেন। প্রকাশকরা প্রকৃতিগতভাবে অ্যাচিভমেন্ট অভীক্ষাকে উন্নত এবং ব্যবহারকারীদের কাছে সহজ বলে মনে করেন। বিস্তৃত জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এবং কখনো কখনো সমগ্র বিশ্বের শিক্ষার্থীদের জন্য এই অভীক্ষা উপযুক্ত গুণমানসম্পন্ন/এই ধরনের অভীক্ষাগুলি প্রধানত আদর্শভিত্তিক এবং দলে শিক্ষার্থীর সাফল্য স্তর অন্য শিক্ষার্থীর সাফল্য স্তরের সঙ্গে তুলনা করে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর সাফল্য লাভের স্তর বা মাত্রা নির্ণয় করা এই অভীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। এগুলি মানভিত্তিক অ্যাচিভমেন্ট অভীক্ষাও যা সচরাচর সর্বত্র দেখা যায়। এই ধরনের অভীক্ষাগুলি শিক্ষাদানমূলক উদ্দেশ্যগুলির কতখানি শিক্ষার্থীরা অর্জনে সমর্থ হয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে একটি বিশেষ দক্ষতার উপর শিক্ষার্থীর দখল পরিমাপ করে।

৩.৩.১ অ্যাচিভমেন্ট অভীক্ষার উদ্দেশ্য (Purposes of Achievement Test)

(ক) তুলনা করা (Comparisons) ঃ যে কোনো অ্যাচিভমেন্ট টেস্টের উদ্দেশ্য হল দলের মধ্যে একটি শিক্ষার্থীর সাফল্য স্তরের অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তুলনা করা। অভিভাবক এবং শিক্ষক সমবয়সী বা একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কৃতকার্যতা জানতে চান। এই ধরনের তথ্য অভিভাবককে তার শিশুর আপেক্ষিক শিক্ষন স্তর/মাত্রা জানতে সাহায্য করে।

(খ) দখল নির্ণয়ে (Assessment of Mastery) ঃ কিছু অ্যাচিভমেন্ট টেস্টের উদ্দেশ্য হল পূর্ব নির্ধারিত মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সর্বোচ্চ সাফল্যের স্তর বা দখল লাভের পর্যায় পরিমাপ করা। এই ধরনের টেস্টের সাহায্যে শিক্ষক শিখন সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে পারেন এবং সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(গ) বাছাই কৌশল (Screening Devices) ঃ শিক্ষার্থীদের বাছাই করার জন্য অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট নেওয়া হয়ে থাকে। এটি শিক্ষককে শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যা চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। একবার সমস্যা চিহ্নিত হয়ে গেলে সু-গভীর সনাক্তকরণ মূলক মূল্যায়ন করে সমস্যার সঠিক প্রকৃতি জানা যায়।

(ঘ) পাঠ্যক্রমের সাফল্য পরিমাপন (Measuring Curriculum Success) ঃ নূতন পাঠ্যক্রমের কার্যকারিতা পরিমাপ করতে অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে নূতন পাঠ্যক্রমে একদল শিক্ষার্থীদের এবং পুরানো পাঠ্যক্রমে আর একদল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষাদানের শেষে শিক্ষার্থীদের সাফল্য নির্দিষ্ট মান সম্পন্ন টেস্টের সাহায্যে নির্ণয় করে। কোন দলের সাফল্য অধিক তা দেখা যায়।

(ঙ) প্রোগ্রাম-ফান্ডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অ্যাচিভমেন্ট টেস্টের ফলাফলের উপর নির্ভর করেন। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাফল্য ভালো এবং বেশি সেই বিদ্যালয়কে অধিক আর্থিক সহায়তা দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

৩.৩.২ নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন অ্যাচিভমেন্ট অভীক্ষা এবং ইনফর্মাল ক্লাসরুম অভীক্ষা (Standardized Achievement Tests and Informal Classroom Tests)

অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট নির্দিষ্টমান যুক্ত (Standardized) এবং ইনফর্মাল ক্লাসরুম টেস্ট উভয়ই হতে পারে। Standardized টেস্টগুলি জাতীয় স্তরে বা বিশ্ব স্তরে একই স্তরের শিক্ষার্থীদের থেকে নমুনা (Sample) নিয়ে গঠন করা হয়। কিন্তু ইনফর্মাল ক্লাসরুম টেস্ট নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণত শিক্ষক দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে, এই জন্য একে টিচার মেড টেস্টও বলা হয়। যদিও এই দুই ধরনের টেস্টের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য বর্তমান তবুও কিছু বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়।

১৯৮১ সালে গ্রোনলান্ড এই দুই ধরনের টেস্টের মধ্যে তুলনা করেছেন।

টেবিল ৩.১ ঃ নির্দিষ্টমান যুক্ত টেস্ট এবং ইনফর্মাল ক্লাসরুম টেস্টের মধ্যে তুলনা।

পরিমাপ	নির্দিষ্টমান যুক্ত অ্যাচিভমেন্ট অভীক্ষা	ইন্-ফর্মাল অ্যাচিভমেন্ট অভীক্ষা
শিখন উৎপাদ সমূহ এবং বিষয়বস্তুর পরিমাপ	বেশির ভাগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বর্তমান উৎপাদ এবং বিষয় পরিমাপ করে, এবং স্থানীয় শিক্ষার্থীদের গ্রহণযোগ্য মৌলিক দক্ষতা এবং জটিল উৎপাদনগুলি পরীক্ষা করে। বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা কদাচিৎ স্থানীয় পাঠ্যক্রমকে আলোকিত করে।	স্থানীয় পাঠ্যক্রমের উৎপাদ এবং বিষয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এতে নূতন বিষয় বস্তুর পরিমাপনে এবং পদ্ধতির পরিবর্তনে নমনীয়তা আছে। জটিল শিখন-উৎপাদ পরিহার করার প্রবণতা লক্ষণীয়।
টেস্ট বিষয়ের গুণমান	বিষয়ের সাধারন গুণমান খুব বেশি। বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত, প্রাক্-পরিক্ষিত এবং কার্যকারিতার ভিত্তিতে নির্বাচিত।	টেস্ট আইটেম ফাইল ব্যবহার ছাড়া আইটেমের গুণমান বোঝা যায় না। সীমাবদ্ধ সময় এবং শিক্ষকের সীমিত দক্ষতার কারণে গুণমান নির্দিষ্টমান যুক্ত টেস্টের তুলনায় খুবই কম।
বিশ্বাসযোগ্যতা	উচ্চ পর্যায়ের। সাধারনত ৮০ থেকে ৯৫ মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ৯০ উপরে।	সাধারণ অজ্ঞাত, যদি সতর্কভাবে গঠন করা হয় তবে উচ্চমানের হতে পারে।
পরিচালন এবং স্কোরিং	পরিচালন পদ্ধতি নির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া থাকে।	একক পদ্ধতিতে পরিচালনা সম্ভব। কিন্তু সাধারনত নমনীয়।
টেস্ট স্কোরের ব্যাখ্যা	আদর্শ দলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ব্যাখ্যা প্রদান ও ব্যবহারে টেস্ট ম্যানুয়াল এবং অন্যান্য গাইড লাইন সাহায্য করে।	স্কোরের তুলনা এবং ব্যাখ্যা প্রদান স্থানীয় বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধ।

৩.৩.৩ অ্যাকাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট অভীক্ষা (Tests of Academic Achievement)

নির্দিষ্টমান যুক্ত অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট দলগত ভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে করা যেতে পারে। এইগুলি সার্ভে টেস্ট ব্যাটারী আকারে ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ব্যাটারীগুলি শিক্ষার্থীর একাধিক মূল শিক্ষাগত ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সাফল্য পরিমাপ করে। যেমন–পঠন।

(ক) গ্রুপ অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট— এটি সাধারনত নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপর পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এই ধরনের পরীক্ষা পুরোপুরিভাবে বিশেষ শিক্ষা কর্ম পরিকল্পনাতে সঠিক নাও হতে পারে। এই টেস্টগুলি মূলত সমবয়সীর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত সাফল্য পরিমাপ করে। গ্রুপ অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট পঠন, অঙ্ক, ভাষা, কলা, সামাজিক অধ্যয়ন এবং বিজ্ঞান ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর দক্ষতা পরিমাপ করে। কতিপয় গ্রুপ অ্যাচিভমেন্ট ব্যাটারী নিম্নের টেবিলে দেওয়া হল।

টেবিল ৩.২

Test	Grade	Number of Levels	Academic Areas Assessed
California Achievement Test	K-12	10	R, M, LA, SP, Ref.
Comprehensive Tests of Basic	K-12	10	R, M, LA, SP, Ref, SCI, SS
Lowa Tests of Basic Skills	K-9	10	R, M, LA, SP, Ref. SCI, SS
Metropolitan Achievement Tests	K-12	8	R, M, LA, SP, Ref. SCI, SS
SRA Achievement Series	K-12	8	R, M, LA, SP, Ref. SCI, SS
Standard Achievement Test	K-College	10	R, M, LA, SP, Ref. SCI, SS

K—কিন্ডারগার্টেন
R—রিডিং
M—অংক
LA—ভাষা, আর্টস
SP— স্পেলিং
Ref—রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল
SCI—বিজ্ঞান
SS— সোসাল স্টাডিস্

উৎস : R.L. Luftig (1989)

(খ) (Individual Achievement Tests)

এই ধরনের টেস্টগুলি বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের টেস্টে টেস্ট আইটেমগুলি ব্যবহার করার জন্য ন্যূনতম নির্দেশ থাকে। এই টেস্টগুলি গ্রুপ টেস্টের তুলনায় আরও বেশি বিশদে সনাক্তকরণ করতে পারে। এই টেস্টগুলি পঠন, অঙ্ক, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সাফল্য পরিমাপ করে। এছাড়া টেস্টগুলি মৌখিক পঠন এবং বোধশক্তি সক্ষমতা নির্ণয় করে। কিছু টেস্ট সমাজ বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর সাফল্য নির্ণয় করে

নিম্নে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রায়শই ব্যবহৃত কিছু সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষা সম্বন্ধে দেওয়া হল :

১। Peabody Individual Achievement Test (PIAT)

টেস্ট গঠনকারী	: Lloyd M. Dunn and Frederick C. Markwardt.
গ্রেড	: কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ
পরীক্ষা ক্ষেত্র	
যে সমস্ত শিক্ষাগত বিষয় / ক্ষেত্র	: পঠন স্বীকৃতি, পঠনবোধ শক্তি, অঙ্ক, বানান, সাধারণ তথ্য।
মূল্যায়ন করে বিশ্বাসযোগ্যতা	: পরীক্ষা পুনঃপরীক্ষা বিশ্বাসযোগ্যতা—৮২, থেকে ৯২,

বৈধতা : বিষয়বস্তু এবং সমসাময়িক বৈধতা যথেষ্ট।

২। Wide Range Achievement Test-Revised (WART-R)

টেস্ট গঠনকারী : Jartak and Wilkinson, 1984

গ্রেড : পর্যায় ১ = কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ পর্যায় ২=১২+

পরীক্ষা ক্ষেত্র : পঠন, পাটিগণিত, বানান

বিশ্বাসযোগ্যতা : পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা যথেষ্ট

বৈধতা : বিষয় বৈধতা যথেষ্ট

৩। Basic Achievement Skills Individual Screener (BASIS)

টেস্ট গঠনকারী : Psychological Corporation Measurement Staff, 1983

গ্রেড : ১-১২

পরীক্ষা ক্ষেত্র : পঠন, অঙ্ক, বানান দক্ষতা, লিখন দক্ষতা
৩-৮ গ্রেডের জন্য ঐচ্ছিক/বাধ্যতা মূলক নয়।

বিশ্বাসযোগ্যতা : পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা ২, ৫ এবং ৮ গ্রেডের জন্য
যথাক্রমে অঙ্কে—.৮১, .৮২, ও .৮৩ পঠনে—.৯১, .৮২,
.৯৬ বানানে - .৯৪, .৯০, .৯৪।

৪। Kaufman Test of Educational Achievement (K-TEA)

টেস্ট গঠনকারী : Kaufman and Kaufman, 1985

গ্রেড : ১-১২

পরীক্ষা ক্ষেত্র : সংক্ষিপ্ত গঠন—পঠন, পাটিগণিত, বানান

বিশ্বাসযোগ্যতা : দ্বিধা বিভক্ত বিশ্বাসযোগ্যতা = .৮৭ – .৯৫
পরীক্ষা-পুনঃপরীক্ষা বিশ্বাসযোগ্যতা = .৯০

বৈধতা : বিষয় এবং সহঘটিত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত।

৫। Diagnostic Achievement Battery (DAB)

টেস্ট গঠনকারী : Newcomer and Curtis, 1984

গ্রেড : ১-৮

নির্ণয় ক্ষেত্র : শ্রবণ, কথাবলা, পঠন, লিখন, বানান ফলিত অঙ্ক।

বিশ্বাসযোগ্যতা : ৭৫ এবং .৮৯-র মধ্যে

বৈধতা : বিষয় আলোচনা, সহঘটিত এবং গঠন বৈধতা।

৩.৪ পদ্ধতি বনাম উৎপাদ মূল্যায়ন (Process Vs. Production Evaluation)

শিক্ষার্থীর সাফল্য পদ্ধতি এবং উৎপাদ (ফলাফল) স্তরে পরিমাপ করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সর্বশেষ উৎপাদ থেকে শিক্ষার্থীর সাফল্য মূল্যায়ন করা যায় না। এক্ষেত্রে কার্য পদ্ধতি দেখতে হয় যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাফল্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

৩.৪.১ পদ্ধতি মূল্যায়ন (Process Evaluation)

বিদ্যালয়ে অনেক কাজ করা হয়ে থাকে যার কোনো বিশেষ উৎপাদ থাকে না। সেই সব কাজে শিক্ষার্থীর সাফল্য তার কাজের দক্ষতার ভিত্তিতে বিচার করা হয়। কাজ করার সময় যে ভাবে কাজ করে তার মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। উদাহরণ—স্বাধীনতা দিবসে শিক্ষার্থীর বক্তৃতা, বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সভায় গান করা, যন্ত্রসংগীতে বাজানো, NSS ক্যাম্পে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা, বাৎসরিক ক্রীড়ায় শারীরিক কসরত দেখানো, এই সব ক্ষেত্রে/পরিস্থিতিতে কার্যসম্পাদনের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যেখানে কোনো উৎপাদ নেই সেখানে কৃতকার্যের পদ্ধতি কিভাবে মূল্যায়িত হয়।

এক্ষেত্রে যেকোনো সম্পাদিত কাজের পদ্ধতি মূল্যায়ন করার জন্য রেটিং স্কেল ব্যবহার করা হয়। ৪নং এককে এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে। রেটিং স্কেলে পর্যবেক্ষণকারীর রিপোর্টিং এবং মান প্রদানের সুসংগঠিত পদ্ধতি আছে। রেটিং স্কেলে প্রদত্ত কাজের জন্য একগুচ্ছ বৈশিষ্ট্য থাকে যেখানে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা সূচিত। পদ্ধতির মূল্যায়নে রেটিং স্কেলে মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীদের একই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেন।

৩.৫ দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপ (Measurement of Attitude)

শিক্ষার্থীর শিখন (শিক্ষাগ্রহণ) শিখনবস্তু বা শিখনের সঙ্গে সংযুক্ত বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। উদাহরণ হিসাবে যদি শিক্ষার্থীর অঙ্কের প্রতি বিরূপ মনোভাব বা অনীহা থাকে তবে তার অঙ্ক শেখা ভালো হবে না। অনেক সময় শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের প্রতি, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ প্রভৃতির প্রতি বিরূপ মনোভাব থেকে থাকে। সেই সব ক্ষেত্রে বিষয় বা পরিস্থিতির প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণে শিক্ষার্থীর শিখন বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেই কারণে শিক্ষকের শিখন অভিজ্ঞতা পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীর মনোভাব/দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয় করার দরকার।

শিক্ষার্থীদের মনোভাব জানার সহজতম পথ হল তাদের বিদ্যালয়ে ভিন্ন পরিস্থিতিতে খুব কাছ থেকে দেখা এবং মূল্যায়ন করা। যাইহোক অধিকতর সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য শিক্ষক আত্ম-আনুলিখন মূলক কলাকৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তাদের মনোভাব/দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। শিক্ষক তাঁর নিজের তৈরি দৃষ্টিভঙ্গি/মনোভাব পরিমাপক কৌশল গঠন করতে পারেন। কিন্তু সব থেকে বেশি ব্যবহৃত এবং সহজ স্কেল হল 'লিকার্ট স্কেল'।

৩.৫.১ লিকার্ট স্কেল (Likert Scale)

এই স্কেল লিকার্ট মনোভাব নির্ধারণ করার জন্য গঠন করেছিলেন। এই ধরনের স্কেলে অনুকূল এবং বিরূপ (অসন্তোষজনক) মন্তব্য আছে। শিক্ষার্থীকে পাঁচ পয়েন্ট স্কেলে প্রতিটি মন্তব্যের উত্তর দিতে হবে।

পাঁচ পয়েন্ট স্কেলটি হল—

SA — Strongly Agree—খুবই সম্মত হওয়া/রাজি

A — Agree—সম্মত হওয়া/রাজি

U—Undecided—স্থির নয়

D—Disagree—অসম্মত/গররাজি

SD—Strongly Disagree—ভীষণভাবে অসম্মত

নিম্নলিখিত ভাবে মনোভাব স্কেল গঠন করা হয়—

(ক) কোন বিষয়ে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক মনোভাবাপন্ন একগুচ্ছ মন্তব্য লিখুন। উদাহরণ—অঙ্কে মনোভাব জানার জন্য স্কেল প্রস্তুত করার জন্য নিম্নের ন্যায় মন্তব্য লেখা যেতে পারে—

* অঙ্ক একটি আকর্ষণীয় বিষয় (ধনাত্মক মন্তব্য)

* অঙ্ক একটি বিরক্তিকর বিষয় (ঋণাত্মক মন্তব্য)

(খ) কমপক্ষে দশটি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক মতামত নির্বাচন করুন।

(গ) মন্তব্যগুলি একসাথে মিশিয়ে পরপর সাজান।

(ঘ) সহজ মার্কিং-এর জন্য প্রতিটি মন্তব্যের বামপাশে পাঁচ পয়েন্ট স্কেলের অক্ষরগুলি বসান।

৫। স্কেলের শুরুতে শিক্ষার্থীদের কিভাবে তাদের উত্তরে মার্কস দিতে হবে সেই বিষয়ে নির্দেশ দিন।

নীচে বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপ করে দেখানো হল—

নির্দেশাবলী : সঠিক অক্ষর বা অক্ষরসমূহ গোল চিহ্ন দিয়ে প্রতিটি মন্তব্যে নিজে কতটা সম্মত বা অসম্মত তা সূচিত করুন—

Key {
SA—
A
U
D
SD

SA	A	U	D	SD	১	—	বিজ্ঞানের ক্লাসগুলি আকর্ষণীয়
SA	A	U	D	SD	২	—	বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার একঘেয়ে ও বিরক্তিকর
SA	A	U	D	SD	৩	—	বিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে কাজ করা আনন্দের বিষয়
SA	A	U	D	SD	৪	—	শ্রেণীর কাজ ভালো
SA	A	U	D	SD	৫	—	পাঠ্যপুস্তক পড়া মানে সময়ের অপচয়
SA	A	U	D	SD	৬	—	পরীক্ষাগারে পরীক্ষা হল চিত্তাকর্ষক।
SA	A	U	D	SD	৭	—	বেশির ভাগ শ্রেণীর কাজ হল বিরক্তিকর।
SA	A	U	D	SD	৮	—	আমি পাঠ্যপুস্তক পড়তে ভালোবাসি।
SA	A	U	D	SD	৯	—	যে সমস্যাটি নিয়ে কাজ করছি সেটি গুরুত্বহীন
SA	A	U	D	SD	১০	—	আমি বিজ্ঞানের ব্যাপারে খুব উৎসাহী নই।

রেখচিত্র—৩.২ সায়েন্স কোর্সের প্রতি মনোভাব পরিমাপক

লিকার্ট টাইপ মনোভাব/দৃষ্টিভঙ্গি স্কেল

উৎস : N.E. Groonlund (1981)

লিকার্ট টাইপ স্কেলে স্কোর করার সময় স্কেলের ১-৫ থেকে ৫ পর্যন্ত প্রতিটি জায়গার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অনুকূল দফাতে (আইটেমে) যেমন ১নং মন্তব্যে SA থেকে SD পর্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ৫,৪,৩,২,১।

বিরূপ/প্রতিকূল মন্তব্যে যেমন ২নং দফাতে SA থেকে SD পর্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে—১, ২, ৩, ৪, ৫।

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক স্কোর প্রতিটি মন্তব্যের উপর স্কোর একসঙ্গে যোগ করে পাওয়া যায়। যদি স্কোর উচ্চ হয় তবে দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর অনুকূল/ভালো।

উপরের ফিগার—৩.২-এর সাহায্যে অঙ্কের শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অনুভূতির উপর নির্ভর করে কোর্সের সংশোধন। পরিমার্জন করতে পারেন।

৩.৬ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষাসমূহ (Examinations at Primary And Secondary Levels)

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেই কারনে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতি পৃথক ভাবে আলোচনা করার দরকার নেই।

যে কোনো শিক্ষা-শিখন পদ্ধতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পরীক্ষা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতার স্তর বা শিক্ষাগত সাফল্য স্তর জানা। অন্যভাবে বলতে গেলে শিক্ষক শিক্ষাদানের শেষে

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যাবলী কতখানি অর্জিত হয়েছে তা জানার জন্য পরীক্ষা পরিচালনা করেন। সাধারণত ইউনিটের বা কোর্সের শেষে পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। এটি মাসিক, অর্দ্ধ-বাৎসরিক, সেমিস্টার বা বাৎসরিক হতে পারে। যদি কোনো কর্মপরিকল্পনা দুই বছরের হয় তবে দুই বছর পরেও পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গঠন পদ্ধতির কতগুলি পর্যায়/ধাপ আছে।

১. প্রথম ধাপ — কোর্সের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ।

২. দ্বিতীয় ধাপ — শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যাবলী নির্দিষ্টকরন।

৩. তৃতীয় ধাপ — নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীর টেবিল প্রস্তুতকরণ (ব্লু-প্রিন্ট)

৪. চতুর্থ ধাপ — ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী টেস্ট আইটেম লিখন।

৫. পঞ্চম ধাপ — চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র তৈরিকরন।

৬. ষষ্ঠ ধাপ — প্রশ্নপত্রের সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণ।

৭. সপ্তম ধাপ — শিক্ষার্থীর উত্তরপত্রের মূল্যায়ন।

৮. অষ্টম ধাপ — প্রশ্নপত্রের মান নিরূপণ/মূল্যায়ন।

৯. নবম ধাপ — পরীক্ষার ফলাফলের ব্যবহার।

১. কোর্সের বিষয় উপাদানের বিশ্লেষণ :

নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য নানা ধরনের শিখন অভিজ্ঞতা রাশির পরিচালনা করা হয়ে থাকে, এদের কোর্সের বিষয়বস্তু বলে। এই সব শিখন-অভিজ্ঞতারাশি শিক্ষার্থীদের কাছে বিভাগ বা অধ্যায় এবং উপ-বিভাগ, উপ-অধ্যায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যে কোন প্রশ্নপত্রে সমস্ত বিষয়বস্তুর প্রতিফলিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ সমস্ত বিভাগ উপ-বিভাগগুলির প্রশ্নপত্রে স্থান পাওয়া উচিত। বিষয় উপাদান বিশ্লেষণ করার সময় মুখ্য ধারনারাশি, তত্ত্বাবলী, ঘটনারাশি প্রভৃতি বিবেচনা করা দরকার কারণ টেস্ট আইটেমগুলি/প্রশ্নগুলি ঐ সমস্ত উপাদান সূত্রাবলীর উপর নির্ভর করে তৈরি করতে হবে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের পরবর্তী কাজ হল প্রতিটি বিভাগ, উপবিভাগের গুরুত্ব নির্ণয় করা একটি বিভাগ থেকে অন্য একটি বিভাগের গুরুত্বের পার্থক্য/তফাৎ ঐ সমস্ত বিভাগের শিখন-অভিজ্ঞতা রাশির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ শিখন অভিজ্ঞতা রাশিতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।

২. শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যাবলী নির্দিষ্টকরণ :

শিক্ষার্থীদের নেওয়া সমস্ত ধরনের শিখন অভিজ্ঞতা রাশিকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায়

* Knowing — জানা।

* Feeling — অনুভব করা।

* Doing — কাজ করা।

প্রতিটি বিভাগ মনোবিদ্‌দের দ্বারা আবার কিছু ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়েছে। তাঁরা তিনটি বিভাগকে নূতন নাম দিয়েছেন—

* Knowing — Cognitive Domain — জ্ঞান ক্ষেত্র।
* Feeling — Affective Domain — আচরণ ক্ষেত্র।
* Doing — Psychomotor Domain — মানসিক ক্রিয়া সঞ্জাত।

প্রতিটি ক্ষেত্র প্রশ্নপত্রে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হওয়া উচিত। যাইহোক দেখা গেছে যে জ্ঞান ক্ষেত্র অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় অধিক প্রাধান্য পায়। ১৯৫৬ সালে ব্লুম জ্ঞান ক্ষেত্রকে (নিম্নস্তর থেকে উচ্চ স্তরে) নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করেছেন--

* জ্ঞান
* বোধশক্তি / বোঝা
* প্রয়োগ
* বিশ্লেষণ
* সংশ্লেষণ
* মূল্যায়ন

সাধারনত প্রশ্নপত্রে জ্ঞানক্ষেত্র ও দক্ষতা ক্ষেত্রের উপর অধিক জোর দেওয়া হয়ে থাকে।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষনের পর, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যাবলী তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত। প্রতিটি উদ্দেশ্যের - জ্ঞান, বোধশক্তি, দক্ষতা প্রভৃতির গুরুত্ব নির্ণয় করা দরকার।

৩. উদ্দেশ্যসমূহের টেবিল প্রস্তুতকরণ (Preparation of a Table of Specifications [Blue Print])

উদ্দেশ্যসমূহ স্থির করার পরবর্তী কাজ হল তাদের নকশা তৈরি করা। এটি হল দ্বিমুখী ছক যা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সমূহের সঙ্গে কোর্সের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক প্রকাশ করে এবং ইঞ্জিনীয়ার বাড়ি তৈরির নকশার ন্যায় আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনের পথ দেখায়। ৩.৩ টেবিলে উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি কোর্সের নকশা দেওয়া হল। এই টেবিল একটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির সময় প্রতিটি কোর্স ইউনিটের কোনটিতে কতখানি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত তা প্রকাশ করে। সাধারন শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যসমূহ টেবিলের উপরিভাগে মুখ্য বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রগুলি বামদিকে দেওয়া হল।

উদ্দেশ্যসমূহ বিষয় ক্ষেত্রসমূহ	জ্ঞান	বোধশক্তি	প্রয়োগ	দক্ষতা	মোট
ইউনিট-১	৮	৩	—	—	১১
ইউনিট-২	৮	২	৪	—	১৪
ইউনিট-৩	৬	৩	৪	৪	১৭

ইউনিট-৪	৬	২	৪	৩	১৫
ইউনিট-৫	৪	৪	৫	৩	১৬
ইউনিট-৬	৪	৫	৩	—	১২
ইউনিট-৭	৪	৬	৫	..	১৫
মোট	**৪০**	**২৫**	**২৫**	**১০**	**১০০**

উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু ছাড়াও আইটেমের অনুপাত দেখা উচিত। উদাহরণ ৪০ শতাংশ আইটেম (প্রশ্ন) জ্ঞানমূলক এবং ২৫ শতাংশ বোধমূলক উদ্দেশ্যসমূহের জন্য থাকা দরকার। একইভাবে ১১ শতাংশ ইউনিট-১ এর জন্য এবং ১৪ শতাংশ ইউনিট-২ এর জন্য রাখা যেতে পারে। নির্দিষ্টকরন টেবিল শিক্ষককে কি ধরনের প্রশ্ন এবং বিভিন্ন ইউনিটের থেকে কতগুলি করে প্রশ্ন হবে তা বুঝতে সাহায্য করে। এছাড়া মোট সময়ের থেকে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য কত সময় দেওয়া যেতে পারে তা বুঝতে সাহায্য করে।

এছাড়া নির্দিষ্টকরন টেবিল প্রশ্নপত্রে কি ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হবে তাও প্রকাশ করে। সাধারনত পরীক্ষাতে তিন ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয়ে থাকে ·

* রচনাধর্মী প্রশ্ন
* সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
* এক কথায় প্রকাশ

এই ধরনের প্রশ্নগুলি কোর্সের সব বিষয়বস্তু থেকে হওয়া উচিত। এই সংক্রান্ত টেবিল নিম্নে দেওয়া হল।

প্রশ্নের ধরন	প্রশ্নমান
রচনাধর্মী	৩০
সংক্ষিপ্ত	৪০
এককথায় প্রকাশ	৩০

টেবিল—৩.৪ প্রশ্ন ধরনে উপর প্রদত্ত নম্বর

যদি ৬ নম্বর রচনাধর্মী প্রশ্নে, ২ নম্বর সংক্ষিপ্ত ধরনের প্রশ্নে এবং ১ নম্বর এককথার প্রশ্নে দেওয়া হয় তবে একটি পরীক্ষায় মোট প্রশ্নসংখ্যা হবে—

রচনাধর্মী প্রশ্ন—৫টি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন—২০টি

এককথায় প্রশ্ন—৩০টি

মোট প্রশ্ন—৫৫টি

সুতরাং একটি প্রশ্নপত্রে মোট ৫৫টি প্রশ্ন থাকবে। একইভাবে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সময়ও বরাদ্দ করা

যেতে পারে। উপরের উদাহরনে রচনাধর্মী প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ১০ মিনিট, ২ মিনিট প্রতিটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য এবং ১ মিনিট এককথার প্রতিটি প্রশ্নের জন্য হলে উপরিউক্ত প্রশ্নপত্রের জন্য মোট সময়ের (২ ঘন্টা) তালিকা নিম্নে দেওয়া হল—

প্রশ্নের ধরন	মোট প্রশ্ন	বরাদ্দ সময়
রচনাধর্মী	৫	৫০ মিনিট
সংক্ষিপ্ত	২০	৪০ মিনিট
এককথায়	৩০	৩০ মিনিট

মোট প্রশ্ন ৫৫টি মোট সময়—রচনাধর্মী ১২০মিনিট

একটি প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের জটিলতা স্তর নিম্নের ন্যায় হওয়া উচিত—

জটিল প্রশ্ন—২০%

গড়/সাধারন প্রশ্ন—৬০%

সহজ প্রশ্ন—২০%

যাইহোক, প্রশ্নের জটিলতা নির্ভর করে পরীক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য সমূহের উপর। উদাহরণস্বরূপ যদি পরীক্ষাটি Slow learner-দের জন্য হয় তবে কঠিন জটিল এবং সাধারন প্রশ্নের তুলনায় সহজ প্রশ্ন অধিক হওয়া উচিত। একইভাবে যদি পরীক্ষাটি অসাধারন শিশুদের জন্য হয় তবে অধিক কঠিন প্রশ্ন প্রশ্নপত্রে দেওয়া যেতে পারে।

৪। পরীক্ষা প্রশ্ন লিখন (Writing of Test Items) :

নির্দিষ্টকরন ছক শিক্ষককে প্রশ্ন লিখতে সাহায্য করে। প্রশ্ন লেখার জন্য বিভিন্ন প্রশ্নের ধরন সম্বন্ধে জানা দরকার। প্রশ্ন সাধারনত দুই ধরনের হয়—রচনাধর্মী এবং এককথার।

(ক) রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay type items) :

সবাই রচনাধর্মী প্রশ্ন সম্পর্কে জানে। এক্ষেত্রে বড় উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত দানের স্বাধীনতা থাকে এবং নিজের মতো করে নিজের ভাষায় লিখতে পারে। উত্তর দানের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে রচনাধর্মী প্রশ্ন আবার দুই ভাগে বিভক্ত—

* বিস্তারিত/প্রসারিত/মুক্ত উত্তর দানের সুযোগ— যেমন ভারতে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

* নির্দিষ্ট / সীমাবদ্ধ উত্তরদানের সুযোগ— যেমন — আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনের দুটি সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।

রচনাধর্মী প্রশ্ন প্রস্তুত করা সহজ। যাইহোক এই ধরনের প্রশ্নের কিছু অসুবিধা আছে: এর বিষয়বস্তুর

বৈধতা কম। শিক্ষার্থী উত্তরে অনেক চালবাজি / ধাপ্পা দিতে পারে। এটি কম বিশ্বাসযোগ্য এবং বৈবয়িক। এই ধরনের সমস্যা মুক্ত হওয়ার জন্য পরীক্ষায় বিষয়মুখী প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়।

(খ) বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective type itmes) :

যে প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্ট তাদের বিষয়মুখী প্রশ্ন বলে। এটি দুই ধরনের--

১। যোগান ধরনের প্রশ্ন (Supply type items)

এখানে শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তরটি দিতে হয়। এটি আবার সরাসরি উত্তর এবং সম্পূর্ণকরণ এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

* সরাসরি উত্তর--এখানে প্রশ্নের উত্তরটি একটি শব্দ বা বাক্যের অংশ লিখতে হয়।

উদাহরণ প্রশ্ন - মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ নবাব কে ?

উত্তর- বাহাদুর শাহ জাফর।

প্রশ্ন—জলের সংকেত কি ?

উত্তর—H_2O

* সম্পূর্ণকরণ শূন্যস্থানে একটি শব্দ বা বাক্যাংশ লিখতে হয়।

$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$

IST হল Indian Standard Time.

* সাধারন লবণের সংকেত হল Nacl.

২। নির্বাচনধর্মী প্রশ্ন (Selection type test items)

এখানে শিক্ষার্থীকে অনেকগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিতে হবে। এটি সত্যি-মিথ্যা/ভুল-ঠিক, বিকল্প উত্তর, মিল স্থাপন কর,

(ক) সত্যি মিথ্যা ঃ এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরের দুটি সম্ভাবনা থাকে—

* লবন জলে দ্রবীভূত হয় T/F
* পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা অণু T/F
* হুমায়ুন সৌধ আগ্রায় অবস্থিত T/F

(খ) মিল স্থাপন কর (Matching)

এক্ষেত্রে একাধিক উক্তি, শব্দ অথবা বাক্যাংশ একই স্তম্ভে থাকে এবং অপর একটি স্তম্ভে—একই জিনিসের বিভিন্ন বিকাশ থাকে। একজন ছাত্র দুইটি বিকল্পের মধ্যে মিল খুঁজে নেয়, এক্ষেত্রে একটি বোঝার সুবিধার জন্য একটির থেকে অন্য স্তম্ভ বড় থাকে।

নির্দেশ ঃ Column A তে কতকগুলি শব্দ আছে এবং Column B তাদের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য দেখাচ্ছে। একটি শব্দের সাথে Column A-এর মিল দেখাও।

ক্রমিক সংখ্যা	স্তম্ভ — ক	স্তম্ভ — খ	
১	সুন্দর	বিশেষ্য	ক
২	হাতী	সর্বনাম	খ
৩	কিন্তু	বিশেষণ	গ
৪	সে	বিশেষণের বিশেষণ	ঘ
৫	ধীরে	কনজাংশন/সংযোজক অব্যয়	ঙ
		প্রিপজিশন	চ
		ক্রিয়া	ছ

(গ) Multiple Choice Type

এক্ষেত্রে একজন ছাত্রকে একাধিক উত্তর দেওয়া হয় যেখান থেকে সে সঠিক উত্তরটি বেছে নিতে পারে।

উদাহরণ ঃ

উড়িষ্যার রাজধানী হল—

(ক) কটক

(খ) ভুবনেশ্বর

(গ) পুরী

(ঘ) বারহামপুর

আন্দাজে সঠিক উত্তর বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের item, ভুল-ঠিক এবং পরিপূর্ণ উত্তরের থেকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

৫। প্রশ্নপত্র তৈরি (Preparation of a Question Paper) ঃ Paper Setter বা পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষার প্রশ্নগুলি লেখার পর তিনি সেগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে সাজিয়ে নেন যা এককথায় উত্তরের প্রশ্নগুলি রচনামূলক প্রশ্নকে অনুসরন করে। এইভাবে তিনি পরীক্ষার নাম বছর, বিষয়ের নাম, মোট নম্বর এবং পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময় এবং সাধারণ নিয়মাবলী যা সব প্রশ্নের ক্ষেত্রে একই তা প্রশ্নপত্রের প্রথমেই উল্লেখ করেন। প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম দেওয়া থাকে। একেবারে ডানদিকে প্রশ্নের নম্বর দেওয়া থাকে। প্রশ্নের অন্তর্বর্তী পছন্দটি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা উচিত।

৬। প্রশ্নপত্রের পরিচালনা / পরীক্ষা গ্রহণ (Administration of the Question Paper) ঃ প্রশ্নপত্র পরীক্ষার দিনই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছায়। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে পরিদর্শক নিয়োগ করা হয় এবং তাঁরা সেভাবেই কাজ করেন, তাঁরা দেখেন / লক্ষ্য রাখেন প্রতিটি ছাত্র / ছাত্রী তার নিজের নাম, রোল নং এবং অন্যান্য নির্দেশাবলী উত্তরপত্রে ঠিকমতো লিখছে কিনা। তাঁরা এটাও দেখেন যে ছাত্ররা নকল করছে কিনা এবং পরীক্ষার হলে কোনও অসুবিধার সৃষ্টি করছে কিনা। ছাত্রকে

প্রয়োজনমতো সাহায্য করাও তাদের আর একটি কাজ। পরীক্ষার শেষে তৎক্ষণাৎ পরীক্ষার খাতা জমা নিয়ে স্কুল অফিসে জমা দেওয়া এবং পরবর্তী কাজগুলি সুবিধা করে দেওয়া তাদের একটি কাজ।

৭। প্রশ্নপত্রের মান নির্ধারণ (Scoring)

একজন শিক্ষক প্রশ্নপত্রের নম্বর (মান নির্ণয়) দেন নিজে অথবা বাইরের কোন পরীক্ষককে পাঠিয়ে দেন যদি পরীক্ষাটি বাইরের হয় (External Exams.) এক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকা নম্বর দেবেন অথবা মান নির্ণয় করবেন। এটি একক-২-এ আলোচনা করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় মান নির্ধারকগুলির সাহায্য নিতে পারেন। মান নির্ধারক হল—প্রশ্নের মান বা নম্বরের নকশা যা Paper setter রা তৈরি করেন।

৮। প্রশ্নপত্রের মূল্য নিরুপণ (Carrying Out the Questions Paper Appraisal)

প্রশ্নপত্র নির্ধারনের পর পত্রে প্রশ্নের কার্যকারিতার মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এটি করা হয়ে থাকে প্রশ্নের বিশ্লেষণ দ্বারা যা প্রশ্নের কঠিনত্ব বুঝতে সাহায্য করে এবং ক্ষমতাকে আলাদা করে দেখায়।

(ক) কাঠিনত্বের স্তর (Difficulty Level) ঃ এটি বোঝায় ছাত্রছাত্রীদের শতকরা হার যারা সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে এবং এটি নিম্নের সূত্রের সাহায্যে গণনা করা হয়। কাঠিনত্বের স্তর = $R/T \times 100$

R = সঠিক উত্তর দিয়েছে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

T = সমস্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যারা উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে।

প্রশ্নপত্রের বিশ্লেষণের জন্য 40 টি পত্র নেওয়া হল। নিম্নলিখিত ধাপগুলি পুরো পদ্ধতিটি নির্ধারন করছে।

* 40টি পত্রকে সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন মূল্যায়নে সাজানো হল।

* এদের মধ্য থেকে এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি সর্বোচ্চ মূল্যের (12টি পত্র) এবং সর্বনিম্ন মূল্যের এক তৃতীয়াংশ রাখা হল। উচ্চ শ্রেণীরগুলি সর্বোচ্চ মানের এবং নিম্ন শ্রেণীর গুলি নিম্নমানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

* প্রতিটি বিভাগের জন্য উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর সঠিক উত্তর দিয়েছে এমন ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা গণনা করা হবে।

* গণনার পদ্ধতিটি দেওয়া হল—

বিভাগ ১ ঃ	পরিবর্ত	A	B	C	D
	উচ্চশ্রেণী (12)	0	3	7	2
	নিম্নশ্রেণী (12)	4	5	1	2

* সঠিক উত্তর।

* কাঠিনত্বের স্তর $7 + 1/16 \times 100 = 8/16 \times 100 = 50\%$

পরীক্ষায় কাঠিনত্বের স্তর হওয়া উচিত শতকরা 50 ভাগ, খুব সহজ এবং খুব কঠিন প্রশ্ন পরীক্ষায় এড়িয়ে চলা উচিত।

(খ) পৃথকীকরণের সূচী (Index of Discrimination)

পরীক্ষার পৃথকীকরণের ক্ষমতা বলতে বোঝায় উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে পৃথকীকরণের ক্ষমতা বোঝায়। এই সূচীটি তৈরি হয় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে।

* মোট সংখ্যার মধ্যে যারা সঠিক উত্তর দিয়েছে তাদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর থেকে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের সংখ্যা বাদ দিতে হবে এবং এটিকে প্রতিটি শ্রেণীর মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে। উপরের উদাহরণের পৃথকীকরণের সূচী দেখানো হল ঃ

* পৃথকীকরণের সূচী = 7-1/12 = 0.5

সর্বোচ্চ পৃথকীকরণ ক্ষমতা হল 1.00 এবং সর্বনিম্ন পৃথকীকরণ ক্ষমতা হল 0.00। একটি পরীক্ষাতে উচ্চ পৃথকীকরণ ক্ষমতাযুক্ত বিভাগ থাকবে আশা করা যায়। পরীক্ষায় ভাল প্রশ্নপত্র তৈরি করতে একজন শিক্ষককে বিভাগ বিশ্লেষণ সাহায্য করে। যদিও বিভাগ বিশ্লেষণের তথ্যগুলি খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত, বিশেষতঃ যখন শ্রেণীকক্ষের পরীক্ষায় অল্প সংখ্যক ছাত্রের কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৯। **পরীক্ষার ফলাফলের ব্যবহার** (Using Examination Results) : বিভিন্ন ব্যবহারকারীর কাছে পরীক্ষার পদ্ধতির শেষ ধাপ হল পরীক্ষার ফলাফল যেমন--শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, পরিচালনমণ্ডলী এবং নিয়োগকর্তা স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারবে। ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে জানতে পারবে। অভিভাবকগন তাদের সন্তানদের শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে জানতে পারবে। পরিচালকমণ্ডলী পদোন্নতি, সম্মান প্রদান, ক্ষমতার নির্ধারন, ছাত্রছাত্রীর কৃতিত্ব অন্যদের জানানোর জন্য পরীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করেন। নিয়োগকর্তা তাঁর প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেককে সঠিক পদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষার ফলাফল দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

৩.৭ বিশেষ ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরীক্ষা (Testing for the Special Students)

যদিও আমরা জানি সাধারণত বিশেষ ছাত্রছাত্রীদের জন্য মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা এবং আরও অন্যান্য পরীক্ষা প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু বিশেষ ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এগুলি বিশেষভাবে উন্নত করা হয়েছে। এই বিভাগে আমরা এরকম কিছু পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করব। বিশেষ ছাত্রছাত্রী বলতে আমরা বুঝি ইন্দ্রিয়জনিত প্রতিবন্ধকতা (Sensory Impaired)—দৃষ্টি এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, অঙ্গ সঞ্চালন সংক্রান্ত এবং বাক-প্রতিবন্ধী, শিখন অক্ষম (Learning Disabilities), গঠনগতভাবে অক্ষম (Developmental disabilities) সামাজিক দিক থেকে বিচ্যুত মানুষ।

৩.৭.১ স্বাভাবিক ক্ষমতা এবং বুদ্ধ্যাংকের পরীক্ষা (Tests of Intelligence and Aptitude)

বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা আছে যা বুদ্ধ্যাংক এবং স্বাভাবিক ক্ষমতা মাপা হয়।

(ক) **Testing Person with Sensory & motor impairment** এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ক্ষমতা মাপার জন্য যে পরীক্ষাগুলি আছে সেগুলি হল—Blind learning aptitude এবং Hiskey-Nebraska Test of learning aptitude.

১। Blind Learning Aptitude Test (BLAT) ৬ বছর থেকে ১২ বছর বয়সের দৃষ্টিহীন শিশুদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষাটি ব্যবহার করা হয়। এই পরীক্ষার মধ্যে থাকে পৃথকীকরন, সাধারণীকরণ, স্থানান্তকরণ, শ্রেণীবদ্ধকরণ, সাদৃশ্যকরণ, নকশা বা কোন আকৃতির সমাপ্তিকরণ। Test, Re-test-এর গ্রহণ যোগ্যতার বিস্তার ০.৮৭ থেকে ০.৯৩ এই পরীক্ষার সাথে বুদ্ধাংকের জন্য পরীক্ষাগুলি সম্পর্কযুক্ত।

২। Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptitude (HNTLA) এই পরীক্ষাটি শ্রবনক্ষমতা যুক্ত এবং শ্রবন প্রতিবন্ধীদের জন্য তৈরি। এই পরীক্ষার মধ্যে আরও ১২টি ছোট পরীক্ষা আছে, সেগুলি হল ক্ষমতা ও কৃতিত্বের পরীক্ষা। বিভিন্ন শ্রেণীর বয়সের জন্য বিভিন্ন গ্রহণযোগ্যতার সূচী খুঁজে পাওয়া গেছে। লেখক এখানে বয়সভিত্তিক চার ধরনের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য চার ধরনের অন্তর্নিহিত সম্পর্কের বৈধতার কথা বলেছেন।

(খ) মোটর ও বাক-প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের জন্য পরীক্ষাসমূহ (Test for children with Motor or Speech Handicapped)

এই শ্রেণীর বুদ্ধাঙ্কের পরীক্ষা বলতে বোঝায় অ-বাক জনিত বুদ্ধাঙ্কের পরীক্ষা, চিত্রের মাধ্যমে বুদ্ধাঙ্কের পরীক্ষা।

১। Test of Non-verbal Intelligence (TONI)

এই পরীক্ষাটি ব্রাউন, শেরবেনও এবং জন্সার ১৯৮২ সালে ৫ থেকে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত মানুষের জন্য তৈরি করেন। ভাষার ব্যবহার এখানে করা হয় না এবং এটি অ-বাক শোনা এবং পড়া অথবা লেখার দক্ষতার কোন প্রয়োজন হয় না। এই পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রদের চিহ্নিতকরণের ক্ষমতা এবং অবাস্তব চিহ্ন ও ছবির মধ্যে সম্পর্কীকরণ করার ক্ষমতা বোঝা হয়। পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতার স্থিরতা হল ০.৯০ অন্যান্য পরীক্ষার সাথে এর সমবর্তী বৈধতা আছে।

২। Pictorial Test Intelligence (PTI)

এই পরীক্ষাটি ৩ থেকে ৮ বছরের শিশুদের জন্য প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রী একটি প্রশ্নের উত্তর দেয় চারটি ছবিযুক্ত কার্ডের একটিতে বেছে নিয়ে। এই পরীক্ষায় ছয়টি আরও পরীক্ষা আছে। এগুলি হল—Picture vocabulary, আকার পৃথকীকরন, তথ্য ও বোধশক্তি, সমতা, আকৃতি এবং সংখ্যা, এবং তাৎক্ষণিক উত্তর। Test, Re-test বৈধতার বিস্তার হল ০.৯০ থেকে ০.৯৬ এই পরীক্ষা বিষয়বস্তুর বৈধতা দেখায়।

৩.৭.২ ভাষার বিকাশের পরীক্ষা (Testing of Language Development)

ভাষা চারটি অংশ দিয়ে গঠিত। Phoneme, Morphemes, Syntax, Semantics। এরা চারিত্রিক ভাবে ক্রমানুসারে অবস্থিত। Phoneme হল Speech Sound-এর গঠন পাঠন, যেখানে Morphology Speech-এর সবথেকে অর্থপূর্ণ ছোট অংশ নিয়ে আলোচনা করে। Syntax হল বিভিন্ন শব্দকে সাজানোর পদ্ধতি যার দ্বারা বাক্যের অংশ বোঝানো যায়। Semantic উচ্চারিত শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানারকম পরীক্ষার বিকাশ হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি পরীক্ষার সারাংশ দেওয়া হল।

টেবিল ৩.৬ ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) ও উচ্চারিত শব্দের (Articulation) পরীক্ষা

টেস্ট পরীক্ষা	বয়স	একক/দল	পরিমাপ ক্ষেত্র
Arizona Articulation Test (Revised)	৩-১২	একক	ভাবব্যঞ্জক/ভাবদ্যোতক ধ্বনিতত্ত্ব
Auditory Discrimination Test	৫-৮	একক	সংকেত গ্রহণ/বৈষম্যমূলক
Goldman-Fristoe Test of Articulation	৬-১৬	একক	ভাবব্যঞ্জক ধ্বনিতত্ত্ব
Photo Articulation Test	৩-১২	একক	ভাবব্যঞ্জক ধ্বনিতত্ত্ব

উৎস : R. L. Lufting (1989)

টেবিল ৩.৭ শব্দ সংস্থান/শব্দগঠন বিদ্যা (Morphology) এবং শব্দভাণ্ডার পরীক্ষা

টেস্ট পরীক্ষা	বয়স	একক/দল	পরিমাপ ক্ষেত্র
Ammons Full Range Picture vocabulary Test	২	একক	অন্তর্নিহিত শব্দভাণ্ডার
Peabody Picture vocabulary Test (Revised)	২.৫-৪০	একক	অন্তর্নিহিত শব্দভাণ্ডার

উৎস : R. L. Lufting (1989)

টেবিল ৩.৮ শব্দের গঠন ও ব্যাকরণ পরীক্ষা

টেস্ট পরীক্ষা	বয়স	একক/দল	পরিমাপ ক্ষেত্র
Carrow Elicited Language Inventory	৩-১২	একক	প্রকাশিত বাক্য গঠনের ব্যাকরণ সম্মত নিয়ম
Development Sentence Analysis	২-৬ থেকে ৭-১১	একক	"
North Western Syntax Screening Test	৩-৬ ৭-১১	একক	অন্তর্নিহিত এবং প্রকাশিত বাক্য-গঠনের ব্যাকরণ সম্মত নিয়ম

উৎস- R.L. Lufting (1989)

টেবিল ৩.৯ ভাষার অর্থ সংক্রান্ত (Semantics) পরীক্ষা

টেস্ট পরীক্ষা	বয়স	একক/দল	পরিমাপ ক্ষেত্র
Boehm Test of Basic Concepts	২	দল	ভাবব্যঞ্জক/ভাবদ্যোতক ভাষার অর্থ
Environmental Language Inventory	২	একক	প্রকাশিত ভাষার অর্থ
Let's Talk Inventory for Adolescents	৯	একক	ভাবব্যঞ্জক এবং প্রকাশিত ভাষার অর্থ

উৎস--R.L. Lufting (1989)

৩.৭.৩ পঠন দক্ষতার পরীক্ষা (Tests of Reading Skills)

এটি বিশেষ শিশুদের পড়ার দক্ষতা পরিমাপ করে। পঠন দক্ষতা বলতে ভাষায় অর্থোদ্ধার করা এবং উপলব্ধিকে বোঝায়। অর্থোদ্ধার দক্ষতা (Decoding Skills) শব্দের বিশ্লেষণ এবং শব্দের সনাক্তকরণ/উপলব্ধি নিয়ে গঠিত। শব্দের বিশ্লেষণ বলতে অক্ষরের সঙ্গে অক্ষরের সংযোজনে কিভাবে শব্দ তৈরি হয় তাই নিয়ে আলোচনাকে বোঝায়। পঠন উপলব্ধি দক্ষতা শ্রেণীবিন্যাস ও দলবদ্ধকরণ, মূল ধারনার চিহ্নিতকরন, মনে করা/স্মরণে আনা, ঘটনার ক্রমবিন্যাস, শব্দের অর্থ, ব্যাখ্যা করপ্রদান সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, অনুমান/অধিকরণ সিদ্ধান্ত তৈরি করা, সম্পর্ক স্থাপন করা, সংগঠিত করা, পঠন হার প্রভৃতি নিয়ে গঠিত। নিচের টেবিলে পঠন মূল্যায়নের কিছু পরীক্ষা দেওয়া হল।

টেবিল ৩.১০ পঠন পরীক্ষা

টেস্ট পরীক্ষাসমূহ	লেখক	বয়স	একক/দল	পরিমাপ ক্ষেত্র	পরীক্ষার ধরন
Gilmore Oral Reading Test	Gilmore & Gilmore 1968	১-৮	একক	D.O.	S
Gray Oral Reading Test (Revised)	Widerhold and Bryant, 1986	১-১২	একক	D. O.	S
Stanford Diagnostic Reading Tests (3rd ed.)	Karlsen, Maddern and Gardner, 1985	১-১২	দল	D, C.	S
Test of Reading Comprehension	Brown, Hammill and Wiedenholt, 1986	৬-১৪	একক/দল	C	S

এখানে D = Decoding = অর্থোদ্ধার C = Comprehension (উপলব্ধি)

O = Oral Reading = মৌখিক পঠন S = Standardized নির্দিষ্টমান যুক্ত

উৎস— R. L. Lufting (1989)

৩.৭.৪ অঙ্কের মূল্যায়ন (Assessment of Mathematics)

ছাত্রছাত্রীদের গাণিতিক ক্ষমতার মধ্যে গণনার দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের এবং প্রয়োগের দক্ষতাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গণনার দক্ষতার মধ্যে যোগ বিয়োগ, গুণ এবং ভাগের প্রাথমিক গাণিতিক উপায়গুলি অন্তর্ভুক্ত। সমস্যা সমাধান বলতে বোঝায় সমস্যা সমাধানের গাণিতিক দক্ষতার প্রয়োগ। প্রয়োগের দক্ষতা বলতে বোঝায়—সমস্যা সমাধানের দক্ষতার ব্যবহার যার সাহায্যে দৈনন্দিন জীবনে সময়, অর্থ এবং পরিমাপের সমস্যাকে সমাধান করা যায়। নীচে কিছু গাণিতিক মূল্যায়ন পরীক্ষার সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(ক) Key Math Diagnostic Arithmatic Test (Key Math).

এই পরীক্ষাটির বিকাশ ঘটান Comolly ১৯৮৮ সালে। এই পরীক্ষায় ১-১০ গ্রেড আছে। এখানে যে যে অঞ্চলের উপর পরীক্ষা করা হয় সেগুলি হল—প্রাথমিক ধারনা, হিসাব এবং প্রয়োগ। চারিত্রিকভাবে এটি Norm referenced এবং criterian reference। এটি দলগত ভাবে এবং আলাদা আলাদা ভাবে প্রয়োগ করা যায়। এই পরীক্ষার পরিবর্তন গ্রহণযোগ্যতার বিস্তার হল—.৮০ থেকে .৮৮ এটি বিষয়বস্তুর বৈধতাকে নিশ্চিত করে।

(খ) Stanford Diagnostic Mathematics Test

এটি বেটী, ব্লাডেন, গার্নার এবং কার্লসেন ১৯৭৬ সালে গঠন। এই SDMT ১-১২ গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য গঠিত। এর মধ্যে যে উপ-পরীক্ষাগুলি আছে সেগুলি হল নম্বর দেওয়া এবং সংখ্যা পঠন পদ্ধতি, হিসাব এবং প্রয়োগ। এটি চারিত্রিক ভাবে Norm এবং Criterian refereced—যা দলগতভাবে বা আলাদাভাবে প্রযোজ্য। এই পরীক্ষার পরিবর্ত গ্রহণ যোগ্যতা 84. এটি criterian সংক্রান্ত বৈধতাকে নিশ্চিত করে।

৩.৭.৫ বিশেষ শিশুদের আগ্রহ পরীক্ষা (Tests of interest for special children)

বিশেষ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য আগ্রহের উপর অনেকগুলি পরীক্ষা আছে। যার কতকগুলি নীচে উল্লেখ করা হল।

(i) Geist Picture Interest Inventory (GPII)

এই পরীক্ষাটি ১৯৬৪ সালে Geist, গঠন করেন। এটি একটি বাধ্যতামূলক পছন্দের ধরনের উপর পরীক্ষা যার মধ্যে ১৩২টি ছবি যেগুলি ৪৪ প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে ছাত্রকে সবথেকে পছন্দের এবং অপছন্দের বস্তুকে গোলের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে বলা হয়। এই পরীক্ষার ধাপ হল অষ্টম শ্রেণী থেকে স্নাতক পর্যন্ত এবং যারা স্নাতক নয় কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত। আগ্রহের ক্ষেত্রগুলি পরিমাপ করেন পরীক্ষক। এগুলি হল—করণিক সম্বন্ধীয়, যান্ত্রিক, সংগীত সম্বন্ধীয়, বৈজ্ঞানিক, বহির্বিভাগীয়, সাহিত্য, হিসাব সম্বন্ধীয়,

শৈল্পিক, সামাজিক, নাটকীয় ইত্যাদি। এটি একটি অ-বাক্ জনিত আগ্রহের তালিকা, এর গ্রহণযোগ্যতা মধ্যম মানের এবং বৈধতা অপ্রমাণিত। তবুও এটি বধিরদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

(ii) **Work intrest Index (WII)**

এটি প্রচলন করেন Baehr, Renck, Burns, Prainis ১৯৫৬ সালে। এটি একটি অবাক্‌জনিত আগ্রহের তালিকা। এতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দ ও অপছন্দের উপর নির্ভর করে কর্মরত পুরুষ ও মহিলার ৯৬টি ছবির উপর উত্তর করতে হয়। এটি ৭-১২ গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য গঠিত। মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলি হল পেশাদারী এবং সামাজিক এবং বাক্ জনিত কারিগরী অধিকার এবং সাম্যানিক, শৈল্পিক এবং প্রশাসনিক, শৈল্পিক এবং সৃজনাত্মক, প্রযুক্তিভিত্তিক এবং বৈজ্ঞানিক, করণিক সম্বন্ধীয় এবং নিয়মমাফিক, ব্যবসা, নিজস্ব কর্ম, চাহিদা, যান্ত্রিক, আগ্রহের নমনীয়তা এবং আগ্রহের স্তর। সাতটি ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য 80s. চারটি ক্ষেত্রের 70s এবং একটি ক্ষেত্রে 60s পরীক্ষার বৈধতা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাপিত নয়।

৩.৮ এককের সারাংশ (Unit Summary)

* সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষাসমূহ আদর্শ ও মানভিত্তিক উভয়ই হতে পারে।

* সফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষার উদ্দেশ্য তুলনা করা, দখল নির্ধারন শিক্ষার্থী বাছাই করা এবং পাঠ্যক্রমের সাফল্য পরিমাপ করা।

* শিখন উৎপাদ/ফলাফল, বিষয়বস্তুর পরিমাপ, গুণগত মান, বিশ্বাসযোগ্যতা পরিচালনা এবং স্কোরিং এবং মূল্যায়িত স্কোরের ব্যাখ্যাপ্রদানের দিক থেকে নির্দিষ্ট মান যুক্ত পরীক্ষা ও শ্রেণীকক্ষের সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির।

* সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষা দলগতভাবে এবং একক ভাবে করা যায়।

* পদ্ধতির মূল্যায়ন বলতে যে ভাবে শিক্ষার্থী সফলতা পায়/কার্য সম্পাদন করে সেই প্রক্রিয়ার মূল্যায়নকে বোঝায়।

* উৎপাদ বা ফলাফলের মূল্যায়ন বলতে যখন কার্য পরিচালনা করার পর শিক্ষার্থীর সাফল্য সর্বশেষ উৎপাদ/ফলাফল হিসাবে প্রকাশ পায় তার মূল্যায়ন বোঝায়।

* ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব বলতে ব্যক্তির বস্তুর, বিষয় বা ঘটনার প্রতি সেই ব্যক্তির অনুভূতিকে বোঝায়।

* লাইকার্ট (Likert) টাইপ দৃষ্টিভঙ্গি স্কেল দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপের জনপ্রিয়।

—প্রশ্নপত্র তৈরির পদ্ধতি নিম্নলিখিত ধাপসমূহ নিয়ে গঠিত।

* কোর্সের বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণ

* শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যাবলীর নির্দিষ্টকরণ

* নির্দিষ্টকৃত উদ্দেশ্যাবলীর টেবিল প্রস্তুতকরন

* পরীক্ষার প্রশ্নধরন লিখন
* চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র তৈরি করা
* প্রশ্নপত্রের সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণ
* শিক্ষার্থীর উত্তর পত্রের স্কোরিং/মূল্যায়ন করা
* প্রশ্নপত্রের মূল্য নিরূপন
* পরীক্ষিত ফলের ব্যবহার

এই ইউনিটে বিশেষ শিশুদের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন— বুদ্ধিমত্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির, পরীক্ষা, ভাষা বিকাশের পরীক্ষা, পঠন দক্ষতা নির্ণয়ে পরীক্ষা, গাণিতিক মূল্যায়নের পরীক্ষা, আগ্রহ মূল্যায়নের পরীক্ষা।

৩.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

২। নির্দিষ্টমান যুক্ত সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষা ও ইনফর্মাল ক্লাসরুম সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৩। বিশেষ শ্রেণীর শিশুদের জন্য ব্যবহৃত দুটি ব্যক্তিগত সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। পদ্ধতি মূল্যায়ন কি? উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

৫। উৎপাদ/ফলাফল মূল্যায়ন কাকে বলে? মূল্যায়ন পদ্ধতিতে এর প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করুন।

৬। মনোভাব/দৃষ্টিভঙ্গির সংজ্ঞা দাও। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর মনোভাব পরিমাপ করা দরকার কি?

৭। বিদ্যালয়ে অঙ্ক শিখনের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোভাব পরিমাপের জন্য 'Likert-type scale' গঠন করুন।

৮। বিশেষ শিশুদের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত যে কোনো দুটি পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করুন।

৯। প্রশ্নপত্র গঠনের ধাপসমূহ কি কি?

১০। গাণিতিক মূল্যায়ন বলতে কি বোঝ? গাণিতিক সক্ষমতা মূল্যায়নের পরীক্ষাসমূহ নিয়ে আলোচনা করুন।

১১। ভাষা বিকাশের গঠনের দক্ষতার উপাদানগুলি কি কি?

৩.১০ বাড়ীর কাজ (Assignment)

১। বিশেষ শ্রেণীর শিশুদের জন্য ব্যবহৃত যেকোনো দুটি ব্যক্তিগত সাফল্য নির্ণায়ক পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করুন।

২। পদ্ধতি মূল্যায়ন কি? মূল্যায়ন পদ্ধতিতে এর প্রয়োজন আলোচনা করুন।

৩। উৎপাদ মূল্যায়ন কি? মূল্যায়ন পদ্ধতিতে এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করুন।

৪। মনোভাবের সংজ্ঞা দাও। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর মনোভাব পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা কি?

৫। বিশেষ শিশুদের বুদ্ধাঙ্ক পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত যে কোনো দুটি পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করুন।

৩.১১ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Check Your Progress)

____

____

____

____

৩.১২ উৎস (References)

1. Connigham, G. K. (1986) *Educational and Psychological Measurement.* New York : MacMillan.

2. Ebel, R.L. (1979) *Essentials of Educational Measurement.* 3rd ed. Englewood Cliffs. N.J. : Prentice Hall.

3. ronlund, Norman E. (1981) *Measurement and Evaluation in Teaching,* 4th ed., New York : MacMillan.

4. L fting, Richard L. (1989) *Assessment of Learners with Special Needs.* Boston : Allyn and Bac n.

5. Ha per, A.E. and Harper, E.S. (1990) *Preparing Objective Examinations_A Handbook for eachers, Students and Examiners,* New Delhi : Prentice-Hall of India.

একক ৪ ☐ মূল্যায়নের পরীক্ষা ও পদ্ধতিসমূহ (Tools and Techniques of Evaluation)

গঠন

৪.১ ভূমিকা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ পরীক্ষা ও পদ্ধতিসমূহ

৪.৪ শিক্ষক তৈরি পরীক্ষা ও নির্দিষ্ট মানযুক্ত পরীক্ষা

৪.৫ আত্ম প্রতিবেদন মূলক পদ্ধতি

৪.৫.১ প্রশ্নমালা

৪.৫.২ সাক্ষাৎকার তালিকা

৪.৬ পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি

৪.৬.১ ঘটনা/কাহিনীর নথি

৪.৬.২ রেটিং স্কেল

৪.৬.৩ যাচাই স্কেল

৪.৭ রিপোর্ট কার্ড

৪.৭.১ মূল্যায়ন রিপোর্টের উপাদান সমূহ

৪.৭.২ রিপোর্ট লিখনের সমস্যাক্ষেত্র

৪.৮ এককের সারাংশ

৪.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন

৪.১০ বাড়ীর কাজ

৪.১১ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফূটন

৪.১২ উৎস

৪.১ ভূমিকা (Introduction)

আমরা মূল্যায়নের ধারণা এবং মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মূল্যায়ন হল প্রধানতঃ ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্বের সঙ্গে যে কাজগুলি করে তার বিচার। প্রতিটি মূল্যায়নের পূর্বে মূল্যায়নকারীর গুনগত, পরিমেয় কিছু তথ্যের প্রয়োজন হয়। মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষক অথবা মূল্যায়নকারীর কিছু হাতিয়ার এবং পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। পরীক্ষাগুলি শিক্ষক নিজে তৈরি করেন বা বাজারে সহজলভ্য এই টেস্টগুলি হতে পারে যা Paper-pencil test নামে পরিচিত। কিন্তু এই টেস্ট ছাড়াও আরও অন্য উপায়ে মূল্যায়ন করা যায় যেমন ছাত্রছাত্রীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে, সাক্ষাৎ করে এবং স্কুলে সহজলভ্য এমন

তথ্য বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করে যায়। এইগুলি মূল্যায়নের পদ্ধতির মধ্যে পড়ে। এই অধ্যায়ে মূল্যায়নের পরীক্ষা এবং পদ্ধতির উপর আলোচনা করা হবে, বিশেষ করে প্রশ্ন তালিকা, সাক্ষাৎ তালিকা, রেটিং স্কেল এবং রিপোর্ট কার্ড।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়ের মাধ্যমে আমরা জানব—

* মূল্যায়ন পদ্ধতিতে— মূল্যায়নের পরীক্ষা এবং পদ্ধতির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা।
* মূল্যায়নের পদ্ধতির শ্রেণীবদ্ধকরন।
* প্রথাগত পরীক্ষা এবং শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষার মধ্যে পৃথকীকরন।
* Self-reporting পদ্ধতি যেমন— প্রশ্নতালিকা, সাক্ষাৎ তালিকার আলোচনা।
* পর্যবেক্ষণ তালিকা যেমন—(ancedotal record rating scale and check list)-এর আলোচনা।
* মূল্যায়ন রিপোর্টের উপাদান বর্ণনা করা।
* লিখিত তথ্যের সমস্যার ক্ষেত্রগুলি তালিকাভুক্ত করা এবং বিশ্লেষণ করা।

৪.৩ মূল্যায়নের হাতিয়ার এবং পদ্ধতি (Tools And Techniques of Evaluation)

মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হল মূল্যায়নের হাতিয়ার এবং পদ্ধতি। মূল্যায়নের সমস্ত ধরনের পরীক্ষা এবং পদ্ধতির সাথে প্রতিটি শিক্ষকের পরিচিতি থাকা উচিত। যদিও পরীক্ষাকে আমরা শিক্ষকের তৈরি এবং প্রথাগত পরীক্ষা এই দুই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। মূল্যায়ন পদ্ধতিকে Subjective objective এবং Projective পদ্ধতিতে ভাগ করতে পারি। পরের বিভাগে প্রথাগত পরীক্ষা এবং শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষার পৃথকীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করব। এখানে আমরা মূল্যায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব। ছাত্রদের নিজেদের মাধ্যমে দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে Subjective পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নিজের সম্পর্কে তথ্য প্রদান, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, মতামত, চিন্তাধারা, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত মূল্যায়ন তথ্যগুলি চারিত্রিকভাবে Subjective। এই Subjective পদ্ধতির ভুলভ্রান্তিকে কাটিয়ে ওঠার জন্য একজন মূল্যায়নকারী objective পদ্ধতির সাহায্য নেন।

Objective পদ্ধতিতে পরীক্ষার অবস্থা পদ্ধতি এবং নির্ধারনের ছাঁচ বা আদর্শ পূর্ব নির্ধারিত থাকে সুতরাং বিভিন্ন পরীক্ষা পরিচালকেরা একই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হন। বস্তুনিষ্ঠতা/ নৈর্ব্যক্তিকতা আনার জন্য পরীক্ষকদের দ্বারা পূর্বাহ্নিক সতর্কতা গ্রহণ করা সত্ত্বেও, পরীক্ষার্থীরা অনেক সময় সুচিন্তিতভাবে / ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকৃত তথ্য চেপে যায়। ফলস্বরূপ সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠতা অর্জন করা যায় না। এই ধরনের সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে Projective পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। Projective পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীদের কাছে অগঠিত অথবা কিছুটা গঠনমূলক উদ্দীপক দেওয়া হয় এবং সে সেটিকে সম্পূর্ণ করে এবং তার একটি নতুন রূপ বা আকৃতি প্রদান করে। তার উত্তর বিশ্লেষণ করা হয় এবং তার সুপ্ত অনুভূতি ও আবেগ সম্পর্কে জানা যায়। ছাত্রছাত্রীদের অনুভূতি ও আবেগ জানার জন্য শিক্ষকেরা

Projection পদ্ধতি ব্যবহার করেন। Projective পদ্ধতির বিভিন্ন ছক হল—ছবি, কালির ফোঁটা, অসম্পূর্ণ বাক্য, শব্দের একত্রীকরন, একজনের লেখা বা আঁকা ইত্যাদি।

সাধারণভাবে ব্যবহৃত Projective পদ্ধতি হল Rorschach Ink Blot Test (RIBT) এবং Thematic Apperception Test (TAT). RIBT একদিকে মানসিক গোলযোগের প্রকৃতিগত মর্ম উপলব্ধি করার শক্তি দেয় অন্যদিকে সুপ্ত অনুভূতি ও আবেগ যা কাঙ্ক্ষিত তা বুঝিয়ে দেয়। এর মধ্যে দশটি কালির ফোঁটার দল থাকে, পাঁচটি ধূসর ও কালোর ছায়াতে তৈরি, দুটি উজ্জ্বল লাল রঙের থাকে সঙ্গে ধূসর রঙের ছায়া (Shade) থাকে, বাকী তিনটি বিভিন্ন রঙ দিয়ে তৈরি হয়। একবার এই পরীক্ষায় বিষয়কে (যার পরীক্ষা হচ্ছে) একটি ফোঁটা দেখানো হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয় সে কি দেখেছে।

TAT-এর মধ্যে বিভিন্ন গঠনের / দলের মানুষের ছবি থাকে। এর মধ্যে ৩০টি কার্ডের গুচ্ছ এবং একটি ফাঁকা কার্ড থাকে যা বিষয়ের বয়স এবং গোত্র অনুযায়ী বিভিন্ন সংযুক্তকরণের সাহায্যে ব্যবহার করা হয়। TAT-র বক্তাকে (Subject) ক্রমান্বয়ে প্রতিটি ছবির উপর একটি করে গল্প সম্পূর্ণ করতে বলা হয় উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে, সেই সঙ্গে ক্ষমতা, সমস্যা তথ্যানুসন্ধানের জন্য এক বা একাধিক উদ্দেশ্যের ব্যবহারে TAT খুবই ব্যবহারযোগ্য।

Projection পদ্ধতির মধ্যে Children Apperception Test (CAT), Draw a Man test, Word Association Test ইত্যাদিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। Projective পদ্ধতি পরিচালিত করা এবং ব্যক্তিত্বের সব চলরাশি-এর নির্ধারন করা খুবই সহজ। কিন্তু এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা দান করা খুব কঠিন। সুতরাং Projective পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত ফলের ব্যাখ্যা করার জন্য ক্রমাগত প্রশিক্ষনের অবশ্য প্রয়োজন। এই পদ্ধতি নিয়ে আমরা 4.5 বিভাগে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব, কিন্তু প্রথমে আমরা পরীক্ষা নিয়ে নিম্নলিখিত বিভাগে আলোচনা করব।

8.8 শিক্ষক তৈরি পরীক্ষা এবং নির্দিষ্টমানযুক্ত পরীক্ষা (Teacher Made and Standardized Tests)

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা শিক্ষকের তৈরি এবং নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী পরীক্ষার বিষয়ে সংকেত দিয়েছিলাম, যা নিয়ে এখন আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করব। আমরা সকলেই অবগত যে শিক্ষক কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা প্রসঙ্গের উপর তাদের ছাত্রদের কৃতিত্বকে নির্ধারণ করার জন্য নিজেরা পরীক্ষার পত্র তৈরি করেন। তাঁরা তাঁদের ছাত্রদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে নির্ধারণ করার জন্য কিছু পরীক্ষার ব্যবহার করেন। এই পরীক্ষাগুলির মাধ্যমে তাঁরা জানতে পারেন শিক্ষনীয় বিষয়ের নির্দেশমূলক উদ্দেশ্যগুলির কতটা উন্নতি হয়েছে। সুতরাং শিক্ষা শিক্ষন পদ্ধতিতে শিক্ষকের দ্বারা গঠিত পরীক্ষা সমূহকে বলা হয় শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষা (Teacher made test)। শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় প্রশ্নপত্রের সাহায্যে উন্নতির পরীক্ষা। এই উন্নতির পরীক্ষা ছাড়াও শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের খেলার মাঠে, সহ-পাঠক্রম কার্যাবলীতে আচার-আচরণ কৃতিত্ব, ইত্যাদির উপর দৃষ্টি রাখেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ তালিকা, রেটিং স্কেল তৈরি করেন।

শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষা মৌখিক, লিখিত, ব্যবহারিক হতে পারে। শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল—

* নির্দেশমূলক উদ্দেশ্যগুলির কতদূর উন্নতি হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

* একটি অধ্যায়ের নির্দেশাবলীতে ছাত্রের দক্ষতার স্তর নির্ধারণ করা।

* একজনের নিজের শিক্ষাদানের ক্রিয়াকলাপের ফলাফলের বিচার করা।

* ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষণের অসুবিধাগুলি বিশ্লেষণ এবং

* পরীক্ষার বিষয়ের নম্বরের ভিত্তি নিশ্চিত করা।

শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষাগুলিতে মূল্যায়নের হাতিয়ারের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে পূরণ করা উচিত যা আমরা একক-১-এ আলোচনা করেছি। এগুলি হল—

১। বৈধতা

২। বিশ্বাসযোগ্যতা

৩। বিষয়মুখীতা/বস্তুনিষ্ঠতা

৪। কার্যকারিতা/ব্যবহারিকতা

এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া পরীক্ষার বিভাগের মধ্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় কাঠিন্যের স্তর এবং পৃথকীকরনের ক্ষমতা থাকা উচিত।

একজন শিক্ষক তাঁর নিজের পরীক্ষাগুলি গঠন বা তৈরি করা ছাড়াও তিনি বাজারে সহজলভ্য Standardize পরীক্ষাগুলিও নিতে পারেন। এই পরীক্ষাগুলি বিভিন্ন প্রকার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের যেমন— স্বাভাবিক যোগ্যতা, বুদ্ধি, প্রাধান্য, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি নির্ধারনের ক্ষেত্রে সহজলভ্য। প্রদেয় জনসংখ্যার পূর্বোল্লিখিত পরীক্ষা তৈরি করা হয়ে থাকে। কিছু নিয়মের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট মানযুক্ত এটি এমন একটি পরীক্ষা যেখানে পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি এবং স্কোরিং নির্দিষ্ট করা থাকে, সুতরাং সংক্ষেপে একই পরীক্ষা বিভিন্ন সময়ে এবং স্থানে একই ধরনের জনগনের ক্ষেত্রে নেওয়া যেতে পারে।

সুতরাং নির্ধারিত মান অনুযায়ী গ্রহণীয় পরীক্ষা (Standardize test) হল নিয়ম/আদর্শ ভিত্তিক (norm referenced) পরীক্ষা। এই পরীক্ষাগুলি — ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে, স্কুলে, এলাকা অথবা রাজ্যের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করে। বড় জনসংখ্যার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের তুলনা করা যায়। শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষার মতোই এই পরীক্ষাগুলিও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন— বৈধতা, বিশ্বস্ততা, বিষয়মুখীতা, কার্যকারিতা—কে পরিপূর্ণ করে। যদি কোন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিজে নির্ধারিত মানের পরীক্ষার (Standardize test) বিকাশ ঘটাতে চান তাহলে তিনি নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করবেন :

১। পূর্ব নির্ধারিত নকশা (Planning)

২। প্রস্তুতকরণ (Preparation)

৩। চেষ্টা করা (Try out)

৪। আদর্শ/নিয়ম তৈরি (Preparation of Norms)

৫। পরীক্ষার নির্দেশ গ্রন্থ / পুস্তিকা তৈরি হাতিয়ার (Tools) পরিচালনার নির্দেশ তথ্যের মান নির্ধারণ এবং তথ্যের ব্যাখ্যা।

৪.৫ আত্ম প্রতিবেদনমূলক পদ্ধতি (Self Reporting Techniques)

এই অধ্যায়ের শুরুতেই, আমরা বলেছি যে পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে ছাত্রদের সম্পর্কে নিজের কৃতিত্ব অথবা সম্মিলিত কৃতিত্ব থেকে পরোক্ষভাবে সংগৃহীত তথ্য আছে। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট অবস্থা আছে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে তথ্যগুলি তাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ — যে বিষয় ছাত্রের নিজস্ব জীবন অথবা তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি / প্রত্যক্ষভাবে তার কাছ থেকে পাওয়া। এইভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়নের পদ্ধতিকে আত্ম-অনুলিখনমূলক (Self-reporting) পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি হল—প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার তালিকা।

৪.৫.১ প্রশ্নমালা (Questionnaire)

প্রশ্নমালা হল মূল্যায়নের সাধারণভাবে প্রচলিত পদ্ধতি। শিক্ষাজগতে অনেক গবেষকরা মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নতালিকার সাহায্য নেন। এটা শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে প্রচলিত জিনিস যার সাহায্যে ছাত্রকে প্রশ্ন করে কাঙ্ক্ষিত উত্তর পাওয়া যায়। একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলি লিখিত আকারে জানান এবং ছাত্রও লিখিত আকারে উত্তর দেয়। এই লিখিত আকারের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলিকে বলা হয় প্রশ্নতালিকা পদ্ধতি। একটি প্রশ্নতালিকার মধ্যে প্রধানত দুটি অংশ থাকে। প্রথম বিভাগে থাকে ছাত্র সম্পর্কে সাধারণ তথ্য। প্রশ্ন তালিকার সাধারণ তথ্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকে।

- ছাত্রের নাম
- শ্রেণী ও বিভাগ (Class & Section)
- বয়স
- লিঙ্গ

জনসংখ্যা সংক্রান্ত / জনতাত্ত্বিক বিবরন

- আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট
- শহর গ্রাম
- সাধারণ, তপশিলী জাতি, উপজাতি
- প্রদেশ রাজ্য, অঞ্চল, স্থানীয় এলাকা ইত্যাদি
- বিবাহিত/অবিবাহিত

উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ব-নির্ধারিত প্রশ্নতালিকার উপর ভিত্তি করে উত্তরদাতার কাছ থেকে সাধারণ তথ্যগুলি জিজ্ঞাসা করা হয়। দ্বিতীয় ভাগে থাকে প্রশ্ন। প্রশ্ন তালিকার প্রশ্নগুলি তিন ধরনের হয়। যেমন— খোলা (open), সীমাবদ্ধ (closed) এবং উভয় (both)

ক্রমান্বয়ে এই প্রশ্ন তালিকাকে বলা হয়—

- Open-ended প্রশ্নতালিকা

● Closed ended প্রশ্নতালিকা

● উভয়

(ক) Open ended প্রশ্নতালিকা—

এই প্রশ্নতালিকার উত্তর ছাত্র তার নিজের ভাষায় দিতে পারে। এই ধরনের প্রশ্নকে open ended প্রশ্নতালিকা বলা হয়। এখন আমরা এই প্রশ্ন তালিকার ধরন/প্রকৃতি দেখব।

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে বিশেষ শিক্ষন পদ্ধতির ক্ষেত্রে RCI-এর ভূমিকা কি/ কতটা হওয়া উচিত।

উত্তর ঃ

(খ) Close ended প্রশ্নতালিকা—

অপরদিকে কিছু প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' মাধ্যমে আগে থেকেই দেওয়া থাকে। উদাহরণ—প্রঃ সাধারণ স্কুলের অত্যাবশ্যক পাঠে একজন বিশেষ শিশুর অন্তর্ভুক্তিকরণ হওয়া কি উচিত ? যে কোন একটিতে দাগ দাও।

(ক) হাঁ, (খ) না, (গ) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে উত্তরদাতা কেবলমাত্র একটি √ চিহ্ন দিয়ে তার উত্তর জানাতে পারেন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই প্রশ্নতালিকায় open ended এবং close ended দুই ধরনের প্রশ্নই থাকে। প্রশ্নতালিকাকে বলা যেতে পারে নিজের সম্পর্কিত বর্ণনামূলক তালিকা। এই তালিকা ব্যবহার করা হয় ছাত্রের পূর্ব অভিজ্ঞতা, বর্তমান কার্য, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, মনোভাব, মতামত জানার জন্য।

৪.৫.২ সাক্ষাৎকার তালিকা (Interview Schedule)

সাক্ষাৎকার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বিভিন্ন কাজে / চাকরীতে কর্মীর মনোনয়ন, উন্নতিলাভ, পেশাদার বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আত্ম প্রতিবেদন / বিবরনমূলক পদ্ধতিগুলোর (Self reporting technique)-এর মধ্যে এটি একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীরা মুখোমুখি পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেন। যে ব্যক্তি সাক্ষাৎকারের আয়োজন করেন তাকে বলা হয় interviewer এবং যাকে সাক্ষাৎ করতে বা Interview দিতে ডাকা হয় তাকে বলা হয় interviewee প্রধানতঃ দুই ধরনের সাক্ষাৎকার আছে—

১। গঠনমূলক সাক্ষাৎকার

২। অগঠনমূলক সাক্ষাৎকার

১। গঠনমূলক সাক্ষাৎকার

এই ধরনের সাক্ষাৎকারে interviewer পূর্বে নির্ধারিত বা আগে থেকে তৈরি একগুচ্ছ প্রশ্নের সাহায্যে সাক্ষাতের আয়োজন করেন। এই প্রশ্নগুচ্ছগুলিকে অন্যথায় interview schedule বলা হয়। এই সাক্ষাৎকার

তালিকা যিনি প্রথম সাক্ষাৎকার আয়োজন করেন অথবা পরিচালনা করেন সেইসব শিক্ষক শিক্ষিকাদের খুব সাহায্য করে।

২। অগঠনমূলক সাক্ষাৎকার

পেশাদারী যোগ্যতাসম্পন্ন Interviewer দের পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নের প্রয়োজন হয় না। যদি Interviewer এর কাছে সাক্ষাৎকার পরিচালনার সময়ে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্ন না থাকে তাহলে তাকে বলা হয় অগঠনমূলক Interview।

এই সাক্ষাৎকার পদ্ধতির সুবিধাগুলি নিম্নরূপ—

* এটি Interviewer-এর কাছে নমনীয়তা দেয়।

* সাক্ষাৎপ্রার্থীকে প্রশ্নের ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেয়।

* সাক্ষাৎপ্রার্থীকে তার উত্তর পুনর্বিবেচনার সুযোগ প্রদান করে।

* Interviewer খুব কাছে থেকে সাক্ষাৎপ্রার্থীকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং তার মতামত বা অনুভূতি লিখে নিতে পারেন।

* সাক্ষাৎকার পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল—

* এটি খুব বেশি সময় সাপেক্ষ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে Interviewer প্রার্থীর কাছ থেকে তথ্য জেনে নিতে অনেক সময় নেন।

* প্রার্থীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নির্ধারিত মানের হয় না। ফলস্বরূপ সঠিক বিচারে আসা খুব কঠিন হয়ে ওঠে।

* অনেক সময় প্রার্থীর কৃতিত্বের বিচারে Interviewer-এর নিজস্ব পক্ষপাত প্রভাব বিস্তার করে।

* কিছু সময় একজনের বেশি Interviewer থাকলে একজন অন্যজনের বিচারের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উপরিউক্ত অসুবিধা সত্ত্বেও সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে একজনের সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতির ফল নির্ভর করে একজন Interview এর দক্ষতার উপর।

৪.৬ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observational Techniques)

অনেক সময় শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন এবং মূল্যায়নের জন্য তা তালিকাভুক্ত করে রাখেন। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ শিক্ষককে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয়। সর্বাধিক ব্যবহৃত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি হল—anecdotal record (কাহিনী সংক্রান্ত তথ্য), রেটিং স্কেল এবং যাচাই তালিকা।

৪.৬.১ ঘটনা/কাহিনীর নথি (Anecdotal Records)

শিক্ষক হিসেবে, আপন অবশ্যই শিক্ষা শিক্ষন পদ্ধতির সময় বিভিন্নভাবে কিছু ছাত্রছাত্রীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ—একজন পদার্থবিদ্যার শিক্ষক পরীক্ষাগারে কাজের সময় লক্ষ্য করবেন যে— রমেশ তার নিজের যন্ত্রপাতি ঠিকমতো তৈরি করার ক্ষেত্রে দক্ষ নয় এবং খুব ধীরগতি, যেখানে দীনেশ তার পরীক্ষা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করেছে এবং অন্যদের সাহায্য করছে। অন্য একটি উদাহরনে একজন ছাত্র দলগত কাজে অংশগ্রহণে নিজেকে সরিয়ে রাখে এবং এড়িয়ে চলে। প্রতিদিনের কিছু কিছু ঘটনা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ছাত্র কিভাবে আচরণ করে তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। এই ধরনের আচরণ মূল্যায়নকারীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা যায় না, কিন্তু প্রতিদিনের ঘটনা অথবা কাহিনীর মাধ্যমে—(যা শিক্ষক শিক্ষন পদ্ধতির মধ্যে স্থান লাভ করে) পর্যবেক্ষণ করা যায়। তথ্য কাহিনীর / ঘটনার নথির মাধ্যমে পাওয়া যায় বলে একে Anecdotal record বলে। প্রতিটি কাহিনী অথবা ঘটনার ঘটার পরই সংক্ষেপে বিবরণ দেওয়া হয়। ঘটনার বিবরণ আলাদা আলাদাভাবে নথিভুক্ত করা হয় যা ৪.১-এ দেখানো হয়েছে, অথবা প্রতিটি ছাত্রের জন্য নোটবই-এর আলাদা আলাদা পৃষ্ঠায় রাখা হয়। একটি ভালো anecdotal তথ্যের নথির মধ্যে একটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ থাকে যা আচরনের ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা (Gronlund)।

শ্রেণী—নবম | ছাত্র- অমিতাভ সেন

তারিখ- ৫.৫.২০০১ | স্থান- শ্রেণীকক্ষ

পর্যবেক্ষক- ইংরাজীর শিক্ষক

ঘটনা- এটা ছিল ইংরাজীর ক্লাস। ইংরাজীর শিক্ষক তাঁর পাঠ শুরু করার জন্য তৈরি ছিলেন। অমিতাভ উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং শিক্ষককে তার লেখা একটি ছোট গল্প পড়বে বলে অনুরোধ করেছিল। সে যখন পড়ছিল, তার স্বর খুব আস্তে ছিল এবং এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। ঐ সময় তার সহপাঠী রমেশ তাকে পুনরায় জোরে পড়ার জন্য অনুরোধ করে। অমিতাভ তা প্রত্যাখ্যান করে।

ব্যাখ্যা - অমিতাভ ইংরাজীতে ভালো, বিশেষতঃ ছোট গল্প লেখার ক্ষেত্রে। সে একজন সৃষ্টি করার শক্তি বিশিষ্ট বালক। তথাপি সে যখন ক্লাসে তার লেখা গল্প উপস্থাপন করছিল মনে হচ্ছিল লাজুক এবং দুর্বল।

এই পদ্ধতি ব্যবহার করে একজন শিক্ষক দীর্ঘসময় ধরে আচরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনার নথি রাখতে পারেন, যা ভালোভাবে মূল্যায়ন করা যায়। তিনি যে কোন আচরণ লিখে নিতে পারেন এবং ব্যাখ্যা করেন। কিছু সামাজিক এবং আবেগজনিত আচরণ যা আমরা উপেক্ষা করি বা অপ্রাসঙ্গিক বলে অবহেলা করি সেগুলির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে Anecdotal নথি ব্যবহার করা হয়। Anecdotal নথির প্রধান সীমাবদ্ধতা হল—তাদের সংরক্ষন করার জন্য অনেক সময়ের দরকার। এই নথির অপর সীমাবদ্ধতা হল—ছাত্রছাত্রীর আচরনের পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধকরণ করার সময় ব্যক্তি নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।

অ্যানেকডোটাল রেকর্ডের কার্যকরী ব্যবহার (Effective Use of Anecdotal Record)

Anecdotal Record-এর ফলপ্রসূ/কার্যকরী ব্যবহার—Gronlund (1981) এর ফলপ্রসূ ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত উপদেশগুলির প্রস্তাব দেন—

১। কি পর্যবেক্ষন করা হবে তা আগে থেকে নির্ধারণ করা হল কিন্তু অস্বাভাবিক আচরনের জন্য সতর্ক থাকা দরকার।

২। আচরণ অর্থপূর্ণ করতে অবস্থার যথোপযুক্ত পর্যবেক্ষণ এবং লিপিবদ্ধকরণ দরকার।

৩। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পর্যবেক্ষণের পরই ঘটনার নথি তৈরি করা।

৪। একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সীমিতভাবে লিপিবদ্ধ করা।

৫। ঘটনার বাস্তব তথ্যমূলক বর্ণনা এবং তার ব্যাখ্যা আলাদাভাবে রাখা দরকার।

৬। হ্যাঁ-মূলক এবং না-মূলক আচরণগত ঘটনাগুলির উভয় ক্ষেত্রের নথি রাখা।

৭। একটি নির্দিষ্ট আচরনের বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে তৎসংক্রান্ত অনেক Anecdot সংগ্রহ করা দরকার।

৮। Anecdotal নথি ঠিকভাবে লেখার অভ্যাস করা।

৪.৬.২ রেটিং স্কেল (Rating Scales)

একজন শিক্ষক হিসাবে একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষাগারে কাজ, আলোচনাসভা, বিতর্কসভা, বাইরের কাজ, Project-এর সাফল্য মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। এক্ষেত্রে আচরণগত ব্যবহারে উপস্থিত প্রতিটি বিভাগের স্তর নির্ধারনের চেষ্টা করা উচিত। অনেকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুণাবলী নিয়ে রেটিং স্কেল গঠিত। রেটিং স্কেল নিজেই একটি রিপোর্টিং মাধ্যম। যে শিক্ষন ফলাফলের মূল্যায়ন করা হবে তার ভিত্তিতে রেটিং স্কেল গঠন করা উচিত এবং এর ব্যবহার হওয়া দরকার একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে যেখানে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

বিস্তারিতভাবে রেটিং স্কেল তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) গাণিতিক রেটিং স্কেল (Numerical Rating Scales)

এই স্কেলে পর্যবেক্ষক উপস্থিত আচরনের স্তর সংখ্যার উপর গোল চিহ্নের মাধ্যমে চিহ্ন সূচিত করেন। প্রতিটি সংখ্যা একটি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেয়। রেটিং স্কেলে ৯, ৭, ৫ বা ৩ পয়েন্ট থাকে। সবচেয়ে বড়টি হল উচ্চমানের, ১ হল নিম্ন এবং অন্য সংখ্যাগুলি মধ্যবর্তী মানকে বোঝায়। নিম্নে একটি একটি ৫ পয়েন্ট রেটিং স্কেলের বিবরণ দেওয়া হল।

নির্দেশ : একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত কৃতিত্বের স্তরের পরিমাপকে যথাযথ নম্বরে গোল দিয়ে চিহ্নিত করা হল। নম্বরগুলি নিম্নলিখিত মান নির্দেশ করে—৫। অতি অসাধারণ, ৪। অসাধারণ, ৩। সাধারণ, ২। নিম্ন সাধারণ, ১। নিম্নমানের/সন্তোষজনক নয়।

১। স্কুলের বিকাশমূলক কাজে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ কতটা?

১ ২ ৩ ৪ ৫

এই রেটিং স্কেল তৈরি করা এবং ব্যবহার করা খুব সহজ। প্রধান অসুবিধা হল—নম্বরগুলি অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পক্ষপাতিত্ব ও ভুল-ত্রুটির কারণে ব্যাখ্যা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়।

(খ) লেখচিত্রের স্কেল (Graphic Scale)

এই স্কেলে আচরণের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য একটি অনুভূমিক রেখাকে অনুসরন করে। লাইনটি দুটি আলাদাভাবে ভাগ করা হয় অথবা নিরবচ্ছিন্ন একইরকম থাকে। বিভাগের সংখ্যা ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা আলাদা হয়। এই স্কেলের উদাহরণগুলি নিম্নে দেওয়া হল।

নির্দেশ ঃ ক্লাসে অঙ্কের শিক্ষক কতটা কার্যকরী ছিলেন তা √ চিহ্ন দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুভূমিক রেখা বরাবর স্তর চিহ্নিত করা হয়।

১। অঙ্কের শিক্ষক কতটা কার্যকরী ছিলেন?

খুব কার্যকরী । অল্প কার্যকরী। সাধারণ কার্যকরী। অল্প সাধারনের নীচে। চিন্তাকর্ষক একেবারেই কার্যকরী নয়।

(গ) বর্ণনামূলক লেখচিত্রের রেটিং স্কেল (Descriptive Graphic Rating Scale)

এই রেটিং স্কেল লেখচিত্র স্কেলে পয়েন্ট চিহ্নিতকরণের জন্য বর্ণনাধর্মী বাক্যাংশের ব্যবহার করে থাকে। বর্ণনা প্রতিটি পয়েন্টে অথবা মাঝখানে অথবা শেষ প্রান্তে হতে পারে। মতামতের জন্য নীচের বামদিকে জায়গা থাকে। নীচে একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

নির্দেশ ঃ নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর অনুভূমিক রেখার যে কোনো জায়গায় √ চিহ্ন দিয়ে তোমার রেটিং তৈরি কর। নির্দিষ্ট জায়গায় তোমার মতামত দাও।

১। শ্রেণীকক্ষ আলোচনায় ডেনিয়েল কতটা অংশগ্রহণ করেছিল?

অংশগ্রহণ করেনি	দলের অন্যদের মতো	অন্যদের তুলনায়
শান্ত ছিল, সক্রিয় ছিল না	অংশগ্রহণ করেছিল	অংশগ্রহণ বেশি ছিল।

রেটিং স্কেলের ব্যবহার (Uses of Rating Scale)

* রেটিং স্কেলের ব্যবহারকারী (Rater)-এর আকর্ষণীয়তা খুঁজে পান।
* কম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষ রেটিং স্কেলের ব্যবহার করতে পারেন।
* বেশি সংখ্যক উদ্দীপক নিয়ে রেটিং স্কেল ব্যবহার করা যায়।
* শিক্ষকদের আচরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা বা পরিদর্শনের রেটিং-এ রেটিং স্কেলের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়।

রেটিং স্কেলের সীমাবদ্ধতা (Limitation of Rating Scale)

রেটিং স্কেল বিভিন্ন ধরনের ত্রুটির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ত্রুটিগুলির মধ্যে ১। নিজস্ব পক্ষপাতিত্ব, ২। ফলাফলের বিস্তার, ৩। যুক্তিপূর্ণ ত্রুটি এবং ৪। সম্বন্ধের সান্নিধ্যজনিত ত্রুটি থাকে।

(ক) নিজস্ব পক্ষপাতজনিত ত্রুটি (Personal Bias Error)

রেটিং স্কেল নির্ধারিকের সাধারণ ঝোঁক থাকে স্কেলের উপর একজনের স্তরকে প্রায় একই অবস্থানে রাখার দিকে। কিছু নির্ধারক নিজের পক্ষপাতের কারণে স্কেলের উচ্চতর প্রান্তে √ চিহ্ন দেন। এটিকে বলা হয় উদারতাজনিত ত্রুটি। কিছু কিছু নির্ধারক আছেন যাঁরা একজনের মান / স্তরে স্কেলের উচ্চতর প্রান্তে যেতে ইতস্তত করেন, তাঁদের আগ্রহ থাকে প্রত্যেককে মোটামুটি গড় মানে √ দিতে। একে বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রবণতা জনিত ভুল (Central tendency error)।

(খ) ফলাফলের বিস্তার (Hals Effect)

কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেটারের সাধারণ ধারণা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের মান নির্ধারনের ক্ষেত্রে (rating) প্রভাব বিস্তার করে। যদি ব্যক্তির উপর অনুকূল মনোভাব থাকে, তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে উচ্চমান দেন এবং বিপরীত হবে যদি মনোভাব প্রতিকূল হয়। এককের মধ্যে একগুচ্ছ বৈশিষ্ট্যের ত্রুটি অজ্ঞাত থাকে। এটি মান নির্ধারনের (rating) মূল্যের অবশ্যই সীমারেখা।

(গ) যুক্তি মূলক ত্রুটি (Logical Errors)

যুক্তি ত্রুটি বলতে বোঝায় যখন নির্ধারক (Rater) যখন অপেক্ষাকৃত বেশি সদৃশ অথবা কম সদৃশ বৈশিষ্ট্যের দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর উচ্চমান ধার্য করেন তখন তিনি মনে করেন যে তারা একটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যৌক্তিক সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ যদি উচ্চ সাফল্য/কৃতিত্বের জন্য শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা উচ্চ স্তরের বলে শিক্ষক মনে করেন কারণ তিনি আশা করেন দুটি বৈশিষ্ট্য (উচ্চসাফল্য এবং বুদ্ধিমত্তা) পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মনে করেন। এক্ষেত্রে সাফল্যের অন্যান্য কারণসমূহ উপেক্ষিত হওয়ার ফলে ভুল হতে পারে।

(ঘ) সম্বন্ধের সান্নিধ্যজনিত ত্রুটি (Proximity Error)

কোন কোন ক্ষেত্রে আচরনের বৈশিষ্ট্যগুলির এদের সঙ্গে অপরের নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার প্রবণতা থাকে। ফলস্বরূপ নির্ধারকের (rater) দুইক্ষেত্রেই একই মান ধার্য করার প্রবণতা থাকে। এই ত্রুটির কারণ দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সান্নিধ্য।

ফলদায়ক রেটিং-এর নীতি (Principles of Effective Rating) Gronlund (1981) ফলদায়ক রেটিং-এর নিম্নলিখিত নীতিগুলির উল্লেখ করেন।

১। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির শিক্ষামূলক তাৎপর্য থাকা উচিত।

২। বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণযোগ্য হওয়া উচিত।

৩। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি এবং স্কেলের স্থানগুলির পরিষ্কার উল্লেখ থাকা উচিত।

৪। নির্ধারকদের কাছে নির্দেশ থাকা উচিত— যেখানে বিচার অযোগ্য অনুভব করবেন, সেখানে রেটিং এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

৫। যদি সম্ভব হয় বিভিন্ন পর্যবেক্ষকদের রেটিং একত্রিত করা উচিত।

৪.৬.৩ যাচাই স্কেল (পরীক্ষা করার তালিকা মিলিয়ে নেওয়ার) (Check Lists)

কোন একজন রেটিং স্কেল এবং যাচাই তালিকার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য পেতে পারেন। যদিও তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিচারের ধরনে পার্থক্য আছে। রেটিং স্কেল উপস্থিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মান বা স্তর চিহ্নিত করে। অন্যদিকে যাচাই তালিকা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি বা কাজ হয়ে তালিকাবদ্ধ করে। মূল্যায়নের পদ্ধতির জন্য Check list যখন যাচাই তালিকা তৈরি করা হয় তখন নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরন করা উচিত যা কতগুলি ক্রমিক ধাপ নিয়ে গঠিত।

* কাঙ্ক্ষিত কৃতিত্বের প্রতিটি নির্দিষ্ট ঘটনার পরিষ্কার উল্লেখ এবং চিহ্নিতকরন।
* ঐ সমগোত্রীয় সাধারণ ত্রুটিগুলি একই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা।
* কাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলির কাজের প্রত্যাশিত সংগঠিত হওয়ার সম্ভাব্য ক্রমিক তালিকা তৈরি করা।
* প্রতিটি ঘটনা যেমন ভাবে ঘটছে তার যাচাইকরণের জন্য সহজ পদ্ধতি থাকা দরকার।

(অথবা যদি উপযুক্ত মনে হয় তবে ক্রমানুসারে, সংখ্যা দিয়ে যুক্ত)।

পদ্ধতির মূল্যায়ন ছাড়াও উৎপাদ বা ফলাফলের মূল্যায়নে যাচাই তালিকা ব্যবহার করা যায়। চূড়ান্ত ফলাফলের যে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সেই বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে যাচাই তালিকা গঠিত হওয়া দরকার।

যাচাই তালিকার উদাহরণ

অঙ্কের দক্ষতার যাচাই তালিকা ঃ

প্রাথমিক স্তর

নির্দেশ ঃ দক্ষতার প্রদর্শন হয়েছে কিনা তা 'হ্যাঁ' অথবা 'না' তে গোল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করুন।

হ্যাঁ না ১ ঃ ০ থেকে ১০ সংখ্যা সনাক্ত করা

হ্যাঁ না ২ ঃ ১০ পর্যন্ত গোনা

হ্যাঁ না ৩ ঃ ১ থেকে ১০ পর্যন্ত বিষয়সমূহ দলবদ্ধ

হ্যাঁ না ৪ ঃ মৌলিক জ্যামিতিক আকার চিহ্নিত করা (বৃত্ত, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ)

হ্যাঁ না ৫ ঃ মুদ্রা চিহ্নিত করা

হ্যাঁ না ৬ ঃ বিষয়/জিনিসের তুলনা এবং বড়-ছোট, লম্বা, বেঁটে, হালকা-ভারী-এর চিহ্নিতকরন

হ্যাঁ না ৭ ঃ ১০টি জিনিসের একটি শ্রেণীর পূরণবাচক সংখ্যা বল (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি)

হ্যাঁ না ৮ ঃ ১ থেকে ১০ সংখ্যা দেখে লেখা

হ্যাঁ না ৯ ঃ আধঘন্টা সময় বলা

হ্যাঁ না   ১০ ঃ একটি এলাকার অর্ধেক চিহ্নিতকরণ

উৎস ঃ Gronlund (1981)

ব্যক্তিত্ব, সামাজিক সমন্বয় সাধন, আবেগজনিত, পরিপক্কতা ইত্যাদির মূল্যায়নে যাচাই তালিকা ব্যবহারযোগ্য নয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে রেটিং স্কেলের ব্যবহার বেশি উপযুক্ত।

৪.৭ রিপোর্ট কার্ড (Report Cards)

বিশেষ প্রশিক্ষণ বা শিক্ষার ক্ষেত্রে, মূল্যায়ন বা পরীক্ষার ফল তাদের অর্থবহও তাৎপর্যকে ধরে রাখে যখন পরীক্ষার ফল বিভিন্ন ব্যবহারকারীকে যেমন- ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালক, নিয়োগকর্তা ইত্যাদি জানানো হয়। সুতরাং পরীক্ষার ফলাফল একটি তালিকাভুক্ত ছকের মাধ্যমে জানানো উচিত যা হবে অর্থপূর্ণ, বোঝার উপযুক্ত এবং ব্যবহারের যোগ্য।

৪.৭.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপাদানসমূহ (Components of the Assessment Report)

যদিও পরীক্ষার ফলাফলের প্রতিবেদন ছক অথবা নকশা স্কুলের সঙ্গে স্কুলের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং স্থানানুযায়ী আলাদা হলেও ছকের বিভাগগুলি প্রধানতঃ একই থাকে। পরীক্ষার ফলাফলের রিপোর্টের বিভাগগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

(ক) **Student background : ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা-সংস্কৃতি ঃ**

মূল্যায়ন রিপোর্টের প্রথম বিভাগে সাধারণতঃ ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কিত তথ্য থাকে। তথ্যগুলির মধ্যে থাকে ছাত্রের নাম, বয়স, জন্মতারিখ, বাবা, মা, ভাইবোন সম্পর্কিত তথ্য ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনা, স্বাস্থ্য, বিকাশগত ইতিহাস (তথ্য), সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি। এই তথ্যগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য একজন ছাত্রকে সঠিক ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করা।

(খ) **Reason for Referral** এই বিভাগের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের আচরণের নির্দিষ্ট কিছু বিষয় যা পিতামাতা অথবা শিক্ষাজগতের পেশাদারদের সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলি অবশ্যই স্থান লাভ করে। এই কারণে এই বিভাগে রিপোর্ট লেখক (Report writer) কারণ বিবেচনার জন্য আচরণগুলির নির্দিষ্ট বর্ণনা দেন। উল্লিখিত আচরণগুলি অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিতার্থক বা সন্দেহজনক যেমন—" শ্রেণীকক্ষে খারাপ আচরণ' অথবা "দুর্বল পঠন" শব্দে রিপোর্টিং পাঠকের কাছে কোনও তথ্য প্রেরণ করতে পারে না।

(গ) পরীক্ষার **পরিবেশ** (Testing Environment) ঃ পরীক্ষার পরিবেশ ফলাফলে অবশ্যই উল্লেখ থাকবে কখন, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতির মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল। পরীক্ষার পরিবেশ স্বাস্থ্যকর হওয়া উচিত যেমন- একটি বড় হলঘর, নীচের তলা এবং শান্ত ও সুস্থির। যদি সম্ভব হয় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং মানসিক প্রস্তুতির বর্ণনা দেওয়া।

(ঘ) ব্যবহৃত পরীক্ষার বর্ণনা (Description of Test used) ঃ পরীক্ষার রিপোর্টে ব্যবহারিক পরীক্ষার বর্ণনা মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত পরীক্ষা পদ্ধতির বর্ণনা থাকা উচিত এটি পরীক্ষার উদ্দেশ্য, পরীক্ষার প্রধান

বৈশিষ্ট্য, প্রয়োগের গুণাবলী/মূল্য এবং পরীক্ষায় উপস্থিত ত্রুটির পরিমাপকে অন্তর্ভুক্ত করে। তথাপি এটি পরীক্ষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে পারে না সুতরাং পাঠক বিহ্বল (হতভম্ব) হয়ে পড়েন।

(ঙ) **পরীক্ষার ফলাফল** (Tests Results) : ফলাফলের প্রতিবেদনে (Report) এই বিভাগে পরীক্ষার ফলকে গাণিতিক আকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানে নম্বর অথবা স্তর দেওয়া হয় এবং সার্বিক পরীক্ষা একটি স্থান অধিকার করে। বিভিন্ন ধরনের স্কোর যেমন— দক্ষতার স্কোর / নম্বর, শতকরা প্রাপ্ত নম্বর ইত্যাদি এই বিভাগে গাণিতিক ভাবে উল্লেখ করা থাকে। পরীক্ষার নিয়মকানুনের, মধ্যে থাকে ছাত্রছাত্রীদের কাজের খাতাপত্র এবং নম্বরের তালিকা যা রিপোর্ট লেখকের দ্বারা (Report writer) ব্যবহৃত হয় এবং এটি পরীক্ষার ফলের তালিকার সঙ্গে সংযুক্ত থাকা উচিত।

(চ) **পরীক্ষার বিশদ ব্যাখ্যা** (Test Interpretation) : পরীক্ষার বিশদ ব্যাখ্যা পরিষ্কার, সরল এবং উজ্জ্বল বা স্বচ্ছভাবে উল্লেখ করা উচিত। তাঁরা ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে এবং কোন স্তরে কাজ করেছে সহজবোধ্য শব্দে ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা দেবেন।

(ছ) **পরীক্ষার ত্রুটি** (Test Error) : পরীক্ষার ত্রুটির জন্য দায়ী বিষয়গুলি একজন ফলাফল প্রস্তুতকারকের চিহ্নিত করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ—ছাত্র পরীক্ষায় আড়চোখে তাকিয়েছিল, এটা বোঝায় যে ছাত্রের দৃষ্টিজনিত সমস্যা থাকার সম্ভাবনা আছে। এই ধরনের ঘটনাগুলির অবশ্যই চিহ্নিতকরণ করা থাকবে যাতে রিপোর্ট ব্যবহারকারীরা ঠিকভাবে ফলাফল বা ব্যাখ্যা করতে পারেন।

(জ) **সুপারিশ** / মতামত (Recommendations) : পরীক্ষার ফলাফলের রিপোর্টে একটি বিভাগ থাকা উচিত যেখানে লেখক নির্দিষ্ট বিবেচনা বা কার্যকলাপ সম্পর্কে মতামত দেবেন যা রিপোর্ট ব্যবহারকারীরাও বিবেচনা করতে পারেন। সুপারিশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত স্থান সংক্রান্ত মতামত, নির্দেশাবলী অথবা বিবেচনার বিষয়বস্তু ইত্যাদি। তিনি ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান নির্দেশমূলক কার্যাবলীর ব্যাপ্তি সম্পর্কে সুপারিশ করতে পারেন।

৪.৭.২ রিপোর্ট লেখা বা তৈরির সমস্যা ক্ষেত্র (Problem Areas in Report Writing)

গবেষকরা পরীক্ষার ফলের বা রিপোর্টে প্রায়ই দেখা যায় এমন কিছু নির্দিষ্ট ত্রুটি। এই ত্রুটিগুলিকে সমস্যা অনুবাদ/ব্যাখ্যা, পূর্বাভিমুখীনতা এবং যোগাযোগ এইভাবে বিভক্ত করেছেন।

(ক) **বিষয় সমস্যা :** বিষয় সমস্যা হল পরীক্ষার ফলাফলের রিপোর্টের বিষয় উপাদানের অন্তর্নিহিত জটিলতা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল সামান্য প্রাসঙ্গিকতা, অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি, অনুপযুক্ত গুরুত্ব প্রাধান্য এবং অনুপযুক্ত সনাক্তকরণ ও সুপারিশ। সামান্য প্রাসঙ্গিকতা বলতে বোঝায় সেই বক্তব্যগুলি / উক্তিগুলি যা রিপোর্টের মধ্যে যোগ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ—একটি পরীক্ষার ফলের রিপোর্টে বলা আছে যে ছাত্রের চুল কোঁকড়ানো এবং জিহ্বা অনুভূমিক। এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় তথ্যের অনুরূপ রিপোর্টে থাকা উচিত নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় তথ্য রিপোর্টে অনুপস্থিত থেকে যায়। অনুপযুক্ত প্রাধান্য বলতে বোঝায়— অপ্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন তথ্য রিপোর্টে গুরুত্ব পেয়ে যায়। সংগৃহীত মূল্যায়িত তথ্যের

উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট লেখক বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ বা মতামত তৈরি করেন। সুপারিশগুলি বা মতামতগুলি কাল্পনিক হওয়া উচিত নয়।

(খ) ব্যাখ্যা করার সমস্যা (Problems of interpretation) যদিও রিপোর্ট লেখক পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাখ্যা করে রিপোর্টে দেন, তবুও তাঁর ব্যাখ্যা করার সময় ত্রুটির সম্ভাবনা থেকে যায়। ব্যাখ্যার এই ধরনের ত্রুটিগুলি হল--অতি কাল্পনিক, চিহ্নিত করা নেই এমন অবাস্তব কল্পনা/বিবেচনা এবং অবাঞ্ছনীয় পার্থক্য। অতি কাল্পনিক ত্রুটি বা বেশি বিবেচনা যোগ্য ত্রুটি বলতে বোঝায়— যখন রিপোর্ট লেখক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিচার/বিবেচনা করেন না। অবাস্তব কল্পনা বলতে বোঝায়— যখন রিপোর্ট লেখক রিপোর্ট ব্যবহারকারীদের জন্য ঘটনা থেকে মতামতকে পরিস্কারভাবে আলাদা করেন না। অপর্যাপ্ত তফাৎ বলতে বোঝায় যে রিপোর্ট লেখক রিপোর্টে পর্যাপ্ত পার্থক্য না রেখে ব্যাখ্যা এবং বিবেচনাকে অতিরিক্ত সাধারণীকরণ করেন।

(গ) পূর্বাভিমুখীনতার সমস্যা (Problems of orientation) ঃ অনেক সময়, রিপোর্ট লেখক — রিপোর্ট লেখার সময় নিজস্ব তত্ত্ববিষয়ক / কাল্পনিক পূর্বাভিমুখীনতা অথবা বিশ্বাস পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হন পূর্বাভিমুখীনতার সমস্যার মধ্যে ব্যবহারিক নয়, প্রদর্শিত/অনাবৃতকরণ অতিরিক্ত প্রভুত্বব্যঞ্জক / বিশ্বাসযোগ্য, পরীক্ষা পূর্বাভিমুখীনতা বনাম ছাত্রের পূর্বাভিমুখীনতা, অতিরিক্ত তত্ত্ববিষয়ক এবং অতিরিক্ত অবস্তব অন্তর্ভুক্ত (Tallent 1980)।

(ঘ) যোগাযোগের সমস্যা (Problems of communication) ঃ ভাল পরীক্ষার ফলাফল ব্যবহারযোগ্য হবে না যদি তাঁরা পাঠকের কাছে অপর্যাপ্তভাবে রিপোর্ট দেন। লিখিত ফলাফলের রিপোর্টে পর্যাপ্ত পরিমানে লিখিত যোগাযোগের দক্ষতা প্রয়োজন। ভাল লেখা ফলাফলের রিপোর্ট পড়তে, বুঝতে এবং ব্যবহার করতে সুনিশ্চিত করে। (Lufting 1989)।

Tallent (1980) পরীক্ষার ফলাফলের রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যোগাযোগের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেন

(ক) অনুপযুক্ত শব্দের ব্যবহার—

* নির্দিষ্ট, সঠিক ভাষার ব্যবহার, সাধারণত্ব নয়।

* অপ্রয়োজনীয়, বহু অংশবিশিষ্ট শব্দের ব্যবহার না করা।

* দুর্বোধ্য ভাষা এড়িয়ে যাওয়া।

* সরল থেকে সহজবোধ্য ভাষার ব্যবহার।

* একঘেয়ে বাক্যাংশের পরিহার।

(খ) অস্পষ্ট, অনিশ্চিতার্থক ভাষা—

* অস্পষ্ট এবং/অথবা কল্পিত পরিস্থিতি পরিহার।

* অন্তর্নিহিত অথবা মনো বিশ্লেষনিক ভাষা এড়িয়ে যাওয়া এবং আচরণগত / প্রচলিত ভাষার ব্যবহার

* নতুন অথবা অপরিচিত পরিভাষা এড়িয়ে যাওয়া।
* ব্যাকরণগত জটিল বাক্য এবং শব্দ পরিহার কর।
* একাধিক অর্থযুক্ত উক্তি এড়িয়ে যাও।

(গ) অতি দীর্ঘ রিপোর্ট

* রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত এবং ঠিকঠাক হওয়া উচিত।
* বেশি শব্দযুক্ত রিপোর্ট এড়িয়ে যাওয়া দরকার।
* রিপোর্ট শেষ হওয়া উচিত যখন সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লিখিত হয়ে গেছে।
* অপ্রয়োজনীয়রূপে ফাঁপিয়ে তোলবার উপাদান এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

(ঘ) যান্ত্রিক এবং জটিল রিপোর্ট

* সরল এবং জমাটবদ্ধ তথ্য বুঝতে সহজ।
* গূঢ় এবং যান্ত্রিক লেখা পরিহার।
* অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ অতিরিক্ত যান্ত্রিক রিপোর্ট তৈরি করে।

(ঙ) ধরন

* রিপোর্ট শৈল্পিক অথবা সাহিত্যিক ধরনে ব্যবহার করা উচিত নয়।
* রিপোর্টে বাক্যালংকারপূর্ণ ভাষা এড়িয়ে যাওয়া উচিত।
* রিপোর্ট এবং উদাসীনতা ব্যতীত সংক্ষিপ্ত হবে। ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বারা অপ্রভাবিত এবং সংক্ষিপ্ত হবে।

(চ) সংগঠন

* রিপোর্ট সহজবোধ্য এবং সংগঠিত হওয়া উচিত।
* রিপোর্ট খণ্ডিত হওয়া উচিত নয়।
* প্রতিটি বিভাগের পূর্ববর্তী বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত
* বিভাগগুলির সঠিক পর্যায়ক্রম হওয়া উচিত।
* রিপোর্ট একটি কেন্দ্রীয় বিষয় বা ধরনকে দিয়ে লেখা উচিত।

(ছ) ছাঁটাই করা

* লেখকের ইতস্ততঃ করা উচিত নয় কিন্তু সঠিক বা উপযুক্ত সুপারিশ করবেন।
* যৌক্তিক উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে নিজস্ব বিশ্বাসে শেষ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

৪.৮ এককের সারাংশ (Unit Summary)

* আমরা মূল্যায়নের হাতিয়ার এবং পদ্ধতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করি।
* মূল্যায়নের পদ্ধতি মূলত সাবজেক্টিভ, অবজেক্টিভ এবং প্রোজেক্টিভ এই তিন পদ্ধতিতে বিভক্ত।

* শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে যে সব পরীক্ষা শিক্ষক তৈরি ও ব্যবহার করেন তাদের শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষা (Teacher made Test) বলে।
* প্রদত্ত জনবসতির/জনসংখ্যার জন্যে পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা আদর্শের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন পরীক্ষা (Standardized Test) গঠিত হয়।
* আত্ম প্রতিবেদনমূলক পদ্ধতির (Self-Reporting Technique) মধ্যে প্রশ্নমালা বা প্রশ্নতালিকা এবং সাক্ষাৎকার তালিকা অন্তর্ভুক্ত।
* প্রশ্নমালা মুক্ত এবং সীমাবদ্ধ পরিনতির বা উভয় প্রকারের হতে পারে।
* সাক্ষাৎকার সংগঠিত বা অসংগঠিত হতে পারে।
* পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি— কাহিনী/ঘটনা সংক্রান্ত নথি, রেটিং স্কেল এবং যাচাই তালিকা হতে পারে।
* মূল্যায়ন পত্রের উপাদানগুলি হল—শিক্ষার্থীর পশ্চাৎপট, পরীক্ষার পরিবেশ ব্যবহৃত পরীক্ষার বর্ণনা, পরীক্ষার ফল, পরীক্ষার ব্যাখ্যা, পরীক্ষার ভুল এবং পরামর্শ।
* রেটিং স্কেলগুলি হল—সংখ্যাগত, লেখচিত্র এবং বর্ণনাধর্মী লেখচিত্র রেটিং স্কেল।
* রিপোর্ট লিখনের সমস্যা ক্ষেত্রগুলি হল—বিষয় সমস্যা, ব্যাখ্যা প্রদানের সমস্যা, মানসিক অভিযোজনের সমস্যা এবং যোগাযোগের সমস্যা।

৪.৯ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। মূল্যায়ন পদ্ধতিতে মূল্যায়ন হাতিয়ার ও পদ্ধতির কাজ কি?

২। প্রোজেক্টিভ পদ্ধতি বলতে কি বোঝ? যে কোন দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষা ও নির্দিষ্ট মানযুক্ত পরীক্ষার পার্থক্য লেখ।

৪। আত্ম প্রতিবেদনমূলক পদ্ধতি কাকে বলে?

পার্থক্য লেখ — (ক) মুক্ত ও সীমাবদ্ধ পরিনতির প্রশ্নমালা, (খ) সংগঠিত ও অসংগঠিত সাক্ষাৎকার।

৫। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি বলতে কি বোঝ?

৬। টীকা লেখ—

(ক) কাহিনী/ঘটনা সংক্রান্ত নথি

(খ) যাচাই তালিকা।

৭। রেটিং স্কেলের সংজ্ঞা দাও। উদাহরণ সহযোগে সংখ্যাগত ও রেখচিত্র রেটিং স্কেলের পার্থক্য লেখ।

৮। রেটিং স্কেলের সীমাবদ্ধতা লেখ।

৯। রিপোর্ট কার্ডের প্রয়োজনীয়তা কি? মূল্যায়ন পত্রের উপাদান সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১০। মূল্যায়ন রিপোর্ট লিখনের সমস্যাগুলি কি কি? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪.১০ বাড়ীর কাজ (Assignment)

১। প্রোজেক্টিভ পদ্ধতি কাকে বলে? যে কোনো দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। শিক্ষকের তৈরি পরীক্ষা ও নির্দিষ্ট মানযুক্ত পরীক্ষার পার্থক্য লেখ।

৩। রেটিং স্কেলের সংজ্ঞা দাও। উদাহরণ সহযোগে সংখ্যাগত ও লেখচিত্রমূলক রেটিং স্কেলের পার্থক্য নিরূপন কর।

৪.১১ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion)

৪.১২ উৎস (References)

1. Lufling Richard | .. (1989) *Assessment of Learners with Special Needs.* Boston : Allyn and Bacon.

2. Gronlund. N. E. (1981) *Measurement and Evaluation in Teaching 4th ed.* New York : McMillan.

3. Publishing Co.

4. Tallent. N. (1980) *Report Writing in Special Education.* New Jersey : Prentice-Hall.

5. Thorndike, R. L. and E. Hagen. *Measurement and Evaluation in Psychology and Education 4th ed.*

6. New York : John Wiley and Sons.

S.E.C.P. - 03
BLOCK - 04
Methods and Techniques of Class Room Research

শিক্ষামূলক পরিকল্পনা এবং পরিচালনা, পাঠক্রম রচনা ও গবেষণা

শ্রেণীকক্ষ গবেষণার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (Methods And Techniques of Class-room Research)

সূচনা : প্রকৃত জ্ঞান অভীষ্ট লক্ষ্য, পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা এবং সাধারনীকরণের উপর ভিত্তি করে অর্জিত হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষামূলক এবং শ্রেণীকক্ষ গবেষণার বিস্তারের জন্য একটি পরিকল্পিত এবং পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টা জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে জারি রয়েছে যাতে বুনিয়াদি এবং মাধ্যমিক শিক্ষা, পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকের উন্নয়নের জন্য গবেষণা, মূল্যায়ন পদ্ধতির মান উন্নয়ন করা যায়। এই অধ্যায়ে শিক্ষকদের বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের দ্বারা ব্যবহৃত শ্রেণীকক্ষমূলক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অভিযোজিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

একক ১ ☐ শিক্ষামূলক গবেষণার ধারণা, প্রকৃতি এবং প্রয়োজন (Concept Nature and Need of Research in Education)

গঠন

1.1 ভূমিকা

1.2 উদ্দেশ্য

1.3 শিক্ষা গবেষণার ধারণা

1.4 শিক্ষামূলক গবেষণার প্রকৃতি

1.5 শিক্ষা গবেষণার প্রয়োজন

1.5.1 শিক্ষামূলক গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

1.5.2 শিক্ষামূলক গবেষণার প্রয়োজন

1.6 শিক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ

1.6.1 প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

1.6.2 প্রাথমিক শিক্ষা

1.6.3 মাধ্যমিক শিক্ষা

1.6.4 উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা

1.6.5 কৃষি ও কারিগরী শিক্ষা

1.6.6 বিধিমুক্ত

1.6.7 শিক্ষাদান প্রক্রিয়া/পদ্ধতি

1.6.8 শিক্ষামূলক গবেষণার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ

1.7 বিশেষ শিক্ষা

1.8 ভারতে শিক্ষামূলক গবেষণার উন্নতি/বৃদ্ধি

1.9 শিক্ষামূলক গবেষণার ক্রমোন্নয়ন

1.9.1 শিক্ষামূলক গবেষণার সমস্যাবলী

1.9.2 শিক্ষামূলক গবেষণার মান-উন্নয়ন

1.10 এককের সারাংশ

1.11 অগ্রগতির মূল্যায়ন

1.12 বাড়ীর কাজ

1.13 আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

1.14 উৎস

1.1 ভূমিকা (Introduction)

মানুষ তার জ্ঞান ও জ্ঞানের ব্যবহার করার ক্ষমতার জন্য জন্তুদের থেকে পৃথক। এই জ্ঞান প্রধানত বিভিন্ন বিষয় এবং তত্ত্ব নিয়ে গঠিত। কেবলমাত্র এই জ্ঞানের জন্য কোনো একটি বিশেষ পরিস্থিতি আমরা বুঝতে পারি, নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি, অথবা খাপ খাওয়াতে পারি। কেবলমাত্র এই জ্ঞানের জন্য আমরা ক্রমাগত উন্নয়ন, আবিষ্কার এবং সৃজনশীলতার পথে চলেছি, যেখানে গবেষণা হল সেই পথের একমাত্র বাহন। এছাড়া জ্ঞানের অন্যান্য উৎস হল— ধারণ বিশ্বাস অথবা অপরীক্ষিত সামান্যীকরণ, কিন্তু এইভাবে অর্জিত জ্ঞানের উপর ভরসা করা যায় না। পারতপক্ষে, বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান উদ্দেশ্য, পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা এবং তার সামান্যীকরণ এর উপর ভিত্তি করে অর্জিত হয় জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাসমূহ—ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, অথবা শিক্ষার উন্নয়ন এবং প্রসারণের জন্য গবেষণা প্রয়োজন। গবেষণার প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে এই অধ্যায়ে আমরা গবেষণা কি? গবেষণার প্রকৃতি কি? এবং কেন শিক্ষা গবেষণার প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা করবো।

1.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

* গবেষণা ও শিক্ষামূলক গবেষণার ধারণা প্রদান।
* শিক্ষামূলক গবেষণার প্রকৃতি বুঝতে পারা।
* শিক্ষামূলক গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী বুঝতে পারা।
* শিক্ষা-গবেষণার প্রয়োজন জানা।
* শিক্ষামূলক গবেষণার বিভিন্ন দিকসমূহ চিহ্নিত করা এবং বর্ণনা করতে পারা।
* ভারতে শিক্ষামূলক গবেষণার বৃদ্ধি / বিস্তার জানা।
* শিক্ষামূলক গবেষণার সঙ্গে জড়িত সমস্যাবলী জানা।
* ভারতের শিক্ষামূলক গবেষণার সঙ্গে মান উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা।

1.3 শিক্ষা গবেষণার ধারণা (Research in Education : The Concept)

দৈনন্দিন জীবনে গবেষণা কথাটি ব্যবহার করেছেন। গবেষণা বলতে আপনি কি বোঝেন সেই সম্পর্কে আপনার ধারণা-

পর্যবেক্ষণ দ্বারা Research শব্দটি 'Re'-এবং 'Search' এই দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত ('Re'-again and again. Search --to explore something new) সাধারণভাবে গবেষণা হল জ্ঞানের অনুসন্ধান। এটি হল কোন একটি ঘটনার বারংবার (যা যে কোন ঘটনা, কোনো কিছু, যেকোন পদ্ধতি হতে পারে) তৎসংক্রান্ত বিশেষ তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের উপর বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

The Advanced Learner's Dictionary of Current English (1952) "a careful investigation or inquiry specially through search for new facts in any branch of knowledge."

Redman & Mory (1923) -- "Systematized effort to gain knowledge".

শিক্ষামূলক সমস্যা বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ হল 'শিক্ষামূলক গবেষণার (Education Research) ক্ষেত্র। এটি হল একটি সুপরিকল্পিত প্রয়াস যাতে শ্রেণীকক্ষের মধ্যে, বাইরে এবং ঘটমান শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাসমূহ অধিকতর ভালোভাবে বোঝা এবং তৎসংক্রান্ত দক্ষতা বর্ধন করা।

Travers (1958)-মতানুযায়ী—

Educational Research (E.R.) যারা শিক্ষাদক্ষতাদের কার্যসম্বন্ধীয় ঘটনাসমূহের বিজ্ঞান নির্ভর সংগঠিত জ্ঞান ভাণ্ডারের উন্নয়নের স্বার্থে নির্দেশিত কার্যাবলীকে সূচিত করে। মুখ্যত শিক্ষার্থীদের আচরণের ধরণ, বিশেষ করে যা শিক্ষামূলক প্রক্রিয়াতে শেখানো হবে। শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান নির্ভর জ্ঞান ভাণ্ডার জ্ঞানও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আকাঙ্খিত শিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান ও আচরণের অভীষ্ট পূরণের স্বার্থে শিক্ষকদের শিক্ষা বিষয় ও শিক্ষণ পরিস্থিতি, পরিবেশ নির্ধারণে সাহায্য করে।

Monroe (1950)--the final purpose of educational research is to ascertain principles and develop procedures in the field of education."

অর্থাৎ শিক্ষামূলক গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ এবং শিক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন করা।

যেহেতু শিক্ষা হল আচরণমূলক বিজ্ঞান সেইহেতু শিক্ষামূলক গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষা পরিকাঠামোতে মানব আচরণ বোঝা, ব্যাখ্যা করা, কিছুটা ভবিষ্যৎবাণীও নিয়ন্ত্রণ করা। এটি হল

বিজ্ঞানভিত্তিক সংগঠিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভান্ডার গড়ার প্রণালী/কার্যক্রম। এটি শিশুদের স্বভাব, তাদের বৃদ্ধি এবং তারা কিভাবে শেখে তৎসংক্রান্ত জ্ঞানার্জনে সচেষ্ট। এছাড়া এটি শিশুর ব্যক্তিত্ব, শিখন পদ্ধতি, আবেগজনিত বিকাশ, সামাজিক অভিযোজন ও দক্ষতা, শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন স্তর এবং প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ বুঝতে সচেষ্ট যা শ্রেণী কক্ষে শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে সাহায্য করে।

1.4 শিক্ষামূলক গবেষণার প্রকৃতি (Nature of Educational Research)

মানুষ সাধারণভাবে "বিজ্ঞান" শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হলে "বিজ্ঞান" কাকে বলে? সাধারণত বলতে পারেন না। নিম্নের দেওয়া জায়গায় আপনার বক্তব্য প্রকাশ করুন--

---

"বিজ্ঞান" বলতে আমরা বুঝি "Systematic body of knowledge and facts gathered through experimentation and / or scientific method." অর্থাৎ সংগঠিত জ্ঞানরাশি এবং বিষয়বস্তুসমূহ যা পরীক্ষণ এবং/অথবা বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত।

শিক্ষামূলক গবেষণামূলত শিক্ষাসংক্রান্ত এবং/অথবা শ্রেণীকক্ষের সমস্যা বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। এটি সত্যানুসন্ধানের জন্য গুরুত্ব আরোপ করে। এটি গবেষণার বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী এবং পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে।

বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি কিছু মৌলিক শর্ত/স্বীকৃত সত্যের উপর নির্ভর করে—

* এটি পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের উপর বিশ্বাস করে, কোন সাধারণ জ্ঞানের উপর নয়।
* এটি কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক এবং সম্পর্কিত ধারণাসমূহ ব্যবহার করে।
* এটি কেবলমাত্র অভীষ্টলক্ষ্য এবং নিরপেক্ষ সুবিবেচনাধীন বিষয়ের প্রতি দায়বদ্ধ।
* এটি কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক, যথাযথ এবং সঠিক মন্তব্যসমূহ করে থাকে।
* এটি গবেষণাধীন ঘটনার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে।
* এর মূল উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তৈরী করা।

পরিশেষে বলা যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উৎসাহ দেয় যুক্তিযুক্ত এবং বিষয়মুখী প্রচেষ্টাকে যা বিষয়মুখী পদ্ধতিও যুক্তিসংগত চাহিদার দ্বারা নির্দেশিত। এটি বিষয়মুখী, যুক্তিসংগত, সুপরিকল্পিত পদ্ধতি যা ব্যক্তি নিরপেক্ষ এবং কুসংস্কার মুক্ত।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রকৃতি—

যুক্তিসংগত এবং বিষয়মুখী ঃ শিক্ষামূলক গবেষণার প্রকৃতি যুক্তিসংগত এবং বিষয়মুখী। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় এটি কোনো ঘটনার কাল্পনিক এবং অযৌক্তিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে না। এটি সত্য এবং বিজ্ঞান নির্ভর নাও হতে পারে।

১। **সুপরিকল্পিত এবং সঠিক ঃ** শিক্ষামূলক গবেষণায় **শিক্ষা সম্পর্কিত** সমস্যাবলীর সুপরিকল্পিত এবং **সঠিকভাবে** অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ করা হয় এবং যতটা সম্ভব সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

২। **সামান্যীকরণ ঃ** শিক্ষামূলক গবেষণায় বৈজ্ঞানিকনীতি উদ্ভাবন এবং সামান্যীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় যার উপর ভিত্তি করে বিস্তৃত পরিসরে সমস্যাসমূহের সমাধান করা যায়।

৩। **বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বৈধতা ঃ** এটি শিক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেহেতু শিক্ষামূলক গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়, বৈধ পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তব তথ্য, বিশ্বাসযোগ্য ফলাফল সংগ্রহ করা হয় তাই শিক্ষামূলক গবেষণার তদন্তলব্ধ ফলাফল নির্ভরযোগ্য।

৪। **প্রত্যক্ষ তথ্যসংগ্রহ ঃ** শিক্ষামূলক গবেষণায় প্রত্যক্ষ অথবা প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে অন্যের বক্তব্যের উপর নির্ভর করা হয় না।

৫। **উদ্দেশ্যমুখী ঃ** শিক্ষামূলক গবেষণা ও উদ্দেশ্যমুখী, যেহেতু এখানেও নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানের উপর কাজ করা হয়।

৬। **আন্তর্শাখা সংযোগ ঃ** শিক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রেও যে কোনো শিক্ষামূলক সমস্যা অন্যান্য পৃথক বিষয় যেমন–মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, ইতিহাস, নৃতত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা পর্যালোচনা করা যায়।

৭। **ভবিষ্যৎবাণী ঃ** শিক্ষামূলক গবেষণা দ্বারা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ন্যায় শিক্ষামূলক ঘটনাবলীর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়।

৮। **শিক্ষামূলক গবেষণা পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার ন্যায় সম্পূর্ণ এক নয় ঃ** যেহেতু শিক্ষামূলক গবেষণা শিক্ষা পরিকাঠামোয় ব্যক্তির আচরণ নিয়ে গবেষণা করে এবং আচরণ হল খুবই জটিল এবং পরিবর্তনশীল ঘটনা, এমনকী একজন ব্যক্তি একই ধরনের পরিস্থিতিতে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন আচরণ করতে পারে, সেইহেতু শিক্ষামূলক গবেষণা পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় গবেষণার ন্যায় একইরকম নয়।

৯। **কেবলমাত্র শিক্ষাবিদদের বিষয় নয় ঃ** শিক্ষামূলক গবেষণা কেবলমাত্র সম্পূর্ণভাবে এবং বিশেষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের বিষয় নয়, পরন্তু শিক্ষার প্রেক্ষাপটযুক্ত যে কোন সংবেদনশীল গবেষক যেকোনো শিক্ষামূলক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করতে পারেন।

১০। **কারণ ও ফল সম্পর্ক ঃ** বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় শিক্ষামূলক গবেষণার বিভিন্ন শিক্ষামূলক

সমস্যাবলীর কারণ ও ফল (Cause and effect) নিয়ে আলোচনা করা হয়। যদি এই সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায় তবে অনেক শিক্ষা বিষয়ক সমস্যার সহজ প্রতিরোধ সম্ভব।

১১। **ব্যয়বহুল বিষয় নয় ঃ** বেশীর ভাগ শিক্ষামূলক এবং অথবা শ্রেণীকক্ষে গবেষণা ব্যয়বহুল বিষয়ে নয়। আমাদের সাধারণত উন্নতমানের পরীক্ষাগার অথবা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না, তুলনায় আমাদের প্রয়োজন স্বল্পব্যয়ের শিক্ষামূলক পরীক্ষা ও যন্ত্রসমূহ, কাগজ ও পেনসিল, গ্রন্থাগার, গবেষণা প্রকাশনের সুযোগ এবং বিষয়সমূহ। যেমন শিক্ষার্থী অথবা শিক্ষক যাদের শিক্ষামূলক সমস্যাবলীর পর্যালোচনা হয় এবং তার সমাধান হয়।

এক কথায় উপরের আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে শিক্ষামূলক অথবা শ্রেণীকক্ষ গবেষণা হল বিজ্ঞান এবং সাহিত্য যার প্রকৃতি হল বিজ্ঞান নির্ভর। শিক্ষামূলক গবেষণায় বিজ্ঞানের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু গবেষণা করা কেবলমাত্র বিজ্ঞান নয়, সাহিত্যও কারণ এই গবেষণা একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়, পরন্তু এখানে প্রয়োজন সমস্যা সম্পর্কিত সু-গভীর অনুধাবন, গবেষণা প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং গবেষণাকৃত সমস্যার অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন দক্ষতাপূর্ণ সমাধান। সুতরাং এখানে গবেষণা হল অধিকতরভাবে অন্তর্দৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা, সুব্যাপ্ত জ্ঞানরাশি এবং গবেষণামূলক দক্ষতার বিষয়বস্তু।

1.5 শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা (Need for Research in Education)

১৯১৩ সালে ভারতীয় শিক্ষা নীতি (Indian Education Policy) তে সর্বপ্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজন সরকারী প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থাপনের মাধ্যমে একটি সুপরিকল্পিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল যাতে বুনিয়াদি এবং মাধ্যমিক শিক্ষার বিকাশ, পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক এবং মূল্যায়নপ্রণালীর মানোন্নয়ন সম্ভব হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণার বিস্তারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা বা শ্রেণীকক্ষ গবেষণা ব্যবহার ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান প্রদানের জন্য অপরিহার্য যাতে শিক্ষাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করা যায় এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যপূরণ করা যায়।

1.5.1 শিক্ষামূলক গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী (Purposes of Education Research)

Progress

System

Economy

(ক) Progress : সকল গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল উন্নয়ন। যদি ভগবান আমাদের গবেষণার বুদ্ধিমত্তা না প্রদান করতেন তবে আমরা গৃহে বাসের পরিবর্তে গাছে বসবাস করতাম, ট্রেনে এবং বাসের যাতায়াতের পরিবর্তে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে যেতে হত, ই-মেল এবং ডাকঘরের মাধ্যমে খবরের আদান-প্রদানের পরিবর্তে পায়রাদের ব্যবহার করতে হত। শিক্ষা এবং ভাষা ব্যবহারে ক্ষমতা আমাদের জীবন ও জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করেছে। কোনো কিছুর উন্নয়ন সে বিষয় বা পরিস্থিতির পর্যালোচনা বা গবেষণা

ছাড়া অসম্ভব। একজন ব্যক্তি, একটি অঞ্চল বা জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির জন্য গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা আবশ্যিক। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি দেশ তার বর্তমান শিক্ষাগত মান, সীমাবদ্ধতা, ও ভুলভ্রান্তি এবং গুণমানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ তৈরির জন্য ধারাবাহিকভাবে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে। যা কেবলমাত্র শিক্ষামূলক গবেষণার মাধ্যমে সম্ভবপর সুতরাং শিক্ষামূলক গবেষণা মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মান বর্ধন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য জরুরী।

(খ) **System :** শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র একজন ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলা নয় পরন্তু তার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। গুণগত এবং সুপরিকল্পিত শিক্ষাই পারে এই উদ্দেশ্যপূরণ করতে। শিক্ষামূলক গবেষণার উদ্দেশ্যই হল এই ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে J. W. Best (1977) বলেছেন—"research is considered to be more formal, systematic, intensive process of carrying on the scientific method of analysis. It involves a more systematic structure of investigation, usually resulting in some sort of formal record of procedures and a report of results or conclusions."

(গ) **Economy :** সিদ্ধান্ত 'সুচিন্তিতভাবে বা চিন্তা ভাবনা না করে নেওয়া যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবে, চিন্তাভাবনাহীন সিদ্ধান্ত বিপথগামী করে এবং ব্যর্থতা বা হতাশা তৈরি করে। কিন্তু সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত কিছু নির্দিষ্ট কারণের ভিত্তিতে নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ—সুপরিকল্পিত গবেষণার সময়, অর্থ এবং শক্তি বাঁচায় এবং অনেক ব্যর্থতা ও হতাশা থেকে রক্ষা করে। এই মিতব্যয়িতা উন্নয়নের সাহায্য করে। শিক্ষামূলক গবেষণা আমাদের পরিচালিত করে এবং সফল হওয়ার পথে যথাযথ ও সঠিক পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে। যদি আমরা অন্ধভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করি তবে আমরা অধিক দূর যেতে পারবো না। গুণগত শিক্ষা ও উৎকর্ষ জীবনধারা এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা জরুরী।

শিক্ষামূলক গবেষণার উদ্দেশ্য অথবা শ্রেণীকক্ষ গবেষণার দ্বারা আর কি কি উদ্দেশ্য পূরণ করা যায় তা নিজের ভাষায় লিখুন—

____

____

____

____

____

____

1.5.2 শিক্ষামূলক গবেষণার প্রয়োজন (Need for Educational Research)

উপরিউল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী স্পষ্টভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিফলিত করেছে। যাই হোক এছাড়া অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়গুলি হল—

* তত্ত্ব গঠন করা, (Theory Building)
* শিক্ষাদান বিষয়ের/বিভাগের বিকাশ।
* শিক্ষার প্রসারণ।
* শিক্ষা ধারণার পরিবর্তন।

(ক) **তত্ত্ব গঠন করা (Theory Building) :** একটি বিভাগ/শাখা কতটা সুগঠিত তা নির্ভর করে তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমাহারের উপর। শিক্ষা যখন নিজেই একটি শাখা, তখন এটি অন্যান্য শাখা/বিভাগ—দর্শন, মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি থেকে তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত বিভাগের শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বলিষ্ঠ এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তৈরির প্রয়োজন আছে এবং এর জন্য অন্যান্য শাখার সঙ্গে আদান-প্রদানের সুযোগ কাজে লাগানো যেতে পারে। ফলস্বরূপ শিক্ষার সুযোগ বাড়বে এবং অর্জিত জ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, যা কেবলমাত্র শিক্ষামূলক গবেষণা দ্বারা সম্ভব।

(খ) **নিয়মানুবর্তিতার বিকাশ (Discipline Development) :** শিক্ষা একইসঙ্গে বিজ্ঞান ও কলা। বিজ্ঞান হিসাবে মানুষের শিক্ষণ প্রকৃতি এবং মন, এর বৃদ্ধি এবং বিকাশ, শিক্ষাদানে ফলপ্রসূ পরিকল্পনা গ্রহণ, বিভিন্নদেশে গৃহীত কর্মসূচী এবং প্রচলিত অনুশীলন প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানের বৃহৎ ভাণ্ডার অন্তর্ভুক্ত, যা বই এবং গবেষণা পত্রিকা সমূহে পাওয়া যায়। কিন্তু এটিই শেষ নয়, পরন্তু এটি হল কেবলমাত্র আরম্ভ বা সূচনা। অপ্রকাশিতকে প্রকাশ করার জন্য আরও অধিকমাত্রায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন। কলা হিসাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল অধিকতর ফলপ্রসূভাবে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের দান করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কিছু শিক্ষাবিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কিভাবে শ্রেণীকক্ষে সক্রিয় এবং ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করা যায়? কিভাবে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা যায়? শিক্ষকের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এইগুলি এবং একই ধরনের সমস্যাসমূহের উপর ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

(গ) **শিক্ষার প্রসারণ (Expansion of Education) :** শিক্ষাক্ষেত্র ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে, যার ফলস্বরূপ নানা প্রকারের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। Trial এবং Error পদ্ধতিতে বা সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এই সমস্ত সমস্যাসমূহের সমাধান খুবই ক্ষতিকর। সেইজন্য আমাদের শিক্ষামূলক গবেষণার খুবই প্রয়োজন যা বিভিন্ন প্রকার শিক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক সমাধানে সাহায্য করবে।

(ঘ) **শিক্ষা ধারণার পরিবর্তন (Changing Concept of Education) :** দ্রুতগতিতে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলস্বরূপ পুরানো পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকসমূহের শিক্ষণ পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রভৃতি পরিবর্তনের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এইসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যত্নশীল সতর্ক শিক্ষামূলক গবেষণা করার পরই উন্নয়নমূলক বিষয়সমূহ সংযোজিত করা যেতে পারে। সামাজিক এবং বৃত্তিমূলক চাহিদার ও দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। সেইহেতু বর্তমানে শিক্ষার কর্মমুখীকরণ (Vocationalisation of Education) এর উপর অধিকতর বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সেহেতু বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ এবং ফলপ্রসূ পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক গবেষণা আবশ্যিক।

অভিজ্ঞতা থেকে শ্রেণীকক্ষ গবেষণার প্রয়োজনের উপর আরও কিছু লিখুন—

____

____

____

____

____

1.6 শিক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ (Areas of Educational Research)

* প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।
* প্রাথমিক শিক্ষা।
* মাধ্যমিক শিক্ষা।
* উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা।
* কৃষি ও কারিগরী শিক্ষা।
* নন-ফর্মাল বা অপ্রচলিত শিক্ষা।
* শিক্ষাদান প্রক্রিয়া।

1.6.1 প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (Pre-Primary Education)

শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত জরুরী। কিছু গবেষণামূলক কাজের দ্বারা জানা গেছে, যে শিশুরা প্রাক-প্রাথমিকে যোগদান করেছে তাদের প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নয়ন অধিকতর ভালো। সেইহেতু পাবলিক এবং ব্যক্তিগত এবং সংস্থাসমূহের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য কাজ করা উচিত।

1.6.2 প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)

ভারতীয় সংবিধানের ৪৫ নং ধারা অনুযায়ী ৬-১৪ বছর বয়সের সব শিশুর জন্য শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা যায়নি। সুতরাং এই ব্যর্থতা বা শ্লথ উন্নয়নের সম্ভাব্য কারণসমূহ নির্ধারণ, অপচয় এবং থেমে যাওয়া রুখতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গবেষণার প্রয়োজন।

তফসিলিজাতি ও উপজাতি, গিফ্‌টেড এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহ তৈরি ও উন্নয়নের স্বার্থে শ্রেণীকক্ষ গবেষণাকে কাজে লাগাতে হবে।

1.6.3 মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education)

শ্রেণীকক্ষ-গবেষণাকে কৈশোরের শিক্ষামূলক সমস্যা সমূহের পর্যালোচনা করে মাধ্যমিক স্তরে প্রয়োজনীয়

পরিবর্তন ও তার প্রয়োগ স্বার্থে পরিচালিত করতে হবে। কোঠারি কমিশন (১৯৬৬)-এর সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবন নির্বাহের জন্য প্রশিক্ষিত দক্ষ মানবশক্তি তৈরী এবং তার বৃত্তিমূলক চাহিদা পূরণে সমর্থ/প্রয়াসী/সচেষ্ট হতে হবে। সুতরাং কিভাবে এই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব তা গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনে কতটা সাফল্যলাভ করেছে তা নিয়েও গবেষণা হওয়া উচিত। মাধ্যমিক স্তরে দূর শিক্ষার উন্নয়ন এবং বর্তমান অবস্থান নির্ণয়, বিকল্প শিক্ষা পরিকল্পনার উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের জন্য গবেষণা করা উচিত।

1.6.4 উচ্চশিক্ষা (Higher Education)

তথ্য ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বৈশ্বিক উন্নয়নে কিভাবে উচ্চশিক্ষাকে কাজে লাগানো যায় তা গবেষণার অনবদ্য বিষয়। কালেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিক্ষামূলক সমস্যাসমূহ নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা, নির্দেশনার মাধ্যম, পাঠ্যক্রমিক পুর্নগঠন, শিক্ষাদানের পদ্ধতি উন্নয়ন, স্ত্রী-শিক্ষা, গুণগত মান সুনিশ্চিতকরণ, গবেষণার সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা করা উচিত কারণ উচ্চশিক্ষায় এদের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য।

1.6.5 কৃষি ও কারিগরী শিক্ষা (Agricultural and Technical Education)

শিক্ষা কমিশন (১৯৬৬) এর সুপারিশ অনুযায়ী কৃষি ও কারিগরী শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার অংশ বিশেষ। সুতরাং আকাঙ্খিত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরীর স্বার্থে শ্রেণীকক্ষমূলক গবেষণাকে ব্যবহার করতে হবে যাতে কৃষি এবং কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে শিক্ষাদান করা যায়।

1.6.6 প্রথা বহির্ভুত শিক্ষা (Non-Formal Education)

প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রকার মনঃস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং বৃত্তিমূলক প্রয়োজন নির্ধারণ করে বিশেষ নির্দেশনামূলক বিষয়বস্তুর সাহায্যে দূর শিক্ষা, আংশিক সময়ের শিক্ষা, ক্রমপ্রবাহমান শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, গণ মাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষা, মানসিক অভিযোজন ওরিয়েন্টেশন এবং রিফ্রেসার কোর্স প্রভৃতি প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার দর্শন, উদ্দেশ্য ও পথ নিয়ে এবং বর্তমানে ভারতীয় সমাজ জীবনের চাহিদা পূরণে এটির কার্যক্ষমতা বিষয়ে গবেষণা জরুরী।

1.6.7 শিক্ষাদান পদ্ধতি (Teaching Process)

কার্যকরী শিক্ষা-শিক্ষণ পদ্ধতি ছাড়া কোন শিক্ষাই একটি ব্যক্তিকে শিক্ষিত করতে পারে না। শিক্ষককে অবশ্যই ব্যক্তি পার্থক্যসমূহকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তিনি একজন ভালো শিক্ষাবিদ এবং মনোবিশেষজ্ঞ হবেন। তাঁর কার্যক্ষম যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skills) এবং টিচিং দক্ষতা (Teaching Skills) থাকতে হবে, এবং তিনি সমাজ এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা ভালোভাবে বোঝার জন্য যথেষ্ট কল্পনাপ্রবণ এবং বুদ্ধিধর হবেন শিক্ষাদান যথেষ্ট গতিশীল হবে যাতে বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং শিক্ষামূলক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। কার্যকরী Teaching-learning পদ্ধতির আবিষ্কার বিকাশের জন্য শ্রেণীকক্ষ মূলক গবেষণা জরুরী।

1.6.8 শিক্ষামূলক গবেষণার শীর্ষক্ষেত্র সমূহ (Various Priority Areas of Educational Research)

শিক্ষা সীমাহীনক্ষেত্র এবং বহুশাখান্বিত বিষয়। এর ক্ষেত্রে উপাদান কঠোর এবং নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। সেইহেতু শিক্ষামূলক গবেষণার শ্রেণীবিন্যাস করা খুবই কঠিন বিষয়। যাইহোক, শ্রেণীবিন্যাসের এই সমস্যা কিছু সুগঠিত/গুরুত্বপূর্ণ/গবেষণাকে পৃথকভাবে নিজস্ব জায়গা দানের মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে। Buch (1991) যথাযথভাবে মন্তব্য করেছেন—শিক্ষামূলক গবেষণার বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সংযোগ থাকার কারণে শিক্ষা-গবেষণার শ্রেণীবিন্যাসকরণের মাধ্যমে একাধিক গবেষণার বিষয়কে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায়। পঁচিশ এর বেশী ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক এবং / অথবা শ্রেণীকক্ষ গবেষণা বহুবিধ শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিতে পরিচালিত করা হয়েছে।

১। শিক্ষা দর্শন।

২। শিক্ষা-ইতিহাস।

৩। সামাজিক শিক্ষা বিজ্ঞান।

৪। তুলনামূলক বিজ্ঞান।

৫। অর্থনীতি শিক্ষা।

৬। শিক্ষা মনোবিদ্যা।

৭। সৃজনশীলতা।

৮। সাহায্য ও পরামর্শ।

৯। পরীক্ষা ও পরিমাপণ।

১০। পাঠ্যক্রম।

১১। ভাষাশিক্ষা।

১২। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা।

১৩। গণিত শিক্ষা।

১৪। বিজ্ঞান শিক্ষা।

১৫। শিক্ষামূলক প্রযুক্তিবিদ্যা।

১৬। কোরিলেটস অফ্ অ্যাচিভমেন্ট।

১৭। মূল্যায়ন এর পরীক্ষা।

১৮। শিক্ষক শিক্ষা।

১৯। শিক্ষাদান।

২০। শিক্ষা পরিচালনা।

২১। প্রথাবর্হির্ভূত শিক্ষা।

২২। বয়স্ক শিক্ষা।

২৩। শৈশব শিক্ষা।

২৪। বুনিয়াদি শিক্ষা।

২৫। বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী শিক্ষা।

২৬। অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষা।

২৭। উচ্চতর শিক্ষা।

২৮। নারী শিক্ষা।

২৯। বিশেষ শিক্ষা।

একটি আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় দশাংশ বিশেষভাবে সক্ষম, যাদের বিশেষ ধরনের যত্ন করার কৌশল প্রয়োজন। মানসিক ও শ্রবণ অক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে বিশেষ ধরনের শ্রেণীকক্ষমূলক শিক্ষাদানের প্রয়োজন। সেইহেতু বিশেষ শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগ, আগ্রহ প্রয়োজন।

1.7 বিশেষ শিক্ষা (Special Education)

মানসিক অক্ষমতা বলতে কি বোঝায়?

____

____

____

____

American Association on Mental Retardation (AAMR-1977)-মতে "Mental Retardation refers to significantly subaverage general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behaviour and manifested during the development period."

উপরিউক্ত সংজ্ঞাতে দুটি মুখ্য সূত্র আছে—প্রথমত, মানসিক অক্ষম হিসাবে সনাক্তকৃত ব্যক্তির বুদ্ধিদীপ্ত কার্যকলাপ (IQ-70 অথবা কম) এবং অভিযোজনমূলক আচরণে ব্যাপক ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ত—বাধাগ্রস্ত বুদ্ধি এবং অভিযোজিত কাজকর্মের বহিঃপ্রকাশ বিকাশকালে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির ১৮ বছর বয়সের আগে এই সমস্যা প্রকাশ পায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম কঠিনক্ষেত্র হল মানসিক অক্ষম শিশুদের জন্য সঠিক শিক্ষা পরিবেশ তৈরী

করা। বিশেষ শিক্ষার লক্ষ্য হল এইসব শিশুদের শিক্ষাদান করা। পিতামাতা/অভিভাবক ছাড়াও বিদ্যালয়েরও দায়িত্ব বিশেষ শিক্ষার শিশুদের বিশেষ প্রয়োজন চিহ্নিত করা। এছাড়া এই শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত শিশুদের উন্নয়নের পর্যালোচনা করাও শিক্ষকদের কাজ। বিদ্যালয়ের প্রতিটি মানসিক অক্ষম শিশুদের যথাযথ শিক্ষাদান এবং আলাদাভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা (Individualized Educational Programme-IEP) করা উচিত। সব ধরনের অক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

মানসিক অক্ষম শিশুদের বিশেষ শিক্ষামূলক বিশেষ কর্মসূচী তৈরী করার জন্য তাদের—

(ক) Educable Mentally retarded (EMR)—শিখনযোগ্য মানসিক অক্ষম।

(খ) Trainable Mentally retarded (TMR)—প্রশিক্ষণযোগ্য মানসিক অক্ষম।

যাদের বুদ্ধাঙ্ক (IQ) ৫৫-৭০ তারা বিশেষ শিক্ষার পর তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ গ্রেড পর্যন্ত যেতে পারে। বিশেষ প্রশিক্ষকের উদ্দেশ্য হল তাদের স্বনির্ভর হতে/নিজেদের যত্ন নিতে সাহায্য করা। তাদের সামাজিক সক্ষমতা এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতা, ডোমেস্টিক স্কিলস, দৈনন্দিন সমস্যা যেমন টাকা পয়সার ব্যবহার প্রভৃতি কিভাবে সমাধান করা যায় সেই বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। TMR-এর দের বুদ্ধাঙ্ক (IQ) ২৫-৫৫ এর মধ্যে। এই কারণে তারা প্রশিক্ষণযোগ্য। তারা EMR-এর চেয়ে অধিকতর বাধাগ্রস্ত সেই কারণে এদের পাঠ্যক্রম আরও বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। TMR শিশুদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য (basic survival skills) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পরিধান, দাঁতমাজা, ভালোভাবে খেতে পারা এবং কিছু সাধারণ কাজকর্ম করতে পারা প্রভৃতি বিষয়ে শেখানো।

বিশেষ শিক্ষা মূলস্রোত শিক্ষা (maninstreaming) থেকে অধিকতর উপযোগী কিনা এখনও গবেষণার বিষয় এবং এখন সমাধান হয়নি। বিশেষ শিক্ষার মানসিক অক্ষম শিশুদের সম্পূর্ণভাবে শ্রেণী বিভাগ করে বিশেষ ধরনের পাঠক্রমে শিক্ষা দেওয়া হয়। মূলস্রোত শিক্ষায় তাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে একই শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান করা হয়। উভয় পদ্ধতিতে তাদের সাফল্য প্রায় একই রকমের। কিন্তু এটি নির্ভর করে ব্যক্তি পার্থক্যের উপর। যেখানে কিছু শিশুর জন্য বিশেষ শ্রেণীশিক্ষা এবং অন্যদের জন্য মূলস্রোত শিক্ষা অধিকতর ভালো।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

* মানসিক অক্ষমতা কি সারিয়ে তোলা যায়?
* মানসিক অসুস্থতার জন্যই কি মানসিক অক্ষমতা?
* বয়সের সাথে সাথে কি মানসিক অক্ষমতা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে?
* কিভাবে অভিভাবক তাঁদের শিশুদের মধ্যে মানসিক অক্ষমতা নির্ধারণ করেন?
* কিভাবে অভিভাবকরা মানসিক বাধাগ্রস্ত শিশুদের পরিচালন করতে পারে?
* আমরা কি মানসিক বাধাগ্রস্ত শিশুকে বাড়িতে শিক্ষা/প্রশিক্ষণ দিতে পারি? যদি হ্যাঁ কিভাবে?
* মানসিক অক্ষমতা কি প্রতিরোধ করা যায়?

1.8 ভারতে শিক্ষামূলক গবেষণার বিস্তার (The Growth of Educational Research in India)

ভারতে শিক্ষা গবেষণার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। ১৯৪৩ সালে Bomaby University থেকে Dr. D. V. Chickermane তার গবেষণাপত্র "Factor Analysis of Arithmetical Ability." জন্য Ph. D. ডিগ্রী প্রদানের মাধ্যমে ভারতে শিক্ষামূলক গবেষণার সূত্রপাত হয়। সেই থেকে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষামূলক এবং/অথবা শ্রেণীকক্ষ গবেষণার উল্লেখযোগ্য বিস্তার হয়েছে। যাইহোক ১৯১৭ সালে শিক্ষা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে সংগঠিতভাবে পর্যালোচনা করার জন্য "Department of Education" প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ১৯৩৬ সালে বোম্বে ইউনিভার্সিটি M.Ed. কোর্স শুরু করে ১৯৪৩ সালে প্রথম শিক্ষায় Ph. D. ডিগ্রী প্রদান করে। ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার শিক্ষামূলক গবেষণার সুবিধার্থে জাতীয় স্তরে Central Institute of Education (CIE) স্থাপন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষামূলক গবেষণার প্রসার ঘটানো, কর্মরত অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য এ্যাডভান্সড্ লেভেল ট্রেনিং দেওয়া। একই উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালে Central Bureau of Textbook Research (CBTR) ও Central Bureau of Educational and Vocational Guidance, National Institute of Basic Education (NIBE) এবং মূলত বয়স্কশিক্ষা নিয়ে কাজ করার জন্য Nation Fundamental Centre (NFC) স্থাপিত হয়েছিল। এরপরে ১৯৫৯ সালে National Institute of Audio-Visual Education স্থাপিত হয়েছিল শিক্ষামূলক এবং/অথবা শ্রেণীকক্ষ গবেষণার বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১২ বছরের মধ্যে (১৯৪৭-১৯৫৯) ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে।

যাইহোক, খুব শীঘ্রই এটি বোঝা গেল যে এই ছয়টি প্রতিষ্ঠান এককভাবে শিক্ষাকে সামগ্রিক বিষয় নিয়ে কাজ না করে অংশ বিশেষের কাজ করছে। শিক্ষার তিনটি মুখ্য উপাদান—গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও প্রসারকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ (NCERT) স্থাপিত হয়েছিল যা দেশের শিক্ষামূলক এবং/অথবা শ্রেণীকক্ষ গবেষণার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিণগতি হয়। এর অনুকরণে রাজ্যগুলিতে এবং ইউনিয়ন টেরিটরিতে রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ (SCERT) /রাজ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল।

NCERT ছাড়া আরও কিছু জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান শিক্ষামূলক সমস্যা নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত—যেমন— UGC, ICSSR ১৯৭০ সালে নয়া দিল্লীতে স্থাপিত হয়েছিল National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), Indian Institute of Education (IIE-1948) পুণেতে এবং বরোদাতে ১৯৬৩ সালে Centre of Advanced Study in Education (CASE) স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে NCERT জাতীয় স্তরে শীর্ষ সংগঠন হিসাবে বিদ্যালয় শিক্ষার নীতি ও কর্মসূচী গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও ভারত সরকার অথবা নানান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা করে থাকে।

1.9 শিক্ষামূলক গবেষণার সমস্যাসমূহ (Improving Educational Research)

1.9.1 শিক্ষামূলক গবেষণার সমস্যাসমূহ (Problems with Educational Research)

শিক্ষা গবেষণা নিয়ে নানান সার্ভেতে প্রকাশিত গত কয়েক দশকে ভারতে শিক্ষামূলক গবেষণার পরিমাণগত বৃদ্ধি হয়েছে। যদিও এই ধরনের কাজের গুণগতমান খুব উচ্চস্তরে নয় এর কারণসমূহ—ব্যাঙের ছাতার ন্যায় ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বৃদ্ধি, গবেষণার জন্য অধিক আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা, Ph.D. ডিগ্রি মর্যাদার প্রতীক হিসাবে পরিগণিত হওয়া এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানো এবং পদোন্নতি ও উচ্চবেতনক্রম পাওয়া। স্বাভাবিকভাবে গবেষণার পরিসংখ্যানগত বৃদ্ধি হয়েছে। যদি আমরা গবেষণার গুণগতমান বজায় রাখতে চাই তবে শিক্ষা-গবেষণার মুখ্য ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা খুবই জরুরী। Buch (1991)-এর মতে শিক্ষামূলক গবেষণার প্রধান ত্রুটিগুলি হল—

(ক) **Absence of clear education perspective**—জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তি ও সামাজিক চাহিদা নির্ভর উদ্দেশ্য স্থির করা অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষা হল নির্দিষ্ট লক্ষ্য/উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম। এটি বিশেষ নির্ভর এ্যডুকেশন্যাল পার্সপেকটিভ (EP) হিসাবে পরিগণিত। তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের লেখাপড়ার সমস্যা, বুনিয়াদী শিক্ষা পরিচালনার সার্বজনীনতা প্রভৃতি বিষয় গবেষণা হল জাতীয় শিক্ষামূলক/বৃদ্ধিমূলক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নির্ভর গবেষণা। এছাড়া ICSSR, NIEPA দ্বারা কিছু ডিগ্রীবিহীন গবেষণা পরিচালিত হয়। বেশির ভাগ ডক্টরাল গবেষণা হল EP-বিহীন ফলস্বরূপ এই ধরনের গবেষণা সামাজিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক এবং অফলপ্রসূ। এইজন্য এই ধরনের গবেষণাকর্ম শিক্ষামূলক কার্যক্রমে যেমন কোনো যথেষ্ট আলোর পথ দেখায় না, তেমনি শিক্ষা জগতে নতুন জ্ঞানের যোগ করে না যাতে এটি থিওরি অথবা প্র্যাকটিক্যালের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই কারণেই ভারতীয় শিক্ষামূলক গবেষণা শিক্ষানীতি, কর্মসূচী অথবা অনুশীলনে প্রভাব বিস্তার করতে অসমর্থ।

(খ) **Absence of Conceptual Frame Work** — শ্রেণীকক্ষমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ধারণামূলক এবং তাত্ত্বিক গঠনশৈলীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এটি গবেষককে পরীক্ষালব্ধ তথ্য একত্রীকরণ করা ছাড়াও এটি গবেষককে তার প্রাপ্ত ফলের অন্তর্নিহিত অর্থ সঠিকভাবে প্রকাশে সাহায্য করে। এটি গবেষককে গবেষণার সমস্যা নির্বাচনে, সঠিকভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত tools এবং technique নির্বাচনে এবং তথ্য বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত নক্সা তৈরিতে সাহায্য করে। বলিষ্ঠ ধারণামূলক ফ্রেমওয়ার্ক-এর গুরুত্ব এবং উপযোগিতা বোঝা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট গবেষণা সমস্যা গঠনে এটি এখনও অবহেলিত। গবেষকরা তথ্য সংগ্রহের জন্য 'চল'দের (variables) এবং Tools ও Techniques নির্বাচনে তাত্ত্বিক বিষয়কে অবহেলা করে, যার খুবই ক্ষতিকর দিক আছে। গবেষকরা ডিগ্রি অর্জন করে, জ্ঞান নয়।

(গ) **Inadequate Understanding of the Research Process** — উপরিউক্ত ভুলত্রুটি ছাড়াও গবেষণা পদ্ধতির স্পষ্ট/যথাযথ ধারণা না থাকার জন্য শিক্ষা গবেষণা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। এটি স্পষ্ট যে সমস্যা নির্বাচনের পদ্ধতি হল adhoc basis tools-এর সহজলভ্যতা অপ্রত্যাশিতভাবে ভবিষ্যৎ গবেষককে একই tool বার বার ব্যবহারে আগ্রহী করে। অবৈজ্ঞানিক এবং অপ্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা (sample) নির্বাচন, ক্রমাগত হ্রাসমান নমুনা (sample) আকার। অযৌক্তিক রিসার্চ মেথোডলজি, তথ্যের বেঠিক ব্যবহার অনুপযুক্ত পরিসংখ্যান প্রযুক্তির ব্যবহার গবেষণায় প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতে ব্যর্থ।

(ঘ) **Relevance of Educational Research —** অনেক শিক্ষামূলক গবেষণা জাতীয় এবং সমাজের চাহিদার সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক। বেশীরভাগ গবেষণাই বিশুদ্ধ academic অনুশীলন বেশীর ভাগই macro level সমস্যা নিয়ে পরিচালিত যাতে সহজে একটা ডিগ্রি অর্জন করা যায়। বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক বিষয় (macro level সমস্যা) সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত। আবার অনেক গবেষণালব্ধ ফল অপ্রাসঙ্গিক যাদের বিদ্যালয় বা কলেজ স্তরে কোনো ব্যবহার সম্ভব নয়। সুতরাং গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন চিহ্ন থেকে যাচ্ছে।

শ্রেণীকক্ষমূলক গবেষণা নিয়ে আরও কিছু সমস্যা ভাবুন এবং তাদের অপসারণ যদি দরকার, তবে কেন ?

____

____

____

____

____

1.9.2 Improving the Status of Educational Research

শিক্ষামূলক গবেষণার মানের উন্নয়নের জন্য এর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ক্রমাগত ও সৎ প্রচেষ্টা জারী রাখতে হবে। Buch এবং Govinda (1987) মতানুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা শিক্ষামূলক গবেষণার মানোন্নয়ন করা যেতে পারে—

* শিক্ষামূলক গবেষণাকে সংগঠিত করা।
* গবেষকদের প্রশিক্ষণ।
* শিক্ষামূলক গবেষণার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি।
* গবেষণার পরিব্যাপ্তি।

(ক) শিক্ষামূলক গবেষণার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য একে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে সংগঠিত করতে হবে। এগুলি হল—

* প্রতিষ্ঠানগত পরিকাঠামোর উন্নয়ন।
* পরিকল্পিত প্রচেষ্টা ও শিক্ষামূলক গবেষণার কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা।
* অধ্যয়ন বিষয়ক নেতৃত্ব তৈরি করা এবং বজায় রাখা।

(খ) **গবেষকদের প্রশিক্ষণ :** গবেষকদের সক্ষমতার উপর গবেষণার গুণমান নির্ভর করে। সেইহেতু

গবেষকদের উপযুক্ত এবং আন্তরিক সাহায্য, প্রশিক্ষণ এবং মানসিক অভিযোজন (ওরিয়েন্টেশন) খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) **শিক্ষামূলক গবেষণার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি :** আমাদের দেশে শিক্ষামূলক গবেষণা মূলতঃ তিনটি সংস্থা দ্বারা আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে—ICSSR, NCERT এবং UGC-এর গবেষণার বিস্তারে সাহায্য করে এবং গবেষণা প্রচেষ্টার দিক নির্দেশ করে। এখন এই সংস্থাগুলির কার্যকলাপ নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার যাতে তাদের উদ্দেশ্য দক্ষতার সঙ্গে অর্জন করা যায়।

(ঘ) **গবেষণার পরিব্যাপ্তি :** গবেষণালব্ধ ফল অনুশীলনকারী এবং সংযুক্ত সংস্থাগুলিতে না ছড়িয়ে দিলে গবেষণার উদ্দেশ্য এবং ব্যবহারিক উপযোগিতা অধরা থেকে যাবে। এটি করা যেতে পারে জাতীয়/আন্তর্জাতিকস্তরে সেমিনার/কনফারেন্স সংগঠিত করে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশনা করে যাতে আগ্রহী ব্যক্তি এবং সংস্থা তা জানতে পারে।

Buch ও Govinda (1987) এই বিষয়ে বলেছেন—শিক্ষামূলক গবেষণার প্রচেষ্ট ব্যর্থ হয়নি কিন্তু তাতে বিভেদের চিহ্ন স্পষ্ট। এটি বাইরের চাপ এবং আন্তর্দেশীয় ব্যর্থতা উভয়েরই জন্য হয়েছে। প্রফেশনালদের শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার সময় হয়েছে। প্রথমত—তাদের নিজস্বতা স্থাপন জরুরী। শিক্ষামূলক গবেষণার মানবর্ধনের জন্য সুদৃঢ় পদক্ষেপ জরুরী। একই সঙ্গে তাদের নিজ সংকল্পে স্থির এবং বাইরের চাপকে যথাযথ সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে। রূপরেখা তৈরির কারিগর ও প্রশাসনিক ব্যক্তিগণ যাতে শিক্ষা প্রক্রিয়ার উন্নয়নে শিক্ষা গবেষণাকারীদের সশ্রদ্ধ অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করে তার জন্য জোরালো প্রতিনিধিত্বকারী দল তৈরি করতে হবে। এক হাতে পেশাদারী মনোভাবের দৃঢ়তা তৈরী এবং অন্যহাতে নতুন গবেষণা সংস্কৃতির আত্মস্থ করা উভয়ই প্রয়োজন।

শ্রেণীকক্ষ গবেষণার মানবর্ধনের জন্য আরও কয়েকটি উপায় বের করুন—

____

____

____

1.10 এককের সারাংশ (Unit Summary)

* গবেষণা প্রক্রিয়ায় আমরা ঘটমান ঘটনা পর্যবেক্ষণ করি, তথ্য সংগ্রহ করি এবং সংগ্রহকরা তথ্যের বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।
* শিক্ষা-গবেষণায় শিক্ষামূলক এবং/অথবা শ্রেণীকক্ষ গবেষণায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

* শিক্ষা-গবেষণার তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য হল—Progress, System এবং Economy।

* তত্ত্বগঠনে, শাখার উন্নয়ন এবং প্রসারণে শিক্ষামূলক গবেষণা অপরিহার্য।

* ১৯৪৩ সালে বোম্বে ইউনির্ভাসিটি থেকে Ph. D. ডিগ্রী প্রদানের মাধ্যমে ভারতে শিক্ষা-গবেষণার সূত্রপাত।

* শিক্ষা-গবেষণার বিস্তারের জন্য NCERT, UGC, ICSSR জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

* শিক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রগুলির মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরী শিক্ষা অন্যতম ক্ষেত্র।

* শিক্ষা-গবেষণার শীর্ষ-প্রাধান্যভুক্ত ক্ষেত্রগুলি হল শিক্ষাদর্শন, শিক্ষা মনোবিদ্যা, শিক্ষাগত প্রযুক্তি, শিক্ষা পরিচালন, বিশেষ শিক্ষা প্রভৃতি।

* শ্রেণীকক্ষ গবেষণায় কিছু অবাঞ্ছিত সমস্যার জন্য যেমন অস্পষ্ট শিক্ষাগত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, ধারণাগত পরিকাঠামোর অনুপস্থিতি, গবেষণা প্রণালী সম্পর্কে অপরিমিত জ্ঞান ইত্যাদি কারণে গুণগত গবেষণার পরিবর্তে পরিসংখ্যানগত গবেষণা বেশী হচ্ছে।

* জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির জন্য শিক্ষা-গবেষণার মানবর্ধণ জরুরী। যদি কিছু প্রতিষেধক (গবেষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা গবেষণার সংগঠিত করা প্রভৃতি) নেওয়া যায় শ্রেণী-কক্ষ গবেষণার উন্নয়ন সম্ভব।

এই বিভাগে আমরা শিক্ষা গবেষণার ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনা মূলত ভারতে শিক্ষা গবেষণা বৃদ্ধি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে গবেষণা হয়েছে এবং হওয়া উচিত এমন কিছু বিষয়ের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। যদিও শিক্ষা-গবেষণা একটি ফলিত বলা তবুও এর বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি/ধর্ম বিজ্ঞানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। শিক্ষা-গবেষণার সুযোগ সীমাহীন। শেষে শিক্ষা গবেষণার বিভিন্ন সমস্যা এবং উন্নয়নের পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

1.11 অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

(ক) শিক্ষামূলক গবেষণার ধারণা ব্যাখ্যা করুন এবং বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র বিষয়ে আলোচনা করুন যে গবেষক কিংবা শ্রেণী-শিক্ষক গবেষণা করতে পারেন।

(খ) শিক্ষামূলক গবেষণার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করুন এবং বক্তব্যের সমর্থনে যথাযথ প্রমাণ দিন।

(গ) শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কেন তা বিবৃত করুন।

(ঘ) শিক্ষা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত সমস্যাবলী লিখুন এবং ভারতীয় পরিস্থিতিতে এবং উন্নয়নের জন্য দিক নির্দেশ করুন।

1.12 বাড়ীর কাজ (Assignment)

গবেষণা কিভাবে বিশেষ শিক্ষাকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করতে পারে—

(১) মানসিক অক্ষমতা।

(২) দৃষ্টিহীন।

(৩) শ্রবণ অক্ষমতা।

(৪) লোকোমোটর।

(৫) সেরিব্রালপালসী।

1.13 আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion/Clarification)

1.13.1 আলোচনার সূত্রাবলী (Points for Discussion)

1.13.2 ব্যাখ্যার সূত্রাবলী (Points for Clarification)

1.14 উৎস (Reference)

1. Best, John W. (1977) *Research in Education.* Englewood Cliffs. New Jersey : Prentice Hall inc.

2. Buch, M. B. (1974) *A Survey of Research in Education.* Baroda : CASE : M. S. University, Baroda.

3. Buch, M. B. (1979) *Scond Survey of Research in Education (1972-1978),* Baroda : Society for Educational Research and Development.

4. Buch, M. B. and Govinda, R. (1987) Educational Research in India — An Overview in M. B. Buch (Ed.). *Third Survey of Research in Education (1978-1983),* New Delhi : NCERT.

5. Buch, M. B. (1991) *Fourth Survey of Research in Education* (1983-1988), NCERT-New Delhi-16 (PP 1-45).

6. Chandra, S. S. and Sharma, R. K. (1997) *Research in Education,* New Delhi Atlantic Publishers and Distributors.

7. Koul. Lokesh (1984) *Methodology of Educational Research,* New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

8. Monroe. Wiaters S. ed. (1950) *Encyclopaedia of Educational Research.* New York : The MacMillan Company.

9. NCERT (1979) *Education and National Development — Report of the Education Commission (1964-1966)* New Delhi : NCERT.

10. Travers, Robert M. W. (1958) *An Introduction to Educational Research.* New York : The MacMillan Company.

একক ২ ❑ শিক্ষামূলক গবেষণার প্রকারভেদ (Types of Research in Education)

গঠন

2.1 ভূমিকা

2.2 উদ্দেশ্য

2.3 শিক্ষামূলক গবেষণার মুখ্য বিভাগসমূহ

2.4 ঐতিহাসিক গবেষণা

2.4.1 শিক্ষায় ঐতিহাসিক গবেষরার তাৎপর্য

2.4.2 শিক্ষায় ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তু

2.4.3 ঐতিহাসিক গবেষণার ধাপসমূহ

2.5 বর্ণনাধর্মী গবেষণা

2.5.1 বর্ণনাধর্মী গবেষণার উদ্দেশ্য

2.5.2 বর্ণনাধর্মী গবেষণার তাৎপর্য

2.5.3 বর্ণনাধর্মী গবেষণার প্রকারভেদ

2.5.4 বর্ণনাধর্মী গবেষণার ধাপসমূহ

2.6 সহপরিবর্তন মূলক গবেষণা

2.6.1 সহপরিবর্তন মূলক গবেষণার উদ্দেশ্য

2.6.2 সহপরিবর্তন মূলক গবেষণার মুখ্য বিষয়াবলী

2.6.3 সহপরিবর্তন মূলক গবেষণার তথ্য উৎসসমূহ

2.6.4 সহপরিবর্তনের প্রকারভেদ

2.6.5 সহপরিবর্তনমূলক গবেষণার ধাপ সমূহ

2.7 কারণগত তুলনামূলক গবেষণার ধাপ সমূহ

2.7.1 কারণগত তুলনামূলক গবেষণার গুরুত্ব

2.7.2 কারণগত তুলনামূলক গবেষণার প্রকৃতি

2.7.3 কারণগত তুলনামূলক গবেষণার ধাপসমূহ

2.7.4 কারণগত তুলনামূলক গবেষণার সীমাবদ্ধতা

2.8 পরীক্ষামূলক গবেষণা

2.8.1 পরীক্ষামূলক গবেষণার প্রকৃতি

2.8.2 পরীক্ষামূলক গবেষণার গুরুত্ব

2.8.3 পরীক্ষামূলক গবেষণার ধাপসমূহ

2.8.4 পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

2.8.5 পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ

2.9 ঘাত গবেষণা

2.9.1 ঘাত গবেষণার বৈশিষ্ট্যসমূহ

2.9.2 ঘাত গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী

2.9.3 পরীক্ষামূলক গবেষণার ধাপসমূহ

2.9.4 ঘাত গবেষণার ধাপসমূহ

2.10 ক্ষেত্র গবেষণা

2.10.1 ক্ষেত্র পরীক্ষণ

2.10.2 ক্ষেত্র অধ্যয়ন

2.11 এককের সারাংশ

2.12 অগ্রগতির মূল্যায়ন

2.13 বাড়ীর কাজ

2.14 আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

2.15 উৎস

2.1 ভূমিকা (Introduction)

১নং এককে যে কোন শিক্ষা সম্পর্কিত ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য গবেষণার প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে। কোনো ঘটনার তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা নানান পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি। Helmstader (1970) মতানুযায়ী তথ্য সংগ্রহ অথবা জ্ঞানার্জন এর জন্য ন্যূনতম বিজ্ঞান নির্ভর থেকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নির্ভর ছয়টি ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি।

Tenacity— জ্ঞানার্জন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথম পদ্ধতি যাহা কুসংস্কার বা অভ্যাস নির্ভর।

Initudtion— দ্বিতীয় পদ্ধতি, চিন্তাধারা যা কারণ বা অনুমোদন নির্ভর নয়।

Authority— তৃতীয় পদ্ধতি, আমরা কিছু তথ্য ও জ্ঞান বিশ্বাস করি যা উচ্চশক্তিশালী উৎস বা শক্তি থেকে প্রাপ্ত।

Rationalism— চতুর্থ পদ্ধতি কার্যকারণের ব্যবহারের মাধ্যমে।

Empiricism— পঞ্চম পদ্ধতি, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন।

এই পদ্ধতিগুলি আবিশ্যিক ভাবে না সঠিক তথ্য দেয় এবং না বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা প্রতিফলিত করে।

তথ্য এবং জ্ঞানার্জনের ষষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে Science অথবা Scientific method এটি আমাদের অধিকতর সম্ভাব্য প্রকৃত তথ্য, জ্ঞান অথবা সত্য পেতে সাহায্য করে।

2.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

* গবেষণার মুখ্য প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারা।
* ঐতিহাসিক গবেষণার ধারণা।
* বর্ণনামূলক গবেষণার ব্যাখ্যা।
* কোন-রিলেশন গবেষণা বর্ণনা করতে পারা।
* 'Causal comparative' গবেষণার প্রকৃতি আলোচনা।
* পরীক্ষামূলক গবেষণার বিভিন্ন পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারা।
* শিক্ষায় ঘাত গবেষণার (action research) প্রয়োজন বুঝতে পারা।
* ক্ষেত্র গবেষণার বর্ণনা করতে পারা।

2.3 শিক্ষামূলক গবেষণার মুখ্য বিভাগসমূহ (Main Types of Educational Research)

বিভিন্ন লেখক এবং গবেষকরা গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্নভাবে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। সাধারণত জনগণ গবেষণাকে মৌলিক (basic) অথবা ফলিত (applied) এই দুটি ভাগ করেছেন। এইগুলি প্রায়শই গবেষণার type হিসাবে পরিগণিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুটি হল বিস্তীর্ণ বিভাগ যাদের মধ্যে নানা প্রকারের শিক্ষামূলক গবেষণা অন্তর্ভুক্ত।

Travers (1958) এর মতে basic (or pure or furndamental) research is designed to add to an organized body of Scientific knowledge and does not necessaryily produce results of immediate practical value.'

মৌলিক গবেষণায় আমরা তত্ত্ব তৈরী ও পরীক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করি এবং জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের আবিষ্কার করি। উদাহরণ আইস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থা বা শ্রেণীতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আচরণ মূলক তত্ত্বের বিকাশ সাধন এবং পরীক্ষণ মৌলিক গবেষণার বিষয় বস্তু।

অন্যধারে ফলিত (অথবা এমনকি action) গবেষণার উদ্দেশ্য হল কোন নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করা যার সমাজ অথবা যে কোনো প্রতিষ্ঠান সংগঠনের কাছে তাৎক্ষণিক ব্যবহারিক মূল্য আছে। Travers (1948) এর মতে ''applied research is undertaken to solve immediate practical problem and the goal of adding to Scientific knowledge is secondary' উদাহরণ Thomas Edison-এর কাজ।

প্রকৃতপক্ষে এই দুটি পৃথক নয়, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত Good, Barr এবং Scates ধারণা অনুযায়ী গবেষণাকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

* প্রয়োগ অনুযায়ী— মৌলিক অথবা ফলিত।
* উদ্দেশ্য অনুযায়ী — বর্ণনাধর্মী, সামান্যীকরণধর্মী, ভবিষ্যৎবাণী, কারণ নির্ধারণ প্রভৃতি।
* জায়গা যেখানে গবেষণা করা হবে— ক্ষেত্র অথবা গবেষণাগারে গবেষণা।
* তথ্য সংগ্রহের ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুযায়ী—পরীক্ষা, প্রশ্নমালা, ইন্টারভিউ, সিডিউলস।
* যে ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে— শিক্ষা, মনোবিদ্যা, জীবন বিজ্ঞান প্রভৃতি।

এই শ্রেণী বিভাগগুলি সম্পূর্ণ নয় কিছু জায়গায় একে অপরের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। সেই কারণে তথ্যের প্রকারভেদ এবং প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার গবেষণা পদ্ধতিতে বিভক্ত করা যথাযথ হবে—

১। ঐতিহাসিক গবেষণা।

২। বর্ণনামূলক গবেষণা।

৩। পারস্পরিক সম্পর্কিত গবেষণা।

৪। কারণবাচক তুলনামূলক গবেষণা।

৫। পরীক্ষামূলক গবেষণা।

৬। ক্ষেত্র পর্যায়ে গবেষণা।

2.4 ঐতিহাসিক গবেষণা (Historical Research-HR)

ইতিহাস বলতে কি বোঝ? ঐতিহাসিক গবেষণায় কি করা হয়?

খুব সংক্ষিপ্ত এবং নির্ভুল ভাবেন Best ও Kahn (2000) এর মত অনুযায়ী ইতিহাস হল মানব সাফল্যের অর্থবোধক দলিল, এটি কেবলমাত্র পর্যায়ক্রমিক ঘটনা সমূহের তালিকা নয়। পরন্তু ব্যক্তি ঘটনা, সময় এবং জায়গার সম্পর্কের প্রকৃতি জানতে পারি এবং অতীতের ঘটনা এবং উন্নয়নের আলোকে বর্তমানকে বুঝতে চেষ্টা করি।

কৌতূহলের বিষয় হল এই যে, ঐতিহাসিক গবেষণা কি ছিল (What was) তার বর্ণনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ঐতিহাসিক গবেষণায় আমরা খুব সতর্কভাবে সমালোচনামূলক অনুসন্ধান, দলিল, অতীতকে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করি যাতে লুক্কায়িত বিষয়ের আবিষ্কার করতে পারি ফলস্বরূপ অতীত এবং বর্তমান বুঝতে পারি এবং যদি সম্ভব হয়— অতীতের আলোকে ভবিষ্যদ্বানী করতে পারি।

2.4.1 শিক্ষায় ঐতিহাসিক গবেষণার তাৎপর্য (Significance of Historical Research in Education)

শিক্ষা জগতের নিজস্ব ইতিহাস আছে। তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে শিক্ষার ঐতিহাসিক গবেষণার গুরুত্ব ব্যাপক। ঐতিহাসিক গবেষণার ফলাফল অতীতের ভুল এবং আবিষ্কার থেকে শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য করতে পারে। আমরা যে সব শিক্ষার যে সব ক্ষেত্রে পুণর্গঠন প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে পারি এবং যদি সম্ভব হয় কোনো ঘটনার ভবিষ্যৎ প্রবণতা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি। Knight (1934), Good, Barr এবং Scates (1941) ঐতিহাসিক গবেষণার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

* বিদ্যালয় অথবা যে কোনো শিক্ষামূলক সংস্থার ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা পরিচালকের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ।
* বেশির ভাগ বিদ্যালয়ের কাজকর্ম প্রথাগত, শিক্ষক এবং পরিচালকের কাজের প্রকৃতি সীমিত এবং পরিচিত পদ্ধতির প্রতি অন্ধবিশ্বাস স্বাভাবিক। শিক্ষার ইতিহাস হল শিক্ষামূলক পক্ষপাত/পূর্ব সংস্কারের "Sovereign solvent"
* শিক্ষার ইতিহাস শিক্ষা কর্মীকে যে কোন রকমের fads and frills নির্ধারণে সাহায্য করে। এটি শিক্ষাগত পুণর্গঠনে প্রাথমিক অধ্যায় হিসাবে কাজ করে।
* বর্তমানের অনেক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা তাদের উৎস এবং বৃদ্ধির আলোকে সহানুভূতির সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালক অথবা জনগনের দ্বারা পুনরায় দেখা যেতে পারে।
* কিভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যধারার পরিবর্তন হয়েছে তা শিক্ষার ইতিহাস থেকে জানা যায়। কিভাবে সাহায্য এবং শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ অতি সাধারণ এবং স্থানীয় ব্যবস্থাপনা থেকে বর্তমানে কেন্দ্রায়িত ও জটিল হয়েছে তা জানা যায়।
* শিক্ষার ইতিহাস বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার সহায়ক প্রতিযোগী নয়। এটি অন্য সময়ের শিক্ষামূলক আদর্শ ও মানকে বর্তমানের কাজে লাগায়। সমাজ সেবকদের অতীতের ভুল থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে।
* এটি উচ্চবৃত্তির জন্য অনুপ্রাণিত করে।

2.4.2 শিক্ষা ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তু (Subject Matter of Historical Research in Education)

* শিক্ষার সাধারণ ইতিহাস।
* শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও নীতির ইতিহাস।

* শিক্ষা সংক্রান্ত প্রথার ইতিহাস।
* শিক্ষাক্ষেত্রে সমসাময়িক সমস্যার ইতিহাস।
* শিক্ষাথীর দর্শন এবং মেথোডলজির ইতিহাস।
* শিক্ষা সাহিত্যের ইতিহাস।
* শিক্ষার আইনানুগ ইতিহাস।
* শিক্ষায় নতুনত্বের ইতিহাস।
* শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বা সংগঠনসমূহ।

2.4.3 ঐতিহাসিক গবেষণার ধাপসমূহ (Steps in Historical Research)

ঐতিহাসিক গবেষণায় কিছু নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিশেষ কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণত ঐতিহাসিক গবেষণায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়।

(ক) **সমস্যা নির্বাচন ঃ** উদ্দেশ্য অনুযায়ী গবেষক যে কোনো ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করতে পারেন যেমন— শিক্ষাদানের পদ্ধতি, পাঠক্রম, শিক্ষামূলক ধারণা ও চিন্তাভাবনা, শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান/সংগঠন প্রভৃতি। অন্য শিক্ষাবিদ বা ঐতিহাসিকগণের সাহিত্য/বিশেষজ্ঞদের মতামত প্রভৃতির পর্যালোচনা গবেষককে তার সমস্যা নির্বাচন এবং তার সংজ্ঞা নিরূপণে সাহায্য করতে পারে।

(খ) **প্রকল্প/তত্ত্বপ্রকল্প গঠন ঃ** তত্ত্বপ্রকল্প আমাদের নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান পেতে সাহায্য করে। এটি অন্ধভাবে অনুসন্ধান থেকে রক্ষা করে। ঐতিহাসিক গবেষণায় তত্ত্বপ্রকল্প সর্বদা সুনির্দিষ্ট হয় না। অন্যান্য গবেষণার মত আমরা তত্ত্বপ্রকল্পকে অনুমোদন করতে পারি নাও পারি (গ্রহণ/অথবা বর্জন)। তত্ত্বপ্রকল্পকে যাচাই করার জন্য/বিভিন্ন উৎস যেমন ব্যক্তি, বই, বিদ্যালয় প্রভৃতি থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারি।

(গ) **তথ্য সংগ্রহ ঃ** তত্ত্বপ্রকল্পকে সঠিকভাবে যাচাই করার জন্য সমস্ত ধরনের গবেষণায় গবেষককে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ঐতিহাসিক গবেষণায় তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি খুবই জটিল এবং একঘেয়ে/ক্লেশজনক।

গবেষককে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হতে হবে যাতে তিনি তার সমস্যার জন্য প্রাসঙ্গিক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। সাহিত্য এবং অন্যান্য উৎসের তথ্য সমৃদ্ধ থেকে তথ্যের উৎসগুলি হল—

* **তথ্যের প্রত্যক্ষ উৎস ঃ** সরাসরি ঘটনা/সমস্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য হল first hand information। এই ধরনের তথ্য গবেষক Questionnaires schedules, observation এবং interview-র মাধ্যমে সংগ্রহ করেন।
* **পরোক্ষ উৎস ঃ** এটি হল Second-hand তথ্য। ডায়েরী, চিঠিপত্র, বই এবং এনসাইক্লোপিডিয়া প্রভৃতি থেকে সংগ্রহ করা হয়। এই ধরনের তথ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সততা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

সুতরাং এই ধরনের তথ্যের উপর গবেষকের অধিক বিশ্বাস এবং নির্ভর করা উচিত নয় এবং সম্ভব হলে অন্য উৎস থেকে একে যাচাই করে নেওয়া উচিত।

(ঘ) **গবেষণা হাতিয়ার/যন্ত্র** (Research Tools) : বিষয় থেকে তথ্যসংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র। এখানে বিষয় (Subject) বলতে living organism-কে বোঝায় যাকে আমরা গবেষণায় Study করি। একে 'respondent' ও বলা হয়। আমরা একটি বিষয়কে 'S' এবং একাধিককে Ss দ্বারা সূচিত করতে পারি। ঐতিহাসিক গবেষণায় আমরা প্রায়ই 'Interview', Questionnaries, Observation এবং অন্যান্য Standardized Tests ব্যবহার করে থাকি।

(ঙ) **তথ্য সমালোচনা** (Criticism of the Data) : তথ্য সংগ্রহের পরবর্তী কাজ হল প্রাপ্ত তথ্যের অনমনীয় মূল্যায়ন যাকে বলা হয় "criticism of the data". তথ্যের এবং সত্যতা তথ্যে উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে থাকে। সেই হেতু গবেষকের সংগৃহীত তথ্য এবং তার উৎসের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করা উচিত।

Criticism দুই ধরনের হয়ে থাকে—

* External Criticism—এতে তথ্যের উৎস বিশদভাবে মূল্যায়ন করা হয়।
* Internal Criticism এতে তথ্যের উপাদানের বিষয়বস্তুর বিশদে মূল্যায়ন করা হয়।

(চ) **তথ্য বিশ্লেষণ** (Analysis of the Data) : ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রাপ্ত নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বা একাধিক মেথডের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়।

* Simple Presentation of the Data—এই ধরনের তথ্য বিশ্লেষণে কোনো Statistical পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না; সংগ্রহ করা বা সংগৃহীকৃত তথ্য হুবহু একইভাবে উপস্থাপন করা হয়।
* Data Conversion—এখানে আমরা তথ্যকে সাধারণ Statistics যেমন Mean, Median, অথবা Percentages যেটা প্রযোজ্য তা ব্যবহার করি। যাতে তথ্য আরও অর্থবোধক এবং তুলনাযোগ্য হয়। আমরা তথ্যের পরিষ্কার এবং সহজ উপস্থাপনার জন্য graphs ব্যবহার করতে পারি।
* Further Statistical Treatment- সাধারণ সারসংক্ষেপনের ঊর্দ্ধে তথ্য বিশ্লেষণ করতে গেলে তথ্য দলের মধ্যে পার্থক্য নিরুপন করতে হবে, এখানে higher Statistical techniques যেমন Standard deviation, Chi-Square, Variance প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

(ছ) **বিশদীকরণ/ব্যাখ্যা (Interpretation) :** ঐতিহাসিক গবেষণায় তদন্ত ফলাফল Status অথবা investigated groups-এর মধ্যে/সবার মধ্যে পার্থক্যসমূহের আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর ফলে কেবলমাত্র অতীতকে বোঝা যায় না। অতীতের সঙ্গে বর্তমানেরও তুলনা করা যায়। এটি কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় কালে ক্রমাগত পরিবর্তনের trends এবং কারণসমূহকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে। এটি অধিকতর ভালো পাঠ্যক্রম প্রভৃতি তৈরীতে 'decision making' এ সাহায্য করে। ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যাখ্যা করা খুব সাধারণ এবং সহজ মনে হলে এতে যথেষ্ট Skills এবং expertise দরকার।

(জ) রিপোর্ট লিখন (Report Writing) : সর্বশেষে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সংক্ষিপ্ত 'to-the-point' এবং সুসংগঠিত রিপোর্ট লেখা। একটি ঐতিহাসিক গবেষণা রিপোর্টে Statement of problem, নির্ভরযোগ্য literature-এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, প্রকৃত উৎস/উৎসসমূহ, তথ্য সমালোচনা, পরিচর্যা, তথ্যের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা, চূড়ান্ত অভিমত, প্রভৃতি তথ্য সহায়ক। যদিও ঐতিহাসিক গবেষণার রিপোর্ট তুলনামূলকভাবে নীরস এবং আকর্ষণীয় না হওয়ার জন্য সমালোচিত তবুও গবেষকের উচিত একে নির্ভুল এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে বাহারী ভাষা ব্যবহার না করে তার সৃজনশীলতা এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।

2.5 বর্ণনাধর্মী গবেষণা (Descriptive Research)

এটি দুই প্রকারের—

* Quantitative— পরিমেয় বর্ণনাধর্মী গবেষণা— এটি যা ঘটে তার উপর জোর দেয় এবং পরিমেয় পদ্ধতিসমূহের ব্যবহার করা হয় বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করতে।

* গুণগত বর্ণনাধর্মী গবেষণা—এটি যা ঘটে তার উপর জোর দেয় কিন্তু বর্তমান অবস্থার বর্ণনা করতে Non-quantative গবেষণা পদ্ধতির ব্যবহার করে।

বর্ণনাধর্মী গবেষণায় Non-manipulated চলদের (variables) মধ্যে যোগসূত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই ধরনের গবেষণায় গবেষক যা ঘটে গেছে বা বর্তমানে উপস্থিত ঘটনা/অবস্থার মধ্য থেকে প্রাসঙ্গিক চলদের (variables) নির্বাচন করেন এবং কোনো প্রকার manipulation ছাড়াই তাদের মধ্যে যোগসূত্র/সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। বর্ণনাধর্মী গবেষণায় আমরা স্বাভাবিক/প্রকৃত অবস্থায় কোনো ঘটনা বা মানব আচরণ Study করি কারণ কখনো কখনো variables-দের manipulate করা খুবই কঠিন, এছাড়া এটি অনৈতিক। উদাহরণ—যদি ক্যান্সারে development-এ ধূমপানের প্রভাব নিয়ে Study করতে চাই তবে যারা ধূমপান করে আর যারা ধূমপান করেন না, তাদের ভেবেচিন্তে/জেনেশুনে/ইচ্ছাকৃতভাবে তুলনা করার জন্য ব্যবহার অনৈতিক। সুতরাং variables-দের মধ্যে এই ধরনের এবং অন্যপ্রকার সম্পর্কের গবেষণা শ্রেণীকক্ষ, বাড়িতে, কারখানায়, অফিস প্রভৃতি জায়গায় স্বাভাবিক অবস্থায় Study করা হয়। বর্ণনাধর্মী গবেষণার সহজ ব্যবহারের কারণে শিক্ষামূলক গবেষণায় এর ব্যবহার খুবই বেশী এবং জনপ্রিয়। বর্ণনাধর্মী গবেষণা পদ্ধতিতে গবেষণার তথ্য সহজেই পাওয়া যায় এবং ব্যাখ্যা করা যায়। এই ধরনের গবেষণার ফলাফল আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে, ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য নতুন ধারণার জন্ম দেয়।

2.5.1 বর্ণনাধর্মী গবেষণার উদ্দেশ্য : (Purpose of Descriptive Research)

এই ধরনের গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষা পরিচালনা, শিক্ষা-শিখন পদ্ধতি প্রভৃতির সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা এবং তাদের সমাধানের পথ দেখানো, উদাহরণ হিসাবে Rederic Jones ১৯৭৯ সালে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা নিয়ে একটি বর্ণনাধর্মী গবেষণা করেছিলেন এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে "System of Discipline" তৈরী করেছিলেন, যা বর্তমানে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অনেক শিক্ষক ব্যবহার করেন।

2.5.2 বর্ণনাধর্মী গবেষণার তাৎপর্য ঃ (Significance of Descriptive Research)

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণনাধর্মী গবেষণার তাৎপর্যগুলি হল—

(ক) **বর্তমানের বর্ণনা ঃ** বর্ণনাধর্মী গবেষণা শিক্ষামূলক পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সদ্যঘটিত এবং বর্তমান শিক্ষামূলক ঘটনা, সমস্যাবলী এবং অথবা শিক্ষকদের ও শিক্ষার্থীদের মতামত প্রভৃতি বর্ণনা করে।

(খ) **সহজ এবং প্রত্যক্ষ ঃ** এই পদ্ধতি সহজ এবং সরাসরি ব্যবহার করা যায় সেই কারণে এটি খুবই জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

(গ) **একমাত্র** উপায় (Only Means) : অনেক সময় variables-দের manipulation (সুকৌশলে ব্যবহার) করা খুবই কঠিন। সেই কারণে আমরা এই মেথড্ ব্যবহার করি যেখানে আমরা manipulation ছাড়াই variables-দের মধ্যে বর্তমান সম্পর্ক/ যোগসূত্র নিয়ে অধ্যয়ন করি।

(ঘ) **সমাধান সম্পর্কিত মতামত** (Suggesting Solutions) : বর্ণনাধর্মী গবেষণা কেবলমাত্র বর্তমান/চলিত সমস্যার বর্ণনা করে না পরন্তু অনেক সময় শিক্ষামূলক সমস্যার সমাধানে মূল্যবান পরামর্শ দেয়। উদাহরণ ১৯৭৯ সালে F. Jones-এর গবেষণা।

(ঙ) তথ্যসংগ্রহ টুলস্-এর গঠন (Developing Data Collection Tools) : তথ্যসংগ্রহকারী যন্ত্রের (Tools) উদ্ভাবনে বর্ণনাধর্মী গবেষণা খুবই সাহায্য করে। যেমন—Questionnaries, Schedules, Checklists প্রভৃতি।

(চ) **সামান্যীকরণ এর বিকাশ সাধন** (Development of Generalizations, Principles or Theories) : চলদের (variables) মধ্যে সম্পর্ক / সংযোগ / যোগসূত্র নিয়ে বর্ণনাধর্মী গবেষণা আলোচনা করে। এটি নতুন সামান্যীকরণ, নীতি তত্ত্ব উদ্ভাবনে সাহায্য করে যার বিশ্বজনীন বৈধতা এবং উপযোগিতা আছে।

2.5.3 বর্ণনাধর্মী গবেষণার প্রকারভেদ (Types of Descriptive Research)

The Survery—Survey শব্দটি দুটি শব্দ "Sur" বা "Sor" যার অর্থ "Over" এবং "Veeis" বা "Vor" যার অর্থ "to see" নিয়ে গঠিত। Survey কথাটির অর্থ হল to look over বা "to over see"।

Webster's New Collegiate Dictionary অনুযায়ী "critical inspection, often official, to provide exact information, often a study of an area with respect to a certain condition or its Prevalance, e.g. a Survey of the School."

Survey কথাটি বাংলা হল 'তদন্ত' Survey-তে আমরা কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে যুক্ত জনগণ থেকে তথ্যসংগ্রহ করি। এটি একটি খুবই দক্ষতাপূর্ণ কার্য যা কেবলমাত্র কাল্পনিক নয় এবং পাঠের অভিজ্ঞ পরিকল্পনা, এটা আরও যথাযথ তথ্য সংগ্রহ, সযত্ন ব্যাখ্যা এবং সংগৃহীত তথ্যের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং তার ফলাফল এবং সিদ্ধান্তের বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিবেদন।

Survey নানা রকমের হতে পারে—

(ক) **School Servey** - এর মূল উদ্দেশ্য স্কুলের কর্মসূচীর সামগ্রিক কার্যকারিতা বিচার করা এবং

প্রয়োজনানুযায়ী উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দেওয়া। প্রথম ১৯৯০ সালে Boise, Idaho (USA) স্কুলে এই ধরনের সার্ভে হয়েছিল। বর্তমানে এটি স্কুলের তৎপরতার মূল্যায়নের জন্য খুবই জরুরী।

একটি বৃহৎ ব্যাপ্তি বিশিষ্ট স্কুল সার্ভেতে নিম্নলিখিত যে কোন একটি বা একাধিক বিষয় থাকতে পারে :

* সার্ভে টেস্টিং
* সাফল্য টেস্টিং
* বুদ্ধিমত্তা টেস্টিং
* ব্যক্তিত্ব টেস্টিং
* পাঠক্রম পর্যালোচনা
* মর্যাদা / মান পর্যালোচনা
* অর্থনৈতিক পর্যালোচনা
* বিদ্যালয়ভবন সার্ভে
* স্কুল মূল্যায়ন

(খ) **Job Survey** - এটি মূলত কাজের বিশ্লেষণকরা এতে শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী, পরিচালন ব্যক্তিত্বের সাধারণ ও বিশেষ কাজ এবং দায়িত্ব, কাজের পরিবেশ, সুযোগ সুবিধার প্রকারভেদ ও প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই ধরনের তথ্য নিয়োগকর্তা ও পরিচালকদের কাজের পরিবেশের উন্নতি করতে সাহায্য করে।

(গ) **Documentary Survey** - এটি ঐতিহাসিক গবেষণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কারণ এই ধরনের সার্ভেতে আমরা বর্তমানে অবস্থিত নথিপত্র নিয়ে কাজ করি। কিন্তু এটি ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে পৃথক কারণ এটি বর্তমান নিয়ে কাজের উপর জোর দেয়, অতীতের উপর নয়। বর্ণনাধর্মী গবেষণা শিক্ষাক্ষেত্রে চলিত স্কুল প্র্যাকটিস শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার, স্বাস্থ্য নথি প্রভৃতিকে আলোকিত করে।

(ঘ) **Public Opinion Survey :** প্রশ্নমালা বা ইন্টারভিউর সাহায্যে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয় যেমন বিদ্যালয় বা কলেজে সহ শিক্ষার রূপায়ন, শিক্ষার বেসরকারীকরণ প্রভৃতি ইস্যুতে জনমত সংগ্রহ করতে পারি। এটি আমাদের নির্বাচিত বিষয়ে জনগনের মতামত জানাতে সাহায্য করে যার উপর ভিত্তি করে গুরুত্বপূর্ণ এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

(ঙ) **Social Survey** - এটি কমিউনিটি সার্ভে নামেও পরিচিত। স্কুল এবং কমিউনিটির মধ্যে নিকট সম্পর্কের কারণে গবেষক কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজের শিক্ষা প্রয়োজন / চাহিদা নির্ধারণ করার জন্য, অথবা ব্যাপক অর্থে সমাজের উপকারের জন্য স্কুলের কার্যকারিতা নির্ধারন এবং তার বৃদ্ধির জন্য সামাজিক সার্ভে করে থাকেন।

(২) **পারস্পরিক সম্পর্কমূলক অধ্যয়ন (Correlational Studies)** - এই ধরনের অধ্যায়নে দুটি 'চল'

কতটা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তা নির্ধারণ করা হয়। সম্পর্কের দিক নির্দেশ (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক), পারস্পরিক সম্পর্ক ('র' দ্বারা সূচিত) তাৎপর্যপূর্ণ কিনা নির্ধারণ করা হয়। যে কোনো দিকে (+বা -) 'চল'গুলি খুব বেশি, মাঝারি তথ্য বা অল্পভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, বা কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে (শূন্য কো-রিলেশন)। কো-রিলেশন স্টাডির একটি সহজ উদাহরণ হল টিচার রিইনফোর্সমেন্ট এবং স্টুডেন্ট পারফরমেন্স এর মধ্যে কো-রিলেশন স্টাডি করা

(৩) **কারণগত তুলনামূলক অধ্যয়ন (Causal Comparative Studies)** - এইধরনের গবেষণা কারণ ও ফল প্রদর্শন করে অথবা কোনো কিছুর পেছনে কারণ দর্শায়। উদাহরণ : উচ্চ মনসংযোগ অধিকতর ভালো সাফল্য ঘটায়। কিন্তু এই ধরনের গবেষণার সীমাবদ্ধতা হল সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য কারণকে ম্যানিপুলেট করতে না (অনির্ভরশীল চল) পারা।

(৪) **গঠনমূলক অধ্যয়ন (Developmental Studies)** - এই ধরনের গবেষণা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন নিয়ে অধ্যয়ন করে। এটি দুই রকমের :

(ক) **বৃদ্ধি অধ্যয়ন (Growth Studies)** - মানুষের স্বভাব ও পরিবর্তনের হার এবং তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব নিয়ে longitudinal বা Cross sectional স্টাডি করা হয়।

(খ) **প্রবণতা অধ্যয়ন (Trend Studies)** - এই ধরনের বর্ণনাধর্মী গবেষণার উদ্দেশ্য হল সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং চলিত ধারা জানার জন্য তাদের বিশ্লেষণ করা, এবং ভবিষ্যতে কি হতে পারে তার ভবিষ্যদ্বাণী করা। শিক্ষাক্ষেত্রে ধারা (trend) অধ্যয়ন দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমান ধারা অনুসন্ধান করা এবং কিছু পদক্ষেপ প্রভৃতি পরামর্শ দেওয়া যাতে ভবিষ্যৎ চাহিদাপূরণ বা সমস্যার সমাধান করা যায়।

2.5.5 বর্ণনাধর্মী গবেষণার পদক্ষেপসমূহ (Steps in Descriptive Research)

বর্ণনাধর্মী গবেষণায় অনুসৃত পদক্ষেপ মোটামুটিভাবে অন্য ধরনের গবেষণার ন্যায়।

* সমস্যা নির্বাচন - একজন গবেষক তার ইচ্ছানুযায়ী বর্তমান অবস্থা/ঘটনা নিয়ে যে কোনো সমস্যা নির্বাচন করতে পারে। গবেষকের উচিত স্পষ্টভাবে সমস্যা বিবৃত করা এবং 'চল' দের ব্যবহারিক মতে সূচিত করা।

তত্ত্ব প্রকল্প (হাইপোথিসিস) গঠন ঃ হাইপোথিসিস সম্পূর্ণ গবেষণা প্রক্রিয়াতে গবেষককে গবেষণার সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে। উপস্থিত তত্ত্ব এবং বিষয়ের উপর ভিত্তি করে হাইপোথিসিস গঠন করা উচিত।

* তথ্য চিহ্নিতকরণ - সংগ্রহের জন্য সঠিক তথ্য (গুণগত বা পরিমানগত) চিহ্নিত করতে হবে যাতে হাইপোথিসিস সঠিক ভাবে পরীক্ষিত হয়।

* গবেষণা উপকরণ নির্বাচন - কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হবে তার প্রকৃতি অনুযায়ী সঠিক উপকরণ নির্বাচনের কাজ সহজ হয়ে যায়। যদি প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো স্ট্যান্ডার্ড টুল না থাকে গবেষণায় প্রয়োজন অনুযায়ী উপকরণ তৈরী করতে হবে।

* নমুনা নির্বাচন - এই ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব মূলক নমুনা নির্বাচন করা দরকার এবং নির্বাচনে যদি সম্ভব হয় তবে random টেকনিক ব্যবহার করা উচিত।
* তথ্য সংগ্রহ - উপকরণ ও নমুনা নির্বাচনের পর প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়।

তথ্য বিশ্লেষণ - সংগ্রহ করা তথ্য যথাযথ রাশিবিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়।

* ব্যাখ্যা / বিশদীকরণ - অনুসন্ধানকৃত ফলাফল ব্যাখ্যা করার সময় উপস্থিত তত্ত্বের উপর জোর দেওয়া উচিত এবং তার আলোকেই ফলাফলকে বিশ্লেষণ করা উচিত। আমাদের দেখা উচিত ফলাফল নতুন তত্ত্ব তৈরী করছে না পুরাতনেরই অনুরূপ।
* রিপোর্ট লিখন - শেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা আমরা পেয়েছি এবং করেছি তার একটি স্বচ্ছ এবং সঠিক রিপোর্ট তৈরী করা যাতে জনগন এই নতুন জ্ঞানের সুবিধা নিতে পারে।

2.6 পারস্পরিক সম্পর্কমূলক গবেষণা (Correlational Research)

Correlational Research - এটা এক ধরনের বর্ণনাধর্মী গবেষণা যাতে আমরা দুটি বা তার বেশি 'চলরাশি' এর (variables) মধ্যে অবস্থিত সম্পর্ক অধ্যয়ন করতে চেষ্টা করি। শিক্ষামূলক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অজানাকে জানা নয়, বিভিন্ন 'চল'দের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক বর্ণনা করাও শিক্ষামূলক গবেষণার অন্যতম কাজ: এই ধরনের ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব এবং তুলনামূলকভাবে সহজ যদি আমরা বর্তমানে উপস্থিত 'চল'দের মধ্যে মজবুত সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করি এই সম্পর্ক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই কো রিলেশনাল গবেষণা করা হয়।

2.6.1 পারস্পরিক সম্পর্কমূলক উদ্দেশ্য (Purposes of Correlational Research)

এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হল 'চল'দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অনুসন্ধান করা। কো-রিলেশনে কোন অবস্থা বা ঘটনাকে অর্থপূর্ণ পথে বুঝতে চেষ্টা করে এবং তৎসংক্রান্ত ভবিষ্যৎ পরিণতি জানতে সাহায্য করে। এই ধরনের গবেষণা আমাদের শেষ পর্যন্ত কোনো ঘটনা/অবস্থার ব্যাখ্যা করতে, ভবিষ্যৎ পরিণতি ও বিস্তৃতি জানতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

উদাহরণ B.F. Skinner একজন আচরণমূলক মনোবিদ্ অনুযায়ী বেশির ভাগ ঘটনা প্রকাশ করা যেতে x (f) y, অর্থাৎ x হল y এর কাজ (f) এবং এটা দুটির পারস্পরিক সম্পর্কের কারণেই সম্ভব। তাঁর পরীক্ষায় 'X' বলতে পায়রার আচরণ এবং 'y' বলতে প্রদত্ত রসদ (reinforcement) কে বোঝায় যার ফলস্বরূপ পায়রা নির্দিষ্ট আচরণ প্রকাশ করে (উদাঃ পাত্রে খুঁটে খাওয়া)। পায়রা পাত্রে খুঁটতে শেখে কারণ এর ফলে সে কিছু পুরস্কার (খাদ্য) পায়। এই পরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্তে এই উপনীত হন যে একটি ঘটনার কারণে অন্যটি ঘটে থাকে, যথাযথ রিইনফোর্সমেন্ট পরিচালনার কারণে পাখি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আচরণ করে।

এই অধ্যয়নের জ্ঞান এবং তথ্যের ভিত্তিতে আমরা শিক্ষামূলক এবং /অথবা শ্রেণীকক্ষমূলক পারস্পরিক সম্পর্কমূলক গবেষণা করে শিক্ষার্থীদের আচরণ বুঝতে পারি এবং বিভিন্ন প্রকার রিইনফোর্সমেন্ট ব্যবহার করে তাদের আচরণ কিছুমাত্রার নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

2.6.2 পারস্পরিক সম্পর্কমূলক গবেষণার মুখ্য বিষয়সমূহ (Major Topics of Correlational Research)

* শিক্ষনের সঙ্গে যুক্ত নানান মানব বৈশিষ্ট্য— ব্যক্তিত্ব, মনোযোগ, বুদ্ধি প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা।
* শিক্ষনের সঙ্গে যুক্ত নানান শ্রেণী কক্ষের অবস্থা/পরিস্থিতি সমূহ— শ্রেণী আয়তন, শিক্ষকের আচরণ, শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা।
* শিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত নানান টিচিং প্র্যাকটিস, পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণা।
* বিভিন্ন পরীক্ষা এবং মাপনের বৈধতা নিয়ে গবেষণা।

2.6.3 পারস্পরিক সম্পর্কমূলক গবেষণার জন্য তথ্যের উৎসসমূহ (Sources of Data for Correlational Research)

প্রকৃত পক্ষে এই ধরনের গবেষণায় তথ্যের উৎস কম, কিন্তু প্রতিটি গবেষণার তথ্য উৎস গবেষণার দুটি দিক অবশ্যই যোগান দেবে। উদাহরণ যদি দুটি শিক্ষার্থী সফলতা এবং দুশ্চিন্তা/উৎকণ্ঠার সম্পর্কের অনুসন্ধান করতে চায় তবে অবশ্যই এই দুটি চল—এর উপর নমুনার সমস্ত বিষয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

2.6.4 পারস্পরিক সম্পর্কমূলক প্রকারভেদ (Tpes of Correlatiuns)

যে কোন বিষয়ে একজোড়া বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারনের জন্য উক্ত জোড়া বৈশিষ্ট্যের test scores প্রয়োজন যা আমরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করতে পারি।

Pearson r : অধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি। এতে pairs of raw scores প্রয়োজন। উদাহরণ পরীক্ষায় শিক্ষার্থী দ্বারা বিজ্ঞান ও অংকে প্রাপ্ত নম্বর।

Spearmen 'r' : যেখানে raw scores পাওয়া যায় না কিন্তু বিষয়ে ranking পাওয়া যায়। সেখানে Spearmans's rank order correlation হিসাব করা হয়। উদাহরণ ঃ আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধানের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

Biserial 'r' যখন বিষয়ের একটি 'চল' বা বৈশিষ্ট্যের scroes আছে কিন্তু দ্বিতীয়টিকে বিভাজিত অবস্থায় (dichotomy) রাখতে হচ্ছে অর্থাৎ তাদের ব্যবহার করা হয়। (এখানে Dichotomous cut into parts) উদাহরণ মানসিক বয়স (যা মাপনযোগ্য এবং স্কোর করা যায়) এবং পরিবারে parents দের সংখ্যা নিয়ে গবেষণা যেখানে one parents বাবা বা মা নয় উভয়েই।

Tetrachoric 'r' : Biserial 'r' একটি ছিল Continous চল এবং দ্বিতীয়টি dichotomous চল two fold শ্রেণীবিভাগ) কিন্তু কখনো কখনো আমরা উভয় 'চল' dichotomous (2x2 বা four fold table) পেতে পারি। এই ক্ষেত্রে tetrachoric 'r' ব্যবহার করা হয়। এখানে উভয় চল কে মাপ বা স্কোর করা যায় না কিন্তু দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। উদাহরণ বুদ্ধিমত্তা (above average/below average) এবং আত্মবিশ্বাস (above average / below average) এখানে আমাদের গবেষণার লক্ষ্য অনুযায়ী দুই ধরনের বুদ্ধিমত্তাও দুই ধরনের আত্মবিশ্বাস এবং সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা।

Partial correlation - সাধারণত তৃতীয় চল সমস্যা দুটি চল-এর মধ্যে পরিলক্ষিত 'r'-এর ভিত্তিতে

সিদ্ধান্ত উপনীত হতে নিবৃত্ত করে। Christensen (1994) অনুযায়ী "The third variable porblem refers to the fact that the two variables may be correlated not because they are casually related but beacuse some third variable caused both of them" উদাহরণ এটা দেখা গেছে যে পড়ার ক্ষমতা এবং শব্দ ভাণ্ডার খুবই পরস্পর সম্পর্কিত কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয় 'চল' এর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ধারণ করতে চায় তবে প্রথমে বুদ্ধির প্রভাব partial out করতে চায় তবে প্রথমে বুদ্ধির প্রভাব partial out করতে হবে যা এই partial correlation পদ্ধতিতে করা হয়।

2.6.5 Research Tools - কোরিলেশনাল গবেষণার জন্য numbers, ranking বা dichotomies হিসাবে তথ্য প্রয়োজন। এই ধরনের তথ্য এর জন্য "Standardized tests" যেমন বুদ্ধির মূল্যায়নের পরীক্ষাসমূহ, "Other measuring devices" যেমন heart beat, Pulse rate প্রভৃতি, বা "Etsablished criteria" rankinking এবং dichotomies তৈরীর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

2.6.6 পারস্পরিক সম্পর্কমূলক গবেষণার ধাপসমূহ (Steps in Correlational Research) - এই ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা সহজ এবং জটিলতা মুক্ত।

* **সমস্যা নির্বাচন ও সংজ্ঞা নিরূপণ ঃ** অন্যান্য গবেষণার ন্যায় এক্ষেত্রে গবেষকের প্রথম কাজ হল সমস্যা নির্বাচন ও সংজ্ঞা তৈরী করা। এক্ষেত্রে গবেষকের উচিত ন্যূনতম দুটি 'চল', 'নির্বাচন' করা এমনকি তার বেশীও নির্বাচন করতে পারেন।

* হাইপোথিসিস গঠন ঃ সাধারণত "null" হাইপোথিসিস গঠন করা হয় কারণ এটি বজায় রাখার তুলনায় বাতিল করা অনেক সহজ। এটি সাধারণভাবে বর্ণনা করে "A এবং B"-এর মধ্যে কোন সম্পর্ক বিদ্যমান নয়।

* **তথ্য সংগ্রহ ঃ** চল এর প্রকৃতি অনুযায়ী সঠিক গবেষণার উপকরণ ব্যবহার করে স্কোর। র‍্যাংকিং বা দল অনুযায়ী সঠিক গবেষণা টুলস ব্যবহার করে জোড় তৈরী করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

* **তথ্য সংকলন ঃ** তথ্য সংগ্রহ করে এমন ভাবে নমুনা দুটি মেজারস (যেমন স্কোর, র‍্যাংকিং, বা গ্রুপিংস) প্রদর্শন করে।

* **তথ্য বিশ্লেষণ ও তার ব্যাখ্যা ঃ** দুই সেট স্কোরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য সঠিক কোরিলেশনাল টেকনিক ব্যবহার করে পরিসংখ্যানগত ভাবে তথ্যকে বিচার করতে হবে। তারপর সিদ্ধান্তকে (ফলাফল)। (ক) পারস্পরিক সম্পর্কের আকার (খ) সম্পর্কের দিক (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) এবং (গ) তাৎপর্যের লেভেল এর আলোকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করতে হবে।

(ক) **পারস্পরিক সম্পর্কের আকার ঃ** দুটি 'চল' এর মধ্যে সম্পর্কের ডিগ্রী বা আকার বা বন্ধন ক্ষমতা "Coefficient of correlation" হিসাবে প্রকাশ করা হয়। ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যাই হোক না কেন 'Coefficient' যত নিকট বা মজবুত হয় সম্পর্কও তত মজবুত বা নিকট হয়। 'Coefficient' শূন্য (কোন সম্পর্ক নেই) থেকে এক (সঠিকভাবে পরস্পর সম্পর্কিত) পর্যন্ত হতে পারে। যাইহোক গবেষণায় শূন্য এবং / বা এক এর মূল্য কখনোই পাওয়া যায় না বা খুব কম পাওয়া যায়।

(খ) **কো রিলেশনের দিক নির্দেশ ঃ** দুটি 'চলরাশির' মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে। কোরিলেশনের দিক নির্দেশ কোরিলেশনের আকারের উপর নির্ভর করে না, এবং একে অন্যের সঙ্গে কিছুই করার নেই। + 0.62 এবং –0.62 কোরিলেশন একই আকারে কিন্তু ভিন্ন সম্পর্ক প্রকাশ করে। প্রথমটি ধনাত্মক এবং দ্বিতীয়টি ঋণাত্মক। ধনাত্মক কোরিলেশান সমান্তরাল ভাবে একটি চল এর বাড়া বা কমার সঙ্গে অন্য 'চল' এর বাড়া বা কমা সূচিত করে। অপরপক্ষে একটি 'চল' এর বাড়া অন্য 'চল' এর কমা পরস্পর বিপরীত কাজ করে। তখন তাকে ঋণাত্মক কোরিলেশনাল বলে।

(গ) **পারস্পরিক সম্পর্কমূলক (কো রিলেশনের) তাৎপর্য ঃ** প্রাপ্ত কোরিলেশনের তাৎপর্য স্তরের জন্য প্রথমে আমরা কো রিলেশানের Standard error (SE) গণনা করি এবং তারপর সেই SE কে ১.৯৬ (.০৫ তাৎপর্য লেভেলের জন্য) বা ২.৫৬ (০.০১ তাৎপর্য লেভেলের জন্য) দিয়ে গুন করি। প্রাপ্ত কো রিলেশনকে আমরা অর্থপূর্ণ (significatn) মনে করি যদি এটি কে ১.৯৬ বা ২.৫৬ দিয়ে গুন করার পর প্রাপ্ত মানের চেয়ে বড় হয়।

নানান ধরনের কোরিলেশন এবং SE-র পরিসংখ্যামূলক গণনা শিখতে Garrett (1981), Ferguson (1966), charles (1988) বা অন্যান্য এই সম্বন্ধীয় বই পড়তে পারেন।

* **রিপোর্ট লিখন ঃ** অন্যান্য গবেষণার ন্যায় সমস্যা, চলরাশি, হাইপোথিসিস অধ্যয়নের ফল, প্রাপ্ত ফলাফলের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা Coefficients দিক এবং চলদের মধ্যে পারস্পরিকতা তাৎপর্য প্রভৃতি নিয়ে যুক্তিযুক্ত এবং সতর্ক ভাবে রিপোর্ট লিখতে হবে।

2.7 কারণগত তুলনামূলক গবেষণা (Causal Comparative Research)

এই ধরনের গবেষণা একপ্রকার বর্ণনাধর্মী গবেষণা যা ''ex post facto'' গবেষণা নামেও পরিচিত যার অর্থ after the fact বা from a thing done afterwards এখানে গবেষক উপস্থিত কার্যকারণ (cause-effect) সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেন। যেখানে কারণ ও ফলের উপর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয় না।

এর অর্থ কোনো কিছু হয়ে যাওয়া বা ঘটে যাওয়ার পর পরবর্তী কর্মসূচী (action) গ্রহণ এবং কারণের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে আমরা ফলকে অধ্যয়ন বা মূল্যায়ন করতে চাই।

Kerlinger (1973) অনুযায়ী ''Ex Post Facto'' গবেষণা হল একটি সুসংগঠিত পরীক্ষালব্ধ অনুসন্ধান যেখানে বৈজ্ঞানিকের স্বাধীন (independent) চল এর উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না কারণ তারা ইতিমধ্যে আত্মপ্রকাশ করে গেছে বা তারা অন্তর্নিহিতভাবে গণনাযোগ্য নয়। সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাধীন ও নির্ভরশীল 'চল'দের সহগামী পরিবর্তন থেকে অনুমান নির্ভর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

এই কারণে এই ধরনের গবেষণায় আমরা স্বাধীন 'চল' কে (কারণকে) আমরা নিয়ন্ত্রণ বা গণনা করতে পারি না। এবং সাধারণভাবে চেষ্টা করি অনুসন্ধান করতে কেন এবং কিভাবে তা ফল এর (নির্ভরশীল চল) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যদিও এই পদ্ধতি কারণ ও ফল সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে তবুও এটি প্রযুক্তিগত ভাবে

পরীক্ষামূলক গবেষণা থেকে আলাদা যেখানে আমরা স্বাধীন চল এর ম্যানিপুলেট করে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রমাণ করি। কিন্তু causal comparative গবেষণায় নানা কারণে হস্তক্ষেপ করা যায় না এবং সম্ভব ও নয় কারণ জীনতত্ত্ব/বংশগতি, সময় বা পরিস্থিতি এটি নির্ধারণ করে। এখানে 'কারণ ফল' অধ্যয়ন করার সময় কারণে হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এছাড়া ফলের (effects) অনেক কারণ থাকতে পারে কিন্তু বর্তমান কারণ ও ফল এর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন বা বর্ণনা করার জন্য দক্ষতার প্রয়োজন। এর জন্য জোরালো প্রত্যয় উৎপাদনক্ষম যুক্তি দেওয়া যায় কিন্তু প্রাপ্ত কারণ ফল সম্পর্ক পরীক্ষামূলক প্রদর্শন করা সম্ভব নয়।

2.7.1 কারণগত তুলনামূলক গবেষণার প্রকৃতি (Nature of Casual-Conparative Research)

কারণগত তুলনামূলক গবেষণা, জন স্টুয়ার্ট মিলের কারণগত সম্পর্কের অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। মিলের চুক্তি পদ্ধতি (১৮৪৬) অনুযায়ী "অনুসন্ধানরত দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার দৃষ্টান্তের যদি একটিমাত্র পরিস্থিতি সাধারণ থাকে, পরিস্থিতি, যা সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা সম্মতিপ্রাপ্ত, তাই হল প্রদত্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার কারণ।"

প্রকৃত অর্থে, এই গবেষণা শুরু হয় কোন নির্ভরশীল চলরাশি বা প্রভাবকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। এরপর, গবেষকরা অনুসন্ধান শুরু করেন সম্ভাব্য স্বাধীন চলরাশি বা কারণসমূহ নিয়ে যা নির্ভরশীল চলরাশির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। নিম্নলিখিত সাধারণ উদাহরণকে ধরা হোক—ধরা যাক, একটি পরিবার রাতের নৈশভোজনে বের হল, সকলে সেই ভোজন উপভোগ করল, ভোজনের শেষে মা এবং শিশুরা আইসক্রীমের দাবি করল এবং তারা তা পেয়ে উপভোগ করল, কেবলমাত্র পরিবারের পিতা তাদের সঙ্গ দিলেন না। কারণ তিনি এই পদটি পছন্দ করেন না। তার কিছুক্ষণ পর, তারা সকলে বাড়ী ফিরে এলেন। এক বা দুই ঘন্টা পর, মা এবং শিশুরা একটানা পেটের বেদনা অনুভব করতে শুরু করল। তারা ডাক্তারের কাছে গেলেন, তিনি তাদেরকে তাদের গ্রহণ করা খাদ্য যা তারা রেস্তোরায় খেয়েছিলেন, তা সম্পর্কে জানতে চাইলেন এবং দেখলেন যে প্রতিটি পদ তারা সকলেই ভাগ করে খেয়েছেন কেবলমাত্র আইসক্রীম ব্যতীত যা পরিবারের পিতা গ্রহণ করেননি। অজান্তে মিলের চুক্তি পদ্ধতির সাথে একমত হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আইসক্রীম হল তাদের পেটের বেদনার কারণ। কারণ এটি হল একমাত্র পদ, যা সাধারণভাবে পরিবারের সকল অসুস্থ মানুষ গ্রহণ করেছিল।

এই চিন্তাগত মতকে সুনিশ্চিত করতে, ডাক্তার পুনরায় অজান্তে মিলের মিলিত চুক্তি পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেন এবং গুরুত্ব আরোপ করেন এই বিষয়ে যে পরিবারের সদস্যরা যারা পেটের বেদনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তারা সাধারণভাবে সকলেই আইসক্রীম গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই পিতা যিনি পেটের বেদনা অনুভব করেননি। তিনি সেই পদটিও গ্রহণ করেননি। তাই, ডাক্তার, সিদ্ধান্ত নেন, আইসক্রীম, (স্বাধীন চলরাশি বা কারণ) হেতু মূলকরূপে দুর্ভোগকারীদের পেটের বেদনা (নির্ভরশীল চলরাশি বা প্রভাব) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এখন, লক্ষ্য করা যাক, উপরোক্ত উল্লিখিত উদাহরণের ন্যায়, কিছু নিশ্চিন্ত অবস্থা এবং পরিস্থিতি যেখানে একজন গবেষক হয় অসৎভাবে বা ধান্দাবাজী করে কারণটি প্রতিষ্ঠা করতে কিংবা পরীক্ষার বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ করতে সচেষ্ট হবেন না। উদাহরণস্বরূপ যদি কারণটিকে অবহেলা করে পড়া হয় অথবা ভাব প্রবণতাবশত বিষয়টি পড়া হয়, তা হলে বিষয়টির কার্যকারণ সম্পর্কটি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নিতে

সক্ষম হওয়া যাবে না। এছাড়া বিষয় সম্পর্কে অনেক কারণ দর্শিত হলেও, যুক্তিগ্রাহ্য দক্ষতার দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্কের বন্ধনকে একটি যুক্তিগ্রাহ্য কার্য কারণ সম্পর্ক বোঝাতে সাহায্য করা হবে। এক্ষেত্রে সঠিক এবং দৃঢ় কারণ স্থাপন করতে হবে যা অনুসন্ধানে পরীক্ষনীয়ভাবে কার্য্যকারণ সম্পর্কের সামঞ্জস্য পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম হওয়া যাবে না।

2.7.2 কারণগত তুলনামূলক গবেষণার গুরুত্ব (Improtance of Causal-Comparative Research)

পরীক্ষামূলক পদ্ধতি সর্বোত্তম সন্দেহাতীত, কিন্তু অনেক পরিস্থিতিতে সময়, অর্থ এবং প্রচেষ্টার মাপকাঠিতে এটি অব্যবহারযোগ্য বা ব্যয়সাপেক্ষ। এছাড়া অন্য আরও কিছু পরিস্থিতিতে নৈতিক ভাবে গবেষণায় পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। D.B. Van Dalen (1973) সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন জীবন্ত জিনিষের প্রতি শ্রদ্ধা, একজন তদন্তকারীকে অন্যের অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রণা, বা ক্ষতি করা, ব্যক্তির স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিকাশে কোনো ভাবে বাধা দেওয়া থেকে বিরত রাখে। সেই কারণে causal comparative গবেষণা ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি যে সমস্ত সমস্যা পরীক্ষাগারে অনুসন্ধান করা যায় না তাদের অধ্যয়ন করা, দুটি ঘটনার মধ্যে কারণ সম্পর্কিত সম্পর্ক নিয়ে মূল্যবান তথ্য প্রদান করে।

2.7.3 কারণ বাচক তুলনামূলক গবেষণার ধাপসমূহ (Steps in Causal-Comparative Research)

যদিও অন্যান্য গবেষণার সঙ্গে এই গবেষণার পদ্ধতিগত কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই তবুও নিম্নলিখিত বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে—

* **সমস্যা নির্বাচন ঃ** যে সমস্ত সমস্যার স্বাধীন চল এ হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ চলে না সেই সব সমস্যা নির্বাচন করা উচিত।
* **প্রকল্প গঠন ঃ** বেশির ভাগ নঞর্থক প্রকল্প (Null Hypolhesis) গঠন করা হয়।
* **তথ্য ও টুলস ঃ** বেশি জীবনবিষয়ক (biographical) তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কারণ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল বর্তমান ফল (effect) বা আচরণ ধরনের জন্য অতীত কারণ নির্ণয় করা, কারণবাচক উপাদানগুলি নির্ণয় করার জন্য নির্দিষ্ট সম্পন্ন পরীক্ষাসমূহ, কোয়েশ্চনেয়ার্স, সিডিউলস, ইন্টারভিউ, নিরীক্ষণ প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়।
* **তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ** বিষয়ের দল চিহ্নিতকরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা ঘটনা বা বৈশিষ্ট্যের প্রদর্শনগত ভাবে একে অপরের থেকে আলাদা, উদাহরণ, অপরাধবোধ প্রবণতা।
* **তথ্য বিশ্লেষণ ঃ** বিষয়ের বিভিন্ন দলের বর্তমান নির্ভরশীল চল মাপ করার তাৎপর্য জানার জন্য দিলের মধ্যে পার্থক্যসমূহ পরীক্ষা করা যেতে পারে। দুটি যোগফলের মধ্যে পার্থক্য (test), Chi-Square বা analysis of variance.
* **তথ্যের ব্যাখ্যা / বিশদীকরণ ঃ** যদি ভিন্ন উভয় দল প্রকৃতভাবে নির্ভরশীল চল এর সঙ্গে পার্থক্য সূচিত করে তখন একে কারণ ফল এর মধ্যে কারণবাচক সম্পর্ক হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এখানে যুক্তসংগত যুক্তি দেওয়া দরকার যাতে নির্দিষ্ট ফল নির্দিষ্ট কারণকে সূচিত করে। ফলপ্রসূ ব্যাখ্যা করার জন্য নিম্নলিখিত কাজ করা যেতে পারে।

  (ক) উপযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিতে হবে যাতে প্রমাণ করা যায় যে এই কারণ ছাড়া এই ফল হওয়া সম্ভব নয়।

(খ) চিহ্নিতকরণ নিজেই যথেষ্ট ফল তৈরি করতে তা দেখিয়ে দেওয়া।

(গ) এছাড়া অন্য কোনো কারণ আছে কিনা তা দেখানো যা সমানভাবে নির্দিষ্ট ফল তৈরিতে সমর্থ।

* **অনুসন্ধান লব্ধ ফলের ব্যবহার :** যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষয়টি পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কারণে হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবুও কারণ বাচক সম্পর্ক খুঁজে বের করা খুবই লাভজনক কারণ এটি ভবিষ্যৎ 'ফল'-এর জন্য আগে থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করে।
* **রিপোর্ট লিখন :** এই ধরনের গবেষণার রিপোর্ট লেখার জন্য যথেষ্ট দক্ষতা থাকা দরকার।

2.7.4 সীমাবদ্ধতা (Limitations)

* এই ধরনের গবেষণা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
* প্রাসঙ্গিক কারণ চিহ্নিত করা খুবই জটিল।
* সাধারণত কারণ বহুবিধ, একক নয়।
* একই ফলের জন্য ভিন্ন পরিস্থিতি ভিন্ন কারণ হতে পারে।
* এমনকী চলদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার পরও কে কারণ কে ফল তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন।
* বিষয় নির্বাচন এবং তাদের বৈপরীত্যমূলক শ্রেণীতে বিভক্ত করা খুবই কঠিন।

এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের গবেষণা খুবই উপযোগী যা পরীক্ষামূলক গবেষণার খুব ভালো পরিপূরক। যেখানে আমরা স্বাধীন চল এর ক্ষেত্রে আমরা হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না কিন্তু দুটি চল এর কারণ বাচক সম্পর্ক স্থাপন জরুরী সেখানে এই ধরনের গবেষণা করা যায়।

2.8 পরীক্ষামূলক গবেষণা (Experiemental Research)

উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির দিক দিয়ে কারণবাচক তুলনামূলক গবেষণা ও পরীক্ষামূলক গবেষণা প্রায় একই। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য যা উভয়কে পৃথক করে তা হল 'কারণ'। কারণবাচক তুলনামূলক গবেষণায় কারণ এ হস্তক্ষেপ করা যায় না কিন্তু পরীক্ষামূলক গবেষণা হস্তক্ষেপ করা যায় এবং ফলের পরিবর্তন করা যায়। শিক্ষামূলক গবেষণায় সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য গবেষণা পদ্ধতি হল পরীক্ষামূলক গবেষণা, যার দ্বারা আমরা প্রকৃত কারণ বাচক সম্পর্ক অনুসন্ধান করে থাকি।

"John W. Best 1977 অনুযায়ী "Experimental research is the description and analysis of what will be or what will occur, under carefully controlled conditions."

"Experiment" বলতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে 'স্বাধীন চল' বা চলদের 'নির্ভরশীল চল'-এর উপর প্রতিক্রিয়া অধ্যয়ন করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে এক বা একাধিক কারণ কিভাবে ফলের উপর কি ধরনের পরিবর্তন ঘটায় তা অধ্যয়ন করা হয়। স্বাধীন চল এবং নির্ভরশীল চল এর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক অনুসন্ধান করার জন্য বাহিরের অবাঞ্ছিত 'চল'দের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যারা গবেষণার ফলাফল এবং মন্তব্যকে দূষিত বা বিকৃতি সাধন করতে পারে।

2.8.1 পরীক্ষামূলক গবেষণার প্রকৃতি (Nature of Experimental Research)

পরীক্ষামূলক গবেষণার চারটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল—

* **নিয়ন্ত্রণ (Control) :** পরীক্ষামূলক গবেষণায় নিয়ন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্য হল এমন পরিবেশ বা পরিস্থিতি তৈরী করা (বেশীর ভাগই পরীক্ষাগারে) আকাঙ্খিত চল এর ফল নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পরিমাপ করা যায়। যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে বাইরের অবাঞ্ছিত চলদের অপসারণ করতে না পারি, নিয়ন্ত্রণ করে তাদের প্রভাব কমাতে পারি।
* **পর্যবেক্ষণ (observation) -** পরীক্ষা নিরীক্ষা চলাকালীন স্বাধীন চলদের উপর বুদ্ধিমত্তা সঙ্গে হস্তক্ষেপ করে নির্ভরশীল চল এর উপর এই হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া সতর্কতার সঙ্গে নিরীক্ষণ এবং নথিভূক্ত করা হয়।
* **পুনরাবৃত্তি (Replication) -** নৈর্ব্যক্তিক এবং সতর্কতার সঙ্গে বাইরের অবাঞ্ছিত চলদের নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও কিছু অনাকাঙ্খিত এবং অনিয়ন্ত্রিত চল, গবেষণার ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করে। সেই সব এবং অন্যান্য বৈষম্য গবেষণার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অপসারণ করা যায়।
* **হস্তক্ষেপ (Manipulation) :** এই ধরনের গবেষণায় আমরা স্বাধীন চল-এর উপর ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করতে পারি। বাড়িয়ে বা কমিয়ে বা অপসারণ করে নির্ভরশীল চল-এর উপর প্রভাব অধ্যয়ন করা যায়।

2.8.2 শিক্ষায় পরীক্ষামূলক গবেষণার মূল্য (Value of Experimental Research in Education)

পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে ১৮৭৯ সালে Wundt জার্মানীর Leipzig University তে একটি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষাগার খুলে শিক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়নের নতুন দরজা খুলে দিয়েছেন। তারপর থেকে এই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি 'সায়েন্টিফিক মেথড' হিসাবে পরিগণিত হয়েছে যা বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান ভাণ্ডার গড়ে চলেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করে Campbell এবং Standley (1963) লিখেছেন শিক্ষামূলক কাজের নানান গলদের / ত্রুটির সমাধানের শিক্ষামূলক উন্নয়নের যাচাই, ক্রমাগত সংযোজন ধারা প্রতিস্থাপন / প্রচলন যাতে পুরনো ধ্যান ধারণার সম্পূর্ণ ত্যাগ করার মতো বিপজ্জনক চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়েও উন্নয়ন ও অভিনবত্ব যোগ করা যায় তার জন্য একমাত্র পথ হল পরীক্ষা নিরীক্ষা করা।

শিক্ষামূলক পরীক্ষানিরীক্ষা মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচী এবং পরিকল্পনার নির্ভুলতা, যথার্থতা এবং কার্যকারিতা নির্ধারণ এবং মূল্যায়ন করা যায়। এর উপর ভিত্তি করে আরও পরীক্ষা করে কার্যকরী কিংবা প্রয়োজন অনুযায়ী বর্তমান শিক্ষানীতি কর্মসূচী এবং শিক্ষা অভ্যাসের প্রভৃতির পরিবর্তন করা যায়।

2.8.3 পরীক্ষামূলক গবেষণার পদক্ষেপ সমূহ (Steps in Experimental Research)

(ক) **সমস্যার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের তদন্ত ঃ** সর্ব প্রথম কাজ হল সমস্যা ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা। সমস্যাক্ষেত্রের সর্বশেষ সাহিত্যের তদন্ত সমস্যাক্ষেত্রের এখনও পর্যন্ত কি কাজ করা হয়েছে, পুনরায় কি করা উচিত তার সঙ্গে আমাদের অভিযোজিত করে।

(খ) **সমস্যা নির্বাচন, সংজ্ঞা তৈরী এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসের বর্জন ঃ** তদন্তের পরে সমাধানযোগ্য গবেষণাযোগ্য, তাৎপর্যপূর্ণ, অভিনব এবং ব্যবহারিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নির্বাচন করা উচিত। চল এর প্রয়োগিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা।

চলরাশি (Variable) : (Vary + able, which can vary or change) : চলরাশি হল একটি বৈশিষ্ট্য যার ভিন্ন মূল্যমান বা পর্যায় আছে। 'চলরাশি' হল তাই যার তারতম্য ঘটে, যা নির্দিষ্ট নয়। যেমন উষ্ণতা, ওজন, বুদ্ধি, দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, স্মৃতি প্রভৃতি। প্রধানতঃ তিন প্রকার চলরাশি আছে—

* **স্বাধীন বা স্বতন্ত্র চলরাশি ঃ** এটি পরীক্ষকের চলরাশি বলেও পরিচিত, কারণ এটিকে কাজে লাগিয়ে বিষয়ের উপর এর প্রভাব অনুসন্ধান করা হয়। যেমন— মোটিভেশন লেভেল, শিক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি।

* **নির্ভরশীল চল ঃ** এটি বিষয়ের চলরাশি যা স্বাধীন চলরাশির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিষয়ের আচরণ বা পরিণতি যা গবেষক পরিমাপ করতে চান। উদাহরণ—শিখনের মাত্রা অবশ্যই মোটিভেশন লেভেল বা শিক্ষা পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হবে।

* **বহিরাগত চল ঃ** যে সব চল পরীক্ষকের দ্বারা সংযোজিত হয় না বা নির্ভরশীল চলের উপর যাদের প্রভাব অধ্যয়ন করা হয় না, বা কোনো সম্পর্ক নেই এমন চলদের বহিরাগত চল বলে। যদি এইগুলি চিহ্নিত এবং নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তবে এরা নির্ভরশীল চল এর উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণ ঃ শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিস্তর : যদি কোনো পরীক্ষায় বুদ্ধি স্তর নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তবে এটি শিখনে, শিক্ষা পদ্ধতির কাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

(গ) **প্রকল্পের বর্ণনা ঃ** পরীক্ষা হল প্রকল্পকে যাচাই করার একটি প্রক্রিয়া। উপস্থিতি সাহিত্যের ভিত্তিতে আমরা গবেষণা প্রকল্প তৈরী করি যা গবেষণা প্রক্রিয়ায় আমাদের পরিচালিত করে।

(ঘ) **গবেষণার পরিকল্পনা ও রূপরেখা তৈরী ঃ** গবেষণা রূপরেখা হল ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের বিশদ পরিকল্পনা যা কিভাবে পরীক্ষা করতে হয় তা নির্দেশ করে। D. B. Van Dalen (1973) অনুযায়ী একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা তৈরী করতে নিম্নলিখিত কাজ করতে হবে,

* বহিরাগত চলরাশিদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ।

* সঠিক এবং যথাযথ গবেষণা নকশা নির্বাচন, গবেষণার নকশা তৈরী বিষয় বিশেষ ভাবে জানার জন্য Christensent (1994) Kow (1997) বা রিসার্চ মেথোডোলজির উপর যে কোনো বই পড়া যেতে পারে।

* প্রতিনিধিত্ব মূলক নমুনা নির্বাচন সমসম্ভব random পদ্ধতিতে গবেষণার নকশা অনুযায়ী বিষয়ের সীমা নির্ধারণ।

* গবেষণা যন্ত্রপাতি নির্বাচন করা বা তৈরি করে বৈধতা প্রদান করা।

* তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির রূপরেখা তৈরী করা, যদি সম্ভব হয় রূপরেখা এবং নমুনা প্রভৃতির ভুলত্রুটি জানার জন্য পাইলট প্রোজেক্ট করা, যাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায়।

(ঙ) **প্রকৃত পরীক্ষকরা ও তথ্য সংগ্রহ ঃ** গবেষণার পরিকল্পনা ও নকশা তৈরীর পরবর্তী কাজ হল পরীক্ষা চালানো এবং নির্ভরশীল চল এর পরিমাপ করা।

(চ) **তথ্য ও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ঃ** অন্যান্য গবেষণার মতো সঠিক পরিসংখ্যান প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্য শ্রেণী বিভাগ, তালিকাবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করা হয়। তারপর প্রাপ্ত ফলাফল ব্যাখ্যা করে-- প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করা হয় যার উপর ভিত্তি করে গবেষণা প্রকল্প বজায় রাখা বা বর্জন করা হয়, প্রমাণিত বা অপ্রমানিত বলে বিবেচিত হয়।

(ছ) **সিদ্ধান্ত ও সামান্যীকরণ ঃ** আমাদের সিদ্ধান্ত অবশ্যই পপুলেশন-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত যা প্রকৃতভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। পপুলেশন এবং অধ্যয়ন করা পরিস্থিতি ও[illegible] সব সঙ্গে ফলাফলকে অতিরিক্ত সামান্যীকরণ করা উচিত নয়।

(জ) **রিপোর্ট [illegible] ঃ** অন্যান্য গবেষণার ন্যায় প্রাপ্ত ফল এবং সিদ্ধান্ত নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিযুক্ত ভাবে এবং দক্ষত[illegible] সঙ্গে গবেষণা রিপোর্টে লিখতে হবে।

2.8.4 পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সুবিধাসমূহ ([illegible]ntages of Experimental Method)

অন্যান্য গবেষণার তুলনায় এই ধরনের গবেষণায় নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা পাওয়া যায়।

(ক) **কার্যকারণ সম্পর্কের দিক প্রতিষ্ঠিত করা ঃ** কারণবাচক তুলনামূলক গবেষণায় আমরা 'চল' দের মধ্যে কারণবাচক সম্পর্ক স্থাপন করলেও কারণে হস্তক্ষেপ করতে না পারার জন্য কার্যকরণ সম্পর্কের দিক নির্ধারণ করতে পারি না। কিন্তু পরীক্ষামূলক গবেষণায় চল-দের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারি। তাই কারণও ফল এর মধ্যে কারণবাচক সম্পর্কের দিক নির্ধারণ করতে পারি।

(খ) **অবস্থা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত থাকে ঃ** পরীক্ষাতে অবস্থা/পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং গবেষণার লক্ষ্য অনুযায়ী এতে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি।

(গ) **বিশ্বাসযোগ্য এবং বৈধ্য ঃ পরীক্ষামূলক** পদ্ধতি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য এবং বৈধ সিদ্ধান্ত এবং সামান্যীকরণ করে থাকে।

(ঘ) **নৈর্ব্যক্তিক / নিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানভিত্তিক ঃ** পরীক্ষামূলক গবেষণা বিষয়ভিত্তিক, এবং বিজ্ঞানভিত্তিক ও নিরপেক্ষ। এতে ব্যক্তিগত পছন্দ, পক্ষপাতিত্ব, বহিরাগত চল নিয়ন্ত্রিত থাকে।

(ঙ) ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে।

(চ) **সম্ভাবনা ও পুনরাবৃত্তি ঃ** যদি গবেষণাটি পুনরায় করতে চাওয়া হয় এবং আগের ফলাফল যাচাই করতে চাই তবে তা এই পদ্ধতিতে করা সম্ভব।

2.8.5 পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধাসমূহ (Limitations and Disadvantages of Experiments)

উপরোক্ত সুবিধাগুলি থাকলেও পরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

(ক) **'চল'দের নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জটিল ঃ** সামাজিক এবং শিক্ষামূলক ঘটনাবলী খুবই জটিল। পরীক্ষার সময় সমস্ত ধরনের চলদের সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন।

(খ) **সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ** ঃ এই ধরনের পরীক্ষার জন্য সুসংগঠিত পরীক্ষাগার প্রয়োজন।

(গ) **কৃত্রিমতা** ঃ পরীক্ষাগারে নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ফলে বিষয়ের আচরণ স্বাভাবিক থাকে না, অর্থাৎ কৃত্রিম আচরণ অধ্যয়ন করা হয়।

(ঘ) **কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে অবস্থা তৈরি করা কঠিন** ঃ পরীক্ষাগারে সব রকমের পরিস্থিতি যেমন সত্যিকারের ভয়, বিষণ্ণতা, আনন্দ প্রভৃতি তৈরী করা যায় না। নৈতিক বিবেচনা পরীক্ষাগারে কিছু অবস্থা সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে যার ফল অধ্যয়ন করা হবে।

(ঙ) **বিষয়ের সহযোগিতা** ঃ পরীক্ষাগারে বিষয়ের সত্যিকারের আন্তরিক সহযোগিতা কাম্য যা পাওয়া খুবই কঠিন।

(চ) **পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্ব** ঃ সর্বোপরি পরীক্ষক একজন মানুষ যার ভুলভ্রান্তি ও পক্ষপাত/পূর্বধারনা আছে। পরীক্ষকের ঝোঁক, পূর্ব ধারণা, অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। যা অধ্যনের ফলাফলের উপর বিপরীত প্রভাব পড়বে।

2.9 ঘাত গবেষণা (Action Research)

১৯৩০ সাল থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে অ্যাকশন রিসার্চের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। ১৯২৬ সালে Buckingham প্রথম তার বই 'Research for Teachers' তে অ্যাকশন রিসার্চের এর ধারণাটি ব্যবহার করেন কিন্তু Stephen M. Corey শিক্ষামূলক সমস্যার অধ্যয়ন ও সমাধানে প্রথম অ্যাকশন রিসার্চ ব্যবহারের কৃতিত্ব অর্জন করেন। ফলিত গবেষণা ও অ্যাকশন রিসার্চ হিসাবে পরিগণিত। যাইহোক কিছু মানুষের ধারণা এই দুই গবেষণা পৃথক কারণ অ্যাকশন রিসার্চ কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষ পরিস্থিতিতে উপযুক্ত যেখানে ফলিত গবেষণার ক্ষেত্র হয়েছে সুবিশাল। Corey (1953) -এর মতানুযায়ী অ্যাকশন রিসার্চ বর্তমান অবস্থার উন্নয়নের জন্যই ব্যবহার করা হয়।

Corey (1953) মতানুযায়ী "The process by which practitioners attempt to study their problem scientifically in order to guide. correct and evaluate their decision & action." পরবর্তীকালে বলেন "action research is a process for studying problems by practitioners scientifically to take decision for improving their curent practices"

Wallace (1998) -এর মতানুযায়ী অ্যাকশন রিসার্চ দৈনন্দিন কাজের সুসংগঠিত ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণ যাতে ভবিষ্যতে কি ধরনের কাজ করা হবে তার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে অ্যাকশন রিসার্চকে ফলিত গবেষণারূপে শিক্ষকগণ, উপদেষ্টাগণ, বিদ্যালয় পরিচালকগণ শ্রেণী কক্ষের সমস্যার সমাধান পাঠদানের উন্নতির জন্য পরিচালিত করেন। আমরা বিদ্যালয়ের এবং শ্রেণীকক্ষ অনুশীলনের উন্নতির সম্ভাবনা, বৃত্তিমূলক এবং শিক্ষকের ব্যক্তিগত বৃদ্ধি ও বিকাশ, অধিকতর উন্নত পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যবই তৈরী নিয়ে গবেষণা করতে পারি। Best ও Khan (২০০০)-এর মতানুযায়ী অ্যাকশন রিসার্চের উদ্দেশ্য হল বিদ্যালয় অনুশীলন সমূহের উন্নয়ন করা ও একই সঙ্গে সে সব বিষয় অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত গবেষণা পদ্ধতি সমূহের সংযুক্তিকরণ, চিন্তাভ্যাস, অন্যের সঙ্গে সুসংগতিপূর্ণ ভাবে কাজ করার সমর্থতা, পেশাদারী মনোভাবের উন্নয়নের জন্য এই ধরনের গবেষণার প্রয়োজন।

এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে অ্যাকশন রিসার্চ সরাসরি কাজের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রধানত তৎক্ষনাৎ ব্যবহারের উপর কেন্দ্রীভূত। সাধারণ ব্যবহার বা সামান্যীকরণ বা তত্ত্ব তৈরীর জন্য পরিচালন করা হয় না। এই ধরনের গবেষণা একটি স্থানীয় ব্যবস্থায় সমস্যার 'এখানে' এবং 'এখন' এই ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে এবং এর ফলাফল স্থানীয় ব্যবহার যোগ্যতার নিরীখে মূল্যায়িত হয়। বিশ্বজনীন ব্যবহার ও বৈধতার নিরীখে নয়। NCERT শিক্ষাক্ষেত্রে সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতির মাধ্যমে এই ধরনের গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশের জন্য ও গবেষণার বিস্তারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

2.9.1 অ্যাকশান রিসার্চের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Action Research)

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে অ্যাকশন রিসার্চের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া হল ঃ

* এটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া, যা শিক্ষার বর্তমান ব্যবহারিক সমস্যাবলীর পর্যালোচনা ও তার উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে।
* এটি হল ব্যক্তিগত গবেষণা যা চিকিৎসা সংক্রান্ত উপযোগিতার জন্য পরিচালিত হয়।
* কেবলমাত্র অনুশীলনকারীরা সমস্যার অধিকতর ভালো ভাবে অধ্যয়ন করতে পারেন।
* এটি বর্তমান অনুশীলনের উন্নয়ন ও পরিবর্তনের উপর কেন্দ্রীভূত।
* এর তত্ত্বগত ভাণ্ডারে সংযোজনের পরিবর্তে শিক্ষামূলক সমস্যা অনুশীলনকারীর স্থানীয় ব্যবস্থায় স্থানীয় ব্যবহার যোগ্যতা নিয়ে অধ্যয়ন করে।

2.9.2 অ্যাকশান রিসার্চের লক্ষ্যসমূহ (Objectives of Action Research)

* বিদ্যালয়ে সমস্যাক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং কাজের পরিবেশের উন্নয়ন করা।
* পড়াশুনার জন্য শিক্ষকগণ, শিক্ষার্থী অধ্যক্ষ এবং পরিচালকদের মধ্যে বর্তমান শিক্ষা।
* সমস্যা নিয়ে অধ্যয়ন ও বুঝতে পারা এবং সমাধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত ধারণার বিকাশ সাধন করা।
* বিদ্যালয়ের কার্যাবলীতে সর্বোত্তম উৎকর্ষতার বিকাশ ঘটানো।
* শিখনের জন্য অধিকতর ভালো পরিবেশ তৈরী করা।
* শিখনের সুস্থ পরিবেশ তৈরী করে শিক্ষার্থীদের সাফল্য লাভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তোলা।

2.9.3 অ্যাকশন রিসার্চের পদক্ষেপ সমূহ (Steps in Action Research)

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার কিছু পরীক্ষামূলক কাজ করা হয়ে থাকে, যা বিজ্ঞানসম্মত নয়, সেটা অ্যাকশন রিসার্চ বলে পরিগণিত হয় না। অ্যাকশন রিসার্চ বিজ্ঞানসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমস্ত উপাদানযুক্ত।

(1) **সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচন ঃ** একজন শিক্ষক স্কুলের শিক্ষাদান, পরীক্ষা, পাঠ্যবহির্ভূত কার্যাবলী, পরিচালন এবং প্রতিষ্ঠান নিয়ে সমস্যা চিহ্নিত ও নির্বাচন করতে পারেন। সমস্যা ক্ষেত্র চিহ্নিত করার সময় শিক্ষকের যথেষ্ট ধারণা নৈর্ব্যক্তিক এবং ব্যবহারিক হবে।

(2) **সমস্যার সংজ্ঞা নিরুপনে অপ্রয়োজনীয় অংশের বর্জন :** নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং কাজের ভিত্তিতে সমস্যাকে বর্ণনা করতে হবে। সমস্যা কাজকে নির্দিষ্ট করে শ্রেণী, বিষয়, বিভাগ এবং পর্যায় এর ভিত্তিতে অপ্রয়োজনীয় অন্যান্য সমস্যাকে বাদ দিয়ে।

(3) **সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ :** নির্দিষ্ট সমস্যার সম্ভাব্য নানা কারণ নির্ধারণ করে যথাযথ প্রমাণের ভিত্তিতে কারণ ও সমস্যার মধ্যে যুক্তিসংগত সম্পর্ক স্থাপন করা। এইভাবে আমরা সমস্যার প্রকৃত কারণ সমূহ লিপিবদ্ধ করি।

(4) **অ্যাকশন প্রকল্প গঠন :** প্রকল্প গঠন করা অত্যন্ত জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত কারণ এই গবেষককে অজানা বিষয় এবং তত্ত্বের অনুসন্ধানে পথ নির্দেশ করে। অ্যাকশন গবেষণায়ও সমস্যার সম্ভাব্য কারণের ভিত্তিতে প্রকল্প তৈরী করা হয়।

(5) **গবেষণার রূপরেখা গঠন :** তথ্য সংগ্রহ করার আগে গবেষণার নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করা উচিত যার ভিত্তিতে প্রকল্পকে প্রতিষ্ঠিত বা ভুল প্রমাণ করা যায়। অ্যাকশন গবেষণায় গবেষণার রূপরেখার প্রকৃতি নমনীয় যা যে কোন সময় পরিস্থিতির বা প্রমাণের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়। এটি পদ্ধতি, নমুনা ও তথ্য সংগ্রহের প্রযুক্তি নিয়ে গঠিত।

(6) **তথ্য সংগ্রহ :** নির্দিষ্ট রূপরেখা/পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্বাচিত গবেষণা টুলস কোয়েশ্চেনেয়ার্স, ইন্টারভিউ, নিরীক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এখানে আমরা বিষয়ের প্রতিক্রিয়া / উত্তর নথিভুক্ত ও পরিমাপ করি।

(7) **তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা :** তথ্য তালিকাভুক্ত করার পর সঠিক এবং প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। যাতে আমাদের প্রকল্প সম্বন্ধে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

(8) **সিদ্ধান্ত / দূরকল্পন :** প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যবহারিক সমস্যার সঠিক এবং যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত নতুন জ্ঞান, তথ্য এবং সমাধান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এখানে গবেষক পুনরায় গবেষণা করা সমস্যাক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কি ঘটবে তা নিয়ে প্রকল্প তৈরি করতে পারেন।

(9) **ইন্টারভেনিং :** পরবর্তী অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আগের অনুশীলন বা শ্রেণী কক্ষের প্রয়াস/প্রচেষ্টার পরিবর্তন সাধন করা, এখানে গবেষণার ভিত্তিতে গৃহীত সমস্যার সমাধান কতটা কার্যকরী তার যাচাই করা হয়।

(10) **নিরীক্ষণ :** সমাধান সূত্র প্রয়োগের ফলে সমস্যার কতটা সমাধান পুনরায় পরবর্তী পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারি যার দ্বারা আমরা দেখতে পারি পরিবর্তন সমূহ আমাদের প্রসারিত প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কিনা এবং আমাদের প্রকৃত সমস্যার প্রকৃত সমাধান করছে কিনা।

(11) **গবেষণা রিপোর্ট লিখন :** এখানে সমস্ত কাজকর্ম, তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া, ফলাফল রিপোর্ট হিসাবে লেখা হয়। জন সমক্ষে গবেষণার উপস্থাপনা সুনিশ্চিত করা উচিত।

2.10 ক্ষেত্র স্তরে গবেষণা (Field Level Research)

ক্ষেত্র বিবেচনার ভিত্তিতে কোথায় গবেষণা পরিচালিত করা যায়/কত ধরনের গবেষণা হয়? নীচে লিখুন।

ক্ষেত্র স্তরের গবেষণাকে অনমনীয়তা কঠোরতা এবং প্রক্রিয়া অনুযায়ী দুটি বিভাগে ভাগ করা যায়।

2.10.1 ক্ষেত্র পরীক্ষণ (Field Experimantation)

এটি এক ধরনের গবেষণা যেখানে এক বা একাধিক স্বাধীন চল্ এর উপর সক্রিয় হস্তক্ষেপ এবং পরিস্থিতিতে বহিরাগত চলদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে বাস্তব জীবনে বা বাস্তবিক পরিস্থিতিতে অধ্যয়ন করা হয়।

ফিল্ড এক্সপেরিমেন্টশন-এর সীমাবদ্ধতা (Limitation of Field experimantation)

(ক) পরীক্ষাগারে পরীক্ষার মতো নয় যেখানে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ থাকে। সাধারণভাবে যত আমরা পরীক্ষাগার থেকে দূরে যাই আমরা নিয়ন্ত্রণ হারাই।

(খ) নমুনা নির্বাচনে স্বচ্ছতা (randamization) প্রয়োগ করা খুবই জটিল।

(গ) অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং উপাদানসমূহ নির্ভরশীল চল-দের প্রভাবিত করে।

(ঘ) গবেষকদের পক্ষপাত সমূহ নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন যা গবেষণ প্রক্রিয়া ও ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করে।

তবুও ফিল্ড এক্সপেরিমেন্টেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমস্ত ধরনের সমস্যা আমাদের পরীক্ষাগারে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে করা সম্ভব নয়। এমনকি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও সম্ভব নয়। অনেক সময় কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয় পরীক্ষাগারেই অধ্যয়ন যার সম্ভব নয়, যাদের ক্ষেত্র পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যায়। Tunnell (1997) মত অনুযায়ী কেবলমাত্র অধিক সংখ্যায় ক্ষেত্র পরীক্ষা করা নয়,- বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক প্রকৃত বিশ্ব পরিস্থিতিতে পরিচালিত করাও দরকার। তত্ত্বের পরীক্ষা ছাড়াও ক্ষেত্র পরীক্ষা প্রকৃত বিশ্ব সমস্যার সমাধান করে

2.10.2 ক্ষেত্র অধ্যয়ন (Field Studies)

Kerlinger (1973) এর মতানুযায়ী ক্ষেত্র অধ্যয়ন হল 'expost facto' বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যা প্রকৃত সামাজিক গঠনে সমাজমূলক, মনস্তাত্ত্বিক এবং শিক্ষামূলক চলদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। তিনি সব ধরনের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন, ছোটো বা বড় যা সুসংগঠিত ভাবে সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রকল্পের যাচাই, 'expost facto', যা প্রকৃত জীবন পরিস্থিতিতে যেমন বিদ্যালয়, গোষ্ঠী, কারখানা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর করা হয়ে থাকে— এদের প্রত্যেককে ক্ষেত্র অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই গবেষণায় গবেষক সাধারণত স্বাধীন চলরের উপর হস্তক্ষেপ করেন না

এবং প্রকৃত সামাজিক বা প্রতিষ্ঠানিক পরিবেশে বিষয়ের ধারণা, প্রত্যক্ষকরণ/ বোধশক্তি, মূল্যবোধ এবং আচরণের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়ন করেন।

ক্ষেত্র অধ্যয়নের প্রকার ভেদ (Types of Field studies)

Katz-এর মতানুযায়ী ক্ষেত্র অধ্যয়ন দুই রকমের

(1) **অনুসন্ধানমূলক (Exploratory) :** এই ধরনের ক্ষেত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হল কি হয় / ঘটে জানা। এর প্রধান লক্ষ্য

(ক) ক্ষেত্র পরিস্থিতিতে তাৎপর্যজনক চলদের অনুসন্ধান।

(খ) চলদের মধ্যে দুটি চল-এর মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধান করা।

(গ) সুসংগঠিত এবং দৃঢ়ভাবে প্রকল্পের যাচাই-এর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

(2) **প্রকল্পের যাচাইকরণ ঃ** বৈজ্ঞানিক গবেষণার ন্যায় ক্ষেত্র অধ্যয়নে প্রকল্পের যাচাই এর জন্য কিছু প্রাথমিক পদ্ধতিগত ও পরিমাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন যার পর আমরা প্রকল্প ধরে রাখি, গ্রহণ করি বা বর্জন করি।

ক্ষেত্র অধ্যয়নের সক্ষমতা (Strengths of field studies)

* বাস্তবিকতা - এটি প্রকৃত জীবনের নিকটতম এবং এই ধরনের গবেষণায় কৃত্রিমতার কোন জায়গা নেই।
* এটি সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ সমস্যার ব্যবহারিক সমাধানের পথ দেখায়।
* চলদের বন্ধনজোর তত্ত্ব পর্যালোচনা এবং হিউরিস্টিক গুনমানের দিক থেকে এই ধরনের অধ্যয়নে অধিক জোরালো।

ক্ষেত্র অধ্যয়নের দুর্বলতা (Weakness of field studies)

* expost facto বৈশিষ্ট্য হল এই ধরনের গবেষণার সব থেকে বেশী সীমাবদ্ধতা
* ক্ষেত্র পরিস্থিতির অধিকতর জটিলতার কারণে ক্ষেত্র চলদের সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়।
* বিষয়ের কিছু অন্তর্নিহিত দুর্বলতা হল - নমুনা নির্বাচন, সহজবোধ্যতা, সময় ও ব্যয়।

ক্ষেত্র অধ্যয়ন শুরু করার আগে গবেষকের সময়, দক্ষতা, শ্রম ও অর্থের প্রয়োজন কতটা তার মূল্যায়ন ও বিচার করা উচিত। এটি মনে করা হয় যে একজন দক্ষ/অনুসন্ধানকারী হওয়া ছাড়াও একজন গবেষককে ভালো সেলসম্যান, পরিচালক ও উদ্যোগী হওয়া দরকার।

2.11 এককের সারাংশ (Unit Summary)

এই বিভাগে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কি ধরনের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে সমস্যা, চলদের উপর হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা সময়, ব্যয় প্রভৃতির উপর। যদিও সমস্ত পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্ব আছে তবুও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত এবং বাস্তব সম্মত।

2.12 অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। ঐতিহাসিক গবেষণায় তথ্য উপাদান মূল্যায়িত হয়।

(ক) উপাদান বিশ্লেষণ

(খ) মূল্যায়ন অধ্যয়ন

(গ) এক্সটার্নাল ক্রিটিসিজম বা বাহ্যিক সমালোচনা

(ঘ) ইন্টারনাল ক্রিটিসিজম বা আভ্যন্তরীণ সমালোচনা

২। বর্ণনামূলক গবেষণায় ব্যবহৃত হয় না।

(ক) ডেভেলপমেন্টাল স্টাডিস

(খ) হিস্টোরিক্যাল স্টাডিস

(গ) কোরিলেশনাল স্টাডিস

(ঘ) স্মাল কমপ্যারেটিভ স্টাডিস

৩। যখন উভয় চল এর প্রকৃতি Dichotomus তখন কোন ধরনের কোরিলেশনাল টেকনিক সঠিক

(ক) পার্সিয়াল কোরিলেশান

(খ) কার্লপিয়ারসন 'r'

(গ) স্পিয়ারম্যান 'r'

(ঘ) টেট্রাক্রোরিক 'r'

৪। যখন স্বাধীন চল-এর বৃদ্ধির সঙ্গে নির্ভরশীল চল হ্রাস পায় তখন কোরিলেশান কোন দিকে

(ক) উর্দ্ধমুখী, (খ) নিম্নমুখী, (গ) ধনাত্মক, (ঘ) ঋণাত্মক

৫। দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর স্মৃতির উপর ইলেকট্রিক শকের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা উচিত নয় কারণ ঃ

(ক) সময়ের জন্য

(খ) অর্থের জন্য

(গ) নৈতিক কারণে

(ঘ) প্রচেষ্টাগত কারণে

৬। যদি দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর উপর ইলেকট্রিক শক এর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা হয় তবে কোনটি নির্ভরশীল চল হবে

(ক) ইলেকট্রিক শক

(খ) স্মৃতিশক্তি

(গ) দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী

(ঘ) উপরের সবগুলিই

৭। কৃত্রিমতা সমস্যা হল অন্যতম ত্রুটি

(ক) পরীক্ষামূলক গবেষণা

(খ) ঐতিহাসিক গবেষণা

(গ) বর্ণনাধর্মী গবেষণা

(ঘ) অ্যাকশন গবেষণা

2.13 বাড়ীর কাজ (Assigenment)

"Each type of research can be conducted in a particular set of conditions" ব্যাখ্যা কর।

2.14 আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion/Clarification)

____

____

____

____

____

____

2.15 উৎস (Reference)

1. Best J. W. and Kahn J. V. (2000) *Research in Education* (7th ed.) New Delhi : Prentice-Hall of India Pvt. Ltd.
2. Campbell, D. T. and Stanley, J. C. (1963) Experimental and quasi-experimental designs for research on teaching. In N. L. Gage (Ed.) *Handbook of Research in Teaching*. Chicago : Rand Mc Nally and Company.
3. Charles. C. M. (1988) *Introduction to Eductional Research*. New York : Logman.
4. Corey, S. M. (1953) *Action Research to Improve School Practices*. New York : Teachers College, Columbia University.
5. Ferguson, G. A. (1966) *Statistical Analysis in Psychology and Eduction*. New York : McGrawHill.

6. Garrett, H. E. (1981) *Statistics in Psychology and Education* (10th Indian ed.). Bombay : Vakils, Feffer and Simons Ltd.

7. Good, C. V. Barr, A. S. and Scates, D. E. (1941) *Methodology of Educational Research.* New York : Appletion-Century Crofts, Inc.

8. Jones. F. (1979). The gentle art of classroom discipline *In national Elementary Principal, 58* : 26-32.

9. Kerlinger, F. N. (1983) *Foundations of Behevioural research* (2nd ed.). Delhi : Surjeet Publications.

10. Kothari, C. R. (190) *Research Methodology : Methods and Techniques* (2nd ed.). New Delhi : Wishwa Prakashan.

11. Koul. L. (1997) *Methodology of Educational Research.* New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

12. Mill J. S. (1946) *A System of Logic,* New York : Harper and Raw.

13. Travers, R. M. W. (1958) *An Introduction to Educational Research.* New York : The McMillan Company.

14. Tunnell, G. B. (1997) ; Three dimensions of naturalness : An expanded definition of field research. Pshychological Bulletin 84, 426-437.

15. Wallace, M. J. (1988) *Action Research for Language Teachers,* Cambridge : Cambridge University Press.

একক ৩ ❑ গবেষণা প্রস্তাবনা ও গবেষণা পদ্ধতি (Research Proposal and Research Process)

গঠন

3.1 ভূমিকা

3.2 উদ্দেশ্য

3.3 গবেষণা প্রস্তাবনা কি

3.4 গবেষণা প্রস্তাবনার গুরুত্ব

3.4.1 গবেষকের জন্য

3.4.2 তত্ত্বাবধায়কের জন্য

3.4.3 আর্থিক সহায়তাকারী সংস্থার জন্য

3.5 গবেষণা প্রস্তাবনার প্রকারভেদ

3.5.1 ডিগ্রীর জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা

3.5.2 আর্থিক সহায়তার জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা

3.5.3 সরকারী অনুদানের জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা

3.6 কিভাবে গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করতে হয়

3.6.1 প্রকল্প শিরোনাম

3.6.2 সমস্যা-মন্তব্য

3.6.3 সংজ্ঞা, ধারণা, সীমাবদ্ধতা এবং সীমানা চিহ্নিতকরণ

3.6.4 সাহিত্য পর্যালোচনা

3.6.5 তত্ত্ব প্রকল্প গঠন

3.6.6 পদ্ধতি

3.6.7 তথ্যসহায়ক

3.6.8 সময় নির্ঘন্ট

3.6.9 বরাদ্দ/বাজেট তালিকা/নির্ঘন্ট

3.7 কার্যকারী গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরীর জন্য পরামর্শ

3.8 কিভাবে গবেষকের জীবন-পঞ্জিকা তৈরী করতে হয়

3.9 গবেষণা পরিচালনার পদ্ধতি ও ধাপসমূহ

3.9.1 ধাপ-১ গবেষণা সমস্যা

(ক) সমস্যা সনাক্তকরণ

(খ) সমস্যা উৎস

(গ) ভালো সমস্যার বৈশিষ্ট্য

(ঘ) 'চল'সমূহ

(ঙ) 'চল'-এর প্রকারভেদ

(চ) 'চল'-এর কার্যগত সংজ্ঞাসমূহ

3.9.2 ধাপ-২ সাহিত্য পর্যালোচনা

(ক) সাহিত্য পর্যালোচনার তাৎপর্য

(খ) সাহিত্য পর্যালোচনার উৎসসমূহ

3.9.3 ধাপ-৩ তত্ত্বপ্রকল্প গঠন

(ক) তত্ত্বপ্রকল্পের গুরুত্ব

(খ) ভালো প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য

(গ) তত্ত্বপ্রকল্পের আকার/ধরন

3.9.4 ধাপ-৪ গবেষণা 'পদ্ধতি বিজ্ঞান'

(ক) গবেষণা রূপরেখা

(খ) নমুনা ও নমুনা চয়ন পদ্ধতি

(গ) তথ্যসংগ্রহের যন্ত্রসমূহ / হাতিয়ারসমূহ

3.9.5 ধাপ-৫ তথ্য সংগ্রহের প্রণালী

3.9.6 ধাপ-৬ তথ্য বিশ্লেষণ ও বিশদীকরণ

3.9.7 ধাপ-৭ রিপোর্ট লিখন

3.10 এককের সারাংশ

3.11 অগ্রগতির মূল্যায়ন

3.12 বাড়ীর কাজ

3.13 আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

3.14 উৎস

3.1 ভূমিকা (Introduction)

স্থাপত্য শিল্পী প্রকৃত গৃহ নির্মাণের আগে তার মূল নক্সা/ম্যাপ তৈরী করে থাকেন, যা তাকে আকাঙ্খিত কাজ এবং ভুলত্রুটি মুক্ত হওয়ার পথ দেখায়। এটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পদক্ষেপ এবং দিক নির্দেশ করে। একইভাবে শিক্ষামূলক এবং/অথবা শ্রেণীকক্ষ গবেষণায় গবেষণা প্রস্তাব গবেষককে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সাহায্য করে। এই অধ্যায়ে আমরা গবেষণা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রত্যেক গবেষণায় কিছু নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া/কার্যপ্রণালী আছে, যা প্রতিটি গবেষকের জানা অবশ্যই উচিত।

3.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

* গবেষণার প্রস্তাব বর্ণনা করতে পারা।
* গবেষণার প্রস্তাব এর গুরুত্ব বুঝতে পারা।
* গবেষকের তথ্য পঞ্জিকা (Bio-data) তৈরী করতে পারা।
* সমস্যা এবং প্রকল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও বর্ণনা করতে পারা।
* চল-এর ব্যাখ্যা এবং প্রকারভেদ করতে পারা।
* সাহিত্যের পর্যালোচনা/পুনর্বিবেচনার (review of literature) উৎস চিহ্নিত করতে পারা।
* গবেষণার মেথডোলজি বর্ণনা করতে পারা।
* তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের টুলস-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা।
* ফলাফলের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে পারা।
* গবেষণা প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা ও তালিকাবদ্ধ করতে পারা।

3.3 গবেষণা প্রস্তাবনা কি ? (What is a Research Proposal ?)

গবেষণা প্রস্তাবনা বিষয়ে নিজের মতামত দিন—

Koul (1997) এর মত অনুযায়ী- গবেষণা প্রস্তাবনা হল সুসংগঠিত পরিকল্পনা যা পরিকল্পিত অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনের প্রাথমিক পরিকল্পনার প্রতি আলোকপাত করে।

3.4 গবেষণা প্রস্তাবনার গুরুত্ব (Importance of a Research Proposal)

গবেষণা প্রস্তাবনার গুরুত্বকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় -

* গবেষকের জন্য
* গবেষণার সুপারভাইজারের জন্য
* ফান্ডিং এজেন্সির জন্য

3.4.1 গবেষকের জন্য (For the Researcher)

গবেষণা প্রস্তাবনা একটি মূল নকশা। নানা প্রতিষ্ঠান গবেষকদের কাছে/গবেষণা প্রস্তাবনা বা সংক্ষেপ অনুমোদনের জন্য গবেষণার বিষয় চেয়ে থাকে। এই প্রস্তাবনা গবেষক গবেষণার সময় কি পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করবে তার পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। এটি প্রস্তাবনার গাইডলাইন অনুযায়ী গবেষকের কাজকে গ্রহণযোগ্য ও সহজ করে। সঠিক গবেষণা প্রস্তাবনাকে কখনো কখনো গবেষণার অর্দ্ধেক কাজ বলা হয়।

3.4.2 তত্ত্বাবধায়ক / সুপারভাইজার-এর জন্য (For the Research Supervisor)

গবেষণার প্রস্তাবনা সুপারভাইজারকে তার কাজের (তদারকির) ভিত্তি প্রদান করে। গবেষক তারা কাজের বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য সুপার ভাইজারের কাছে প্রদান করেন। সুপারভাইজার গবেষণার প্রস্তাবনাটি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মতামত এবং পরামর্শ নিতে পারে। বারংবার পর্যালোচনা করে সর্বশেষ খসড়া তৈরি করা হয়। এটি গবেষণা চলাকালীন গবেষকের কাজের উন্নয়ন এর জন্য প্রয়োজনীয় গাইড করতে সুপারভাইজারকে সাহায্য করে।

3.4.3 আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার জন্য (For the Funding Agencies)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC), NCERT, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ (ICSSR) এবং অন্যান্য জাতীয়স্তরের এবং/অথবা রাজ্যস্তরের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ রিসার্চ করার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এই ধরনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানই গবেষণা প্রস্তাবনা সংক্ষেপে চেয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষজ্ঞ কমিটি থাকে; যারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষকের যোগ্যতা, গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা, সম্ভাব্য গবেষণার ব্যবহারিক উপযোগিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং পরবর্তী অবস্থা, ফলাফল তাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সফল করবে কিনা তা বিচার করেন। এরপর আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেয় যদি তাদের বাজেট থেকে থাকে।

3.5 গবেষণা প্রস্তাবনার প্রকারভেদ (Types of Research Proposal)

গবেষণার প্রকারভেদ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গবেষণা প্রস্তাবনাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

3.5.1 ডিগ্রীর জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal for Degree)

এই ধরনের গবেষণা মাস্টার ডিগ্রির বা ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষকেরা করে থাকে। বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নতুন গবেষকদের থেকে গবেষণা প্রস্তাবনা চেয়ে থাকে এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা মূল্যায়ন করে থাকে। বিশেষজ্ঞরা সম্ভাব্য গবেষণার তাৎপর্য, উপযোগিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, নির্ধারণ করে এবং পরিবর্তনের মতামত দিয়ে থাকে।

3.5.2 আর্থিক সহায়তার জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal for Financial Assistance)

অনেক সময় গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ গবেষকের পক্ষে বহন করা সম্ভব হয় না তখন আর্থিক সহায়তার জন্য সরকারী বা ব্যক্তিগত সংস্থার কাছে আর্থিক সহায়তা চাওয়ার জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা দরকার হয়। আর্থিক সহায়তাকারী সংস্থা তাদের বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বারা মূল্যায়ন করে মন্তব্য এবং/বা সুপারিশের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়।

3.5.3 সরকারী অনুদানের জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal for Grants by Goverment)

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, UGC, NCERT, ICSSR প্রভৃতি আর্থিক সহায়তাকারী সংস্থাগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণার বিস্তারের উদ্দেশ্যে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য গবেষণা প্রস্তাবনা চেয়ে থাকেন।

3.6 কিভাবে গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরী করতে হয় ((How to Prepare a Research Proposal)

গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরীর সর্বজনস্বীকৃত কোন নির্দিষ্ট আকার (format) নেই। বেশীরভাগ সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান তাদের নির্দিষ্ট আকার (format) অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাবনা চেয়ে থাকে। যাইহোক প্রতিটি ফরম্যাটে নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা থাকে, যাতে গবেষকের পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবনার মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট তথ্য থেকে থাকে। কিছু তথ্য সবধরনের প্রস্তাবনায় একই থাকে।

* সমস্যার তাৎপর্য এবং মন্তব্য।
* পরিকল্পিত গবেষণার আয়তন নির্ধারণ এবং তৎসংক্রান্ত উপাদানের বিশদীকরণ।
* তথ্য সংগ্রহের উৎস এবং প্রক্রিয়া।
* নীতি রূপায়ণ এবং তথ্য বিশ্লেষণ।
* সময় ও খরচের পরিকল্পনা।
* গবেষকের জীবনপঞ্জী।

3.6.1 পরিকল্পনার শিরোনাম (The Title of the Project)

এটি বিষয়ের নাম এবং কাজের মূল ভাবনা প্রকাশ করে। শিরোনাম নির্বাচনে বাহারী শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে সহজ এবং বোধগম্য বৃত্তিমূলক ভাষা এবং পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত। শিরোনাম সংক্ষিপ্ত এবং নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। নির্দিষ্ট বলতে যে বিষয়ে কাজ করা হবে তাকে সূচিত করে। সুতরাং ভালো শিরোনাম সম্ভাব্য পরিকল্পনার প্রকৃতি এবং যথাযথ তথ্য প্রদান করে।

3.6.2 সমস্যা সম্বন্ধীয় মন্তব্য (Statement of the Problem)

সমস্যা ঘোষিত মন্তব্য বা প্রশ্নাকারে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এটি উদ্দেশ্যরূপে গবেষককে পথ নির্দেশ করে। সাধারণভাবে সমস্যা বলতে ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা বা দোদুল্যমান বা ভিন্নমতকে বোঝায়। বই, জার্নাল, বিশেষজ্ঞের মতামত, তত্ত্ব, আগের গবেষণা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রভৃতি উৎস হিসাবে সমস্যা তৈরীতে সাহায্য করে।

গবেষক এবং মূল্যনির্ধারণকারী উভয়েরই সমস্যার তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোকপাত করা দরকারী। গবেষণার বিষয় বর্তমান জ্ঞান ভাণ্ডার কতটা সমৃদ্ধ করতে পারে বা কতটা শিক্ষামূলক তত্ত্ব এবং/বা অনুশীলনে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাও দেখানো উচিত।

গবেষকের তার গবেষণার তাৎপর্য, প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করা উচিত। শিক্ষামূলক গবেষণার মান বজায় রাখার জন্য মূল্য নির্ধারণকারী প্রস্তাবিত কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা পরীক্ষা করা উচিত।

3.6.3 সংজ্ঞা, ধারণা, সীমাবদ্ধতা, সীমা নির্ধারণ (Definitions, Assumptions, Limitations and Delimitations)

গবেষকের বিরল পরিভাষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা উচিত যাতে অন্যে ভুলটা বুঝতে পারে। গবেষণা প্রস্তাবনার চলদের প্রয়োগিক সংজ্ঞা দেওয়া উচিত। এই সংজ্ঞা সমূহের মাপ কাঠিতে সমস্যার আলোচনা করা হয়।

ধারণা হল মন্তব্যসমূহ, যেগুলি ঘটনা হতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা ছাড়া যাদের যাচাই করা যায় না। গবেষকের তার প্রস্তাবনার ধারণাসমূহের বিশদ এবং ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

সীমাবদ্ধতা হল অনিয়ন্ত্রিত শর্তসমূহ যারা অধ্যয়নের সিদ্ধান্তকে প্রতিহত করে এবং তাদের ব্যবহার ও অন্য পরিস্থিতিতে সামান্যীকরণে বাধা তৈরী করে। নমুনা নির্বাচনে অসমর্থতা। তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈধ টেস্টের ব্যবহারে অসমর্থতা গবেষণা প্রস্তাবনায় সঠিকভাবে উল্লেখ করা দরকার।

সীমা নির্ধারণ- গবেষণার ক্ষেত্রের সীমাচিহ্নিতকরণ, একটি পরিকল্পনা দশমশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সাফল্য লাভের আগ্রহ নিয়ে আলোকপাত করতে পারে। এখানে সিদ্ধান্ত পরিকল্পনার বাইরে বিস্তৃত করা যাবে না।

3.6.4 সাহিত্যের পর্যালোচনা (Review of the Literature)

গবেষণা প্রক্রিয়ায় প্রথম পদক্ষেপ হল সাহিত্যের পর্যালোচনা করা। পর্যালোচনার সময় জ্ঞানের মধ্যে

ফাঁক, অস্পষ্ট বা পরস্পর বিরোধী ফলাফল দেখা যেতে পারে যা গবেষণার মাধ্যমে পূরণ বা অপসারণ করা যেতে পারে। যেহেতু এটা একটা গবেষণা প্রস্তাব (থিসিস বা ডিসার্টেশন নয়) সেহেতু তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষালব্ধ কর্মপন্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে যেখান থেকে সমস্যা তৈরী করা হয়েছে। কেবলমাত্র পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য টীকাযুক্ত অধ্যয়ন সমূহের তালিকা তৈরী করা অপ্রয়োজনীয়, অফলপ্রসূ এবং সম্পূর্ণ বেঠিক। কেবলমাত্র নির্বাচিত সমস্যার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক গবেষণারই রিপোর্ট করা উচিত। আমাদের সমস্যার সঙ্গে গ্রহণযোগ্য সর্বশেষ ফলাফল-এর উপর আলোকপাত করা দরকার। বর্তমান সাহিত্যের ভিত্তিতে সমস্যার গবেষণা অনুসন্ধান এবং অধ্যয়নের উপর জোর দেওয়া দরকার। পত্র-পত্রিকা, বই, ম্যাগাজিন প্রভৃতিতে সম্পর্কিত গবেষণার উল্লেখ জরুরী।

সাহিত্যের পর্যালোচনার কিছু সুবিধা আছে—

প্রথমতঃ গবেষক যে সমস্যার নির্বাচনে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে তা সূচিত করে। এছাড়া যা গবেষণা হয়েছে এবং যা হওয়া উচিত তার সম্পর্কে সচেতন করে।

দ্বিতীয়তঃ এই গবেষণার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সুযোগও থাকে না।

তৃতীয়তঃ জানা বিষয়ের ভিত্তিতে সমস্যার প্রকল্প তৈরি করতে গবেষককে সাহায্য করে।

3.6.5 প্রকল্প (Hypothesis)

প্রকল্প হল সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান যা সংগ্রহ করা তথ্যের বিশ্লেষণ করে যাচাই করা হয়। গবেষণা প্রস্তাবনায় প্রয়োজনানুসারে একটি মুখ্য ও একাধিক গৌণ প্রকল্প থাকতে পারে। প্রকল্প কেবলমাত্র অনুমান নির্ভর নয়; পরন্তু এটি যুক্তি ও পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরী। এটি তথ্য জমায়েত ও গবেষণা প্রক্রিয়ার পথ নির্দেশ করে। প্রকল্প গঠনের সময় যতদূর সম্ভব সহজ পরিভাষা এবং ভাষার ব্যবহার করা উচিত। প্রকল্প যুক্তিযুক্ত এবং পূর্ব জ্ঞাত বিষয় এবং অথবা তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রকল্প এমনভাবে বিবৃত করা উচিত যাতে আমরা একে যাচাই/পরীক্ষা করতে পারি এবং সত্য বা মিথ্যা হিসাবে দেখতে পারি।

এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রকল্প সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান যা পরীক্ষা করে ভুল বলেও প্রমাণ করা যায়, এর জন্য দুঃখিত হওয়ার কারণ নেই এবং এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল যদি প্রকল্প বর্জন করতে হয় তবুও রিপোর্ট নৈর্ব্যক্তিকভাবে লেখা উচিত কখনোই আমাদের প্রকল্প অনুযায়ী তথ্যের পরিবর্তন করা উচিত নয়। সুতরাং প্রকল্প পরীক্ষা হল একটি গবেষণা বা পরিসংখ্যানমূলক যাচাই প্রক্রিয়া। এটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা তথ্য সংগ্রহ করার আগে প্রকল্প গঠন করি, যা আমাদের নির্বাচিত সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানে সাহায্য করে।

3.6.6 পদ্ধতি (Method)

গবেষণা প্রস্তাবনার এই অংশে আমরা সাধারণত নমুনাকরণ প্রক্রিয়ায় বিষয়ের প্রকৃতি, ব্যবহৃত টুলস, প্রক্রিয়া তথ্য বিশ্লেষণ প্রযুক্তি যা তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহার করা হয় তা নির্দিষ্ট করি।

(ক) **বিষয় (Subjects) :** এই বিভাগে আমরা যে জনবসতি থেকে নমুনা নিতে চাই তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে থাকি। যদিও এটি সমস্যার উপর নির্ভর করে যার সমাধান করতে চাই তবুও

প্রায় ব্যবহৃত চলগুলি হল বিষয়ের বয়স, লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বুদ্ধ্যাঙ্ক (IQ) প্রভৃতি। এখানে নমুনার আকার (সংখ্যা) নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি (কিভাবে জনবসতি থেকে নমুনা নির্বাচন করা হবে) ও বর্ণনা করতে হবে। গবেষণা প্রস্তাবনাকে সফল বলে বিবেচনা করা হয় যদি পাঠক স্পষ্টভাবে নমুনা নির্বাচনের জায়গা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে।

(খ) **উপকরণ (Tools) :** গবেষণার তথ্য সংগ্রহ বা প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য যে কোন নির্ভরযোগ্য ও বৈধ টুলসের ব্যবহার অপরিহার্য। গবেষক যে কোন নির্দিষ্ট মানযুক্ত বর্তমান বা গবেষণার প্রয়োজনানুসারে নিজস্ব টুলস ব্যবহার করতে পারে। টুলস তৈরীর জন্য গবেষককে গঠন পদ্ধতি, তার পরীক্ষা এবং প্রয়োগপ্রণালী সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষ হতে হবে।

গবেষককে তার গবেষণা প্রস্তাবনায় যে টুলস ব্যবহার করা হবে তার বর্ণনা, নির্ভরযোগ্যতা বৈধতা, নির্বাচনের কারণ বর্ণনা করতে হবে। টুলস গঠনে প্রক্রিয়ার রূপরেখা এবং কি ধরনের পরীক্ষা ও মানোন্নয়ন করতে চায় তাও জানাতে হবে।

(গ) **কার্যপ্রণালী (Procedure) :** এখানে গবেষণা পরিকল্পনা রূপরেখা নির্দিষ্ট করতে হবে। এখানে গবেষণার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ—কি করতে যাচ্ছি, কি করা হবে, কি ধরনের তথ্য প্রয়োজন, কিভাবে তা সংগ্রহ করা হবে, প্রসেসিং ও বিশ্লেষণ করা হবে তা বর্ণনা করতে হবে। নির্দিষ্ট গবেষণার লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে গবেষণার কার্যপ্রণালী ঠিক করা হয়, যেমন মেল কোয়েশ্চেনেয়ার্স-এর ব্যবহার 'ইন্টারভিউ' বা 'নিরীক্ষণ' থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক।

(ঘ) **তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis) :** প্রধানত তথ্য দুই প্রকারের—গুণমানগত ও পরিমাণগত। উভয় ধরনের তথ্য পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। কি ধরনের পরিসংখ্যান প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে, কিভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করা হবে তা নির্ভর করে নির্দিষ্ট গবেষণার উপর। যদি কম্পিউটারের সাহায্যে তথ্য প্রসেস করা হয় তাও গবেষণা প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা দরকার।

3.6.7 তথ্যসহায়ক (References / Bibliography)

গবেষণা প্রস্তাবনায় সমস্ত তথ্য সহায়কের তালিকাভুক্ত করা উচিত। যে সমস্ত বিষয়বস্তু গবেষণা প্রস্তাবনা গঠনে সাহায্য করেছে তাদেরও উল্লেখ করা দরকার। গ্রন্থপঞ্জি তৈরীও উপস্থাপনা করা উচিত যাতে প্রাসঙ্গিক তথ্য আছে যা উদ্ধৃত করা হয়েছে বা হয়নি। এটির তালিকা বর্ণক্রমানুযায়ী তৈরি করা উচিত।

3.6.8 সময় নির্ঘন্ট (Time Schedule)

গবেষণা প্রস্তাবনায় গবেষকের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় সময়ের বাস্তব তালিকা সূচিত করতে হবে। গবেষণাকে অধ্যায়ে ভাগ করে প্রতিটি অধ্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া যেতে পারে। এটি সময়ের সুসংগঠিত ব্যবহার ও দীর্ঘসূত্রতার/ঢিলেমির স্বাভাবিক প্রবণতাকে ন্যূনতম করতে সাহায্য করে। নিম্নে একটি সম্ভাব্য সময় তালিকা দেওয়া হল যা গবেষক পরিবর্তন করতে পারে।

ধাপ /পর্ব	নির্দিষ্ট কাজ	সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সময়
I. এক	প্রস্তুতিমূলক কাজ/গবেষণা সহায়কের নির্বাচন ও নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ (যদি প্রয়োজন হয়)।	এক মাস
II. দুই	পাইলট কাজ যদি থাকে	১ মাস
III. তিন	নমুনা ও টুলস নির্বাচন (টুলসের প্রিটেস্টিং ও প্রিন্টিং সমেত)।	২ মাস
IV. চার	টুল গঠন যদি প্রয়োজন হয়	২ মাস
V. পাঁচ	তথ্যসংগ্রহ	২ মাস
VI. ছয়	তথ্য প্রসেসিং	৩ মাস
VII. সাত	তথ্য বিশ্লেষণ	৩ মাস
VIII. আট	রিপোর্ট লিখন	২ মাস

যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পাদন করতে হবে, সেখানে সময় পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সময়তালিকা, গবেষণার সুপারভাইজারকে গবেষণার অগ্রসরের উপর নজর রাখতে সাহায্য করে। সময় তালিকা প্রেরণাকারক হিসাবে গবেষককে অধিকতর সুসংগঠিত এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার সর্বশেষ উদ্দেশ্য অর্থাৎ গবেষণা সম্পূর্ণ করার দিকে এগোতে সাহায্য করে।

Head of the Account

১। প্রয়োজনীয় গবেষণা সহায়ক প্রয়োজনীয় অর্থ পরিমাণ (টাকায়)

পজিশান	ব্যক্তিসংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন (অ্যালাউন্সসহ)	সময়	টাকার পরিমাণ

২। পরিবহন খরচ :

৩। স্টেশনারী ও মুদ্রণ :

৪। টুলস বা যন্ত্রপাতি বাজেটের ৫% বেশী হওয়া উচিত নয়। :

৫। বই, পত্রিকা প্রভৃতি :
(বাজেটের ৫০%-এর বেশী)।

৬। অন্যান্য খরচ :

৭। তথ্য প্রসেসিং খরচ :

৮। অন্য কিছু (নির্দিষ্টভাবে লেখা দরকার :

৯। মোট খরচ সংখ্যায় .... টাকা

ভাষায় ....

গবেষণা প্রস্তাবনায় অর্থের বিভাজন খুবই জরুরী কারণ আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা এটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে। এটি অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির পরামর্শ অনুযায়ী করা দরকার।

3.7 একটি কার্যকরী গবেষণা প্রস্তাবনা গঠনের জন্য উপদেশসমূহ ((Suggestions for Preparing an Effective, Research Proposal)

গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরী হল ফলিত চারুকলা এবং বুদ্ধিমত্তাযুক্ত কাজ।

* গবেষণা প্রস্তাবনা খুব যত্নশীল ও সতর্কভাবে করা উচিত। অন্যথায় মূল্যায়নকারীদের কাছে এটি মনে হতে পারে যে গবেষণায় অবহেলা হতে পারে। সংস্থার প্রস্তাবিত ফরম্যাট অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাবনা গঠন করা উচিত।
* সমস্যার বিবরণী সহজ ভাষায় এমনভাবে দিতে হবে যাতে এর তাৎপর্য ও জ্ঞান ভাণ্ডারে অবদান প্রতিফলিত হয়।
* অনুসন্ধানে ক্ষেত্রের সঙ্গে যে অপরিচিত এবং খাপছাড়া নয় তা সূচিত করা এবং সমস্যা সম্পর্কিত বর্তমান প্রবণতা ও অনুসন্ধানলব্ধ ফলাফল সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে তা প্রমাণ করা।
* প্রকল্প মন্তব্য সঠিকভাবে গঠন করা উচিত এবং প্রকল্পের ভিত্তি ও নির্দেশ করা উচিত।
* প্রস্তাবিত কার্যক্রমের বিশদীকরণ করা দরকার।
* নমুনা চয়ন পদ্ধতি, টুলসের ব্যবহার, ব্যবহারের যৌক্তিকতা ও তাদের নির্ভরযোগ্যতা ও বৈধতা প্রভৃতি সঠিকভাবে বর্ণনা করা দরকার।
* বহিরাগত চল যাদের ঋণাত্মক প্রতিফলন আছে গবেষণার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং অথবা তাদের প্রভাব ন্যূনতম করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ সম্বন্ধে জানানো দরকার।
* তথ্যের উপর যে পরিসংখ্যান প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে তার জন্য যুক্তি প্রদান করা।
* বিভিন্ন খাতে খরচের যুক্তিযুক্ত পরিকল্পনা ও তার উপস্থাপনা করা।
* জীবনী-পঞ্জিকাতে নিজের আকর্ষণীয় ভাবমূর্তি উপস্থাপনা করা (অতিশয়োক্তি নয়) এবং পরিকল্পনা গ্রহণ নৈর্ব্যক্তিক ও সফলতার সঙ্গে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষমতার পরিচয় রাখা অবশ্য জরুরী।

3.8 কিভাবে গবেষকের জীবন-পঞ্জিকা তৈরী করতে হয় ? (How to Formulate the Biodata of Researcher ?)

১। আবেদনকারীর নাম (বড় অক্ষরে) ____________________

২। বাবা/মায়ের নাম ____________________

৩। কোন পজিশনে আছে ____________________

৪। কাজের জায়গা ____________________

৫। প্রতিষ্ঠানের নাম ____________________

৬। স্থায়ী ঠিকানা (পিন কোডসহ) ____________________

৭। যোগাযোগের ঠিকানা (পিনকোড সহ) ____________________

৮। দূরাভাষ নম্বর (STD সহ) ____________________

(ক) অফিস বা বাসস্থানের ____________________

৯। জন্ম তারিখ—সংখ্যায় ____________________

১০। (ক) জন্মস্থান ____________________

(খ) জাতীয়তা ____________________

১১। শিক্ষাগতযোগ্যতা (স্নাতক স্তরে নীচ থেকে)

ডিগ্রী	পাশের বছর	মূখ্য, বিষয়সমূহ	বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান	ডিভিশন/ গ্রেড	মন্তব্য যদি থাকে

১২। বৃত্তিমূলক যোগ্যতা

ডিগ্রী	পাশের বছর	মূখ্য, বিষয়সমূহ	বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান	ডিভিশন/ গ্রেড	মন্তব্য যদি থাকে

১৩। গবেষণার অভিজ্ঞতা

১৪। প্রকাশিত গবেষণা

(ক) প্রকাশিত পেপার সংখ্যা

(খ) প্রকাশ করার জন্য গৃহীত পেপার সংখ্যা

(গ) প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা

(ঘ) প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় বই সংখ্যা

(প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত কাগজে লাগানো যেতে পারে।)

১৫। গবেষণা প্রজেক্ট সমাপ্ত করেছেন বা কাজে নিযুক্ত আছেন—

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়ের শিরোনাম	আর্থিক সহায়তার উৎস	পরিমাণ বরাদ্দ ও ব্যবহার	কাজ শুরুর তারিখ	সম্পাদন করার সম্ভাব্য তারিখ	প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি

১৬। এই প্রস্তাবনা অন্য কোথাও একই সময়ে বিবেচনার জন্য অন্য ফান্ডিং সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে কিনা, যদি হ্যাঁ তবে বিশদ বিবরণ—

ক্রমিক নং	ফান্ডিং সংস্থার নাম ও ঠিকানা	আবেদনের তারিখ	ফলাফল	মন্তব্য

১৭। এই প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করার সময় যদি কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্য বিবেচনা হওয়া উচিত মনে হয় তবে প্রয়োজনানুযায়ী অতিরিক্ত কাগজ সংযোজন করা যেতে পারে।

গবেষণা প্রস্তাবনা সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করার পর (শিরোনাম, সমস্যা, সাহিত্য পর্যালোচনা, প্রকল্প, সময় ও বাজেট তালিকা, গবেষকের জীবন পঞ্জিকা প্রভৃতি), আবেদনপত্রের শেষে স্বাক্ষর করার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়ের সত্যতা বিষয়ে ঘোষণা করতে হয়।

এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি প্রতিষ্ঠান/সংস্থার এই পরিকল্পনার নিয়মাবলী পড়েছি, যদি আমার প্রজেক্ট অনুমোদিত হয়/আর্থিক সহায়তা পায় তবে নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব। আমি প্রজেক্ট নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করব। যদি আমি তা করতে অসমর্থ হই এবং যদি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা গবেষণার কাজের অগ্রগতি নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তবে প্রতিষ্ঠান/সংস্থা আমার প্রজেক্ট তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিতে পারে এবং গৃহীত অর্থ (যদি নেওয়া হয়ে থাকে) ফেরৎ দিতে বলতে পারে। এটি পুনরায় ঘোষণা করছি যে উপরিউল্লেখিত সমস্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সঠিক।

তারিখ ঃ .... স্বাক্ষর

3.9 গবেষণা পরিচালিত করার কার্যক্রম ও পদক্ষেপ সমূহ (Steps and Procedure of Conducting A Research Study)

গবেষণা পরিচালিত করার কার্যক্রম ও পদক্ষেপসমূহ ঃ

(ক) **গবেষণা - সমস্যা ঃ** কখনো কখনো আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি যে কিছু আমরা জানিনা এবং আমরা জানতে বা অনুসন্ধান করতে চাই সে অজানাকে। গবেষণার পরিভাষা বিজ্ঞানে একে সমস্যা বলা হয়। গবেষণা প্রক্রিয়া এই সমস্যা চিহ্নিতকরণও গঠনের মাধ্যমে শুরু হয়।

(খ) **সাহিত্যের পর্যালোচনা ঃ** সমস্যা নির্বাচনের পর আমরা সাহিত্যরূপ সমুদ্রে ডুব দিই সমস্যা নিয়ে ইতিমধ্যে গবেষণা করা হয়েছে কিনা বা সম্পর্কিত গবেষণায় কি হয়েছে তা জানার জন্য।

(গ) **প্রকল্প গঠন ঃ** সাহিত্যের পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমরা সমস্যার সঙ্গে গ্রহণযোগ্য আধুনিকতম/সর্বশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তদন্তফল নির্বাচন করি, প্রকল্প গঠন করি যা গবেষণা প্রক্রিয়ায় পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করি।

(ঘ) **পদ্ধতি বা গবেষণার মেথডোলজি ঃ** সমস্যা নির্বাচন ও কাজের জন্য প্রকল্প তৈরী করে আমরা সমস্যার সমাধানের এবং প্রকল্প পরীক্ষা করার জন্য গবেষণা পরিকল্পনা তৈরী করি। এখানে আমরা নির্দিষ্টভাবে গবেষণার রূপরেখা, নমুনা, টুলস যা সমস্যা অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করি।

(ঙ) **তথ্য সংগ্রহ ঃ** গবেষণার প্রয়োজন অনুযায়ী নমুনাচয়নের পদ্ধতি এবং টুলস অনুযায়ী নমুনা নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ শুরু করি।

(চ) **তথ্য / ফলাফল বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ঃ** সংগ্রহ করা তথ্য যুক্তিযুক্তভাবে তালিকা ও আকারে / সংগঠিত করা হয় যাতে পরিসংখ্যানগত ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। তারপর প্রাপ্ত ফল বর্তমান জ্ঞান এবং প্রকল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করি। এখানে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করা হয়। তথ্য প্রকৃতভাবে কি বোঝাতে চায়।

(ছ) **ফলাফলের রিপোর্ট করা ঃ** প্রাপ্ত ফলের / সিদ্ধান্তের রিপোর্টের তৈরী করা এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা যাতে জনগণ গবেষণার সিদ্ধান্তের সুবিধা গ্রহণ করতে এবং / অথবা পুনরায় গবেষণার জন্য ধারণা তৈরী করতে পারে।

সংক্ষেপে গবেষণা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানার পর বিশদভাবে প্রতিটি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হল।

3.9.1 ধাপ/পদক্ষেপ ১ ঃ গবেষণা সমস্যা (The Research Problem)

দৈনন্দিন জীবনে 'সমস্যা' শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করেন। শব্দটির সংজ্ঞা লিখুন।

____

____

____

সমস্যা বলতে বোঝায় কিছু জিনিস আছে যা আমরা জানি না এবং জানতে চাই। কার্লিঙ্গার [Kerlinger (1973)]-এর মতানুযায়ী একটি প্রশ্নবোধক বাক্য অথবা মন্তব্য যা জিজ্ঞাসা করে দুটি চলরাশির মধ্যে বা ততোধিক চলরাশির মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান।

Nachmias and Nachmias (1981)-এর মন্তব্য অনুযায়ী সমস্যা হল একটি বুদ্ধিদীপ্ত উত্তেজনা যা বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের দ্বারা উত্তর পেতে চায়।

(ক) গবেষণা সমস্যার চিহ্নিত করণ (**Identification of a Research Problem**)

এটি গবেষণা প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রথমে ক্ষেত্র নির্বাচন এবং তার পর সেই ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান আহরণ করা দরকার। ক্ষেত্রের আগের গবেষণার বিষয় জানার পর যে সব জায়গায় এখনও কাজ হয়নি তা নির্বাচন করা হয়। সমস্যা চিহ্নিত করার পদক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হল

* ক্ষেত্র নির্বাচন করা।
* আগ্রহের ক্ষেত্রে সম্পর্কে দখল অর্জন করা।
* ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনা করে সর্বশেষ কাজ ও অধ্যয়ন সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
* সাহিত্যের পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রাধান্য ক্ষেত্র নির্বাচন করা।
* অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা সুপার ভাইজারের সাহায্যে নিজের অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতার দ্বারা সমস্যা চিহ্নিত করা।
* সমস্যার বিষয় নির্দিষ্ট করা।

যদিও এই কাজ খুবই কঠিন ও ক্লান্তিকর কাজ, তবুও এটি গবেষককে অপ্রাসঙ্গিক ধারণা বাতিল করতে সাহায্য করে এবং নির্ভরযোগ্য ঘটনা সমস্যার জন্য সুনির্দিষ্ট করতে সাহায্য করে।

(খ) সমস্যার উৎস সমূহ (**Sources of Problem**)

গবেষণা সমস্যার উৎস কি কি হতে পারে তা লেখ ঃ

* সাহিত্য ঃ সাহিত্য হল তথ্য ও সমস্যার সমৃদ্ধ এবং সুসংগঠিত উৎস। পাঠাগারে বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ, থিসিস, গবেষণার জন্য সমস্যার সন্ধান দিতে পারে।
* **অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত** ঃ সাহিত্যের পর্যালোচনা ছাড়াও ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত বা পরামর্শ অন্যতম উৎস। সমস্যা বলতে কি বোঝায় ? ভালো সমস্যা কিনা, কি ধরনের তাৎপর্যজনক চলদের নিয়ে কাজ করা উচিত প্রভৃতি প্রশ্ন করে সমস্ত ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে।
* **তদন্তকারী অভিজ্ঞতা ঃ** নিজস্ব অভিজ্ঞতাও বিভিন্ন সমস্যার সন্ধান দিতে পারে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন নানা সমস্যা হতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের পর্যালোচনা বা দক্ষ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া অবশ্যই দরকার।
* **শ্রেণীকক্ষের আলোচনা ঃ** শ্রেণীকক্ষের আলোচনা বিষয় ও সমস্যার জীবন্ত উৎস হতে পারে :

আলোচনা, সেমিনার, কনফারেন্স থেকেও গবেষণা করা যেতে পারে এমন সমস্যা জন্ম দিতে পারে। এই সব ধারণা নিয়ে পুনরায় শিক্ষক, গবেষক বা দক্ষ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

* **আগের কাজের পুনরাবৃত্তি ঃ** কখনো কখনো একই কাজের পুনরাবৃত্তি গবেষণাকৃত বিষয়ে জ্ঞান ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে সাহায্য করে। এটি গবেষণার মধ্যে ফাঁক পূরণে সাহায্য করে।

* **তত্ত্বলব্ধ অনুমান ঃ** তত্ত্ব কাকে বলে? নিম্নের জায়গায় লিখুন।

____

____

____

____

____

____

M.H. Mark 1963 তত্ত্ব হল ''a group of logically organized (deductively related) laws'' তত্ত্ব হল টুল এবং উদ্দেশ্য উভয়ই। টুল হিসেবে কাজ করে তত্ত্বসমূহ গবেষণা পথ নির্দেশ করে সেই হেতু তত্ত্ব গবেষণাযোগ্য সমস্যার বা ধারণা একটি ভালো উৎস।

* **প্রযুক্তিগত পরিবর্তনসমূহ ঃ** বর্তমান সময় হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যা দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে। বর্তমানের সঙ্গে অভিযোজিত হতে না পারলে নতুন সমস্যা তৈরী হয় যা গবেষণার সুযোগ তৈরী করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের কারণে অনেকে তার বৃত্তি ও ধারণার পরিবর্তনে উৎসাহী। এই তথ্য প্রযুক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করছে তা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

আলোকপাত ঃ

এইগুলি হল গবেষণা সমস্যার কিছু উৎস। আরও কিছু উৎস বলতে পারেন। নিচের জায়গায় লিখুন।

____

____

____

____

____

____

____

মনে হতে পারে, যে কোন সমস্যা নিয়ে কি গবেষণা করা যায় না, গবেষণার বিষয় হতে পারে? যেমন মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায়? এই সমস্যা বর্তমানে গবেষণাযোগ্য নয়, কোনান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সেই স্তরে সাহায্য করতে অক্ষম সুতরাং একে ভালো সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। ভালো সমস্যার কিছু ভালো বৈশিষ্ট্য আছে। Kerlinger ১৯৭৩ সালে ভলো সমস্যার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন—

(গ) যথার্থ সমস্যার বৈশিষ্ট্য (Criteria of good problem)

kerlinger-এর মতে good research problem তিন প্রকার

(১) **চলরাশিদের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে :** যেমন শিক্ষার্থীদের কর্মসিদ্ধির উপর সাফল্য প্রেষনার প্রভাব কি? এখানে সমস্যা সাফল্য লাভের প্রেষণা ও কর্মসিদ্ধির সম্পর্কের উপর আলোকপাত গ্রহণ করে।

(২) **প্রশ্ন গঠন :** Kerlinger-এর মতে সমস্যা প্রশ্ন আকারে লেখা উচিত, উপরে উদাহরণ অনুযায়ী 'প্রভাব .... কি?'

(৩) **গবেষণা যোগ্যতা ও পরীক্ষাযোগ্যতা :** তৃতীয় এবং অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সমস্যা এমনভাবে লিখতে হবে যাতে এর বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষার সম্ভাবনা স্পষ্টভাবে সূচিত হয়। অনেক দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন এই বৈশিষ্ট্যপূরণে অসমর্থ, সেইহেতু তারা ভালো সমস্যা হিসাবে পরিগণিত নয়। এছাড়া আরও কিছু বৈশিষ্ট্য গবেষণা সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচনের সময় মনে রাখা উচিত।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও আর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান

(৪) **তাৎপর্য :** সমস্যা তাৎপর্যপূর্ণ কিনা? কিংবা সমস্যার সমাধানের ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে কিনা তাও বিচার্য বিষয়। সুতরাং সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ এবং সমাজের বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত।

(৫) **অভিনবত্ব এবং মৌলিকতা :** সমস্যা নতুন ও মৌলিক হওয়া উচিত। গবেষণার অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত নয়। যদি পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে।

(৬) **আকর্ষনীয়তা :** সমস্যার প্রতি সমাজ ও গবেষকের আকর্ষণ থাকা বাঞ্চনীয়।

(৭) **ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ :** সমস্যা নিয়ে কাজ করার জন্য গবেষকের উপযুক্ত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ থাকা দরকার না হলে কাজে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

(৮) **সুযোগ সুবিধা :** গবেষকের এমন সমস্যা নির্বাচন করা উচিত যাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আর্থিক সাহায্য, পরিচালনগত সহযোগিতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাবলী সহজে পেতে পারেন।

(৯) **সময় ও বাজেট :** সমস্যা এমন হওয়া উচিত, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং বরাদ্দ অর্থের মধ্যে কাজ শেষ করা যায়।

> আরও কিছু বিষয় লিখুন যা সমস্যা নির্বাচন ও গঠনের সময় বিবেচনা করা দরকার।
>
> ভালো সমস্যা চলরাশিদের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। 'চলরাশি' বলতে কি বোঝায়? কত রকমের 'চলরাশি' আছে?

(ঘ) 'চলরাশি'-চলরাশি হল যে কোনো ঘটনা বা গুণাবলী যার জন্য ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন—ওজন, উচ্চতা, বুদ্ধাঙ্ক, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সমস্যা নির্বাচনের সময় চলদের উপর সতর্ক রাখা দরকার যাদের বিষয়ে আমরা আগ্রহী, আমাদের উদাহরণে দুটি 'চল' হল সাফল্য অর্জন, প্রেরণা এবং কর্মসিদ্ধি।

(ঙ) 'চলরাশি'র প্রকারভেদ ঃ তিন ধরনের চলরাশি আছে

(১) স্বাধীন চলরাশি ঃ এটা গবেষকের বা পরীক্ষাকারীর 'চলরাশি' নামে পরিচিত। আমাদের উদাহরণে 'সাফল্য অর্জন প্রেরণা' হল স্বাধীন চলরাশি

(২) নির্ভরশীল চলরাশি ঃ যা স্বাধীন চলরাশির পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ স্বাধীন চলের অপসারণে প্রকাশ পায় না। বাড়ালে বাড়ে, কমালে কমে, এটি সরাসরি স্বাধীন চলরাশির সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি বিষয়ের চলরাশি (আচরণ) যা গবেষক পরীক্ষা করতে চায়। আমাদের উদাহরণে 'কর্মসিদ্ধির স্তর' হল নির্ভরশীল চলরাশি

(৩) বিভ্রান্তকারী বহিরাগত চলরাশি ঃ যে সব চলরাশির নির্ভরশীল চলরাশির উপর অবাঞ্ছিত প্রভাব আছে যার প্রভাব স্বাধীন চলরাশির প্রভাব বলে ভুল ব্যাখ্যা হয়ে থাকে তাদের বিভ্রান্তকারী বা বহিরাগত চলরাশি বলে। স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলরাশিদের মধ্যে বিশুদ্ধ কার্যকরণ সম্পর্কে জানার জন্য এই চলরাশিদের নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। যেমন আশঙ্কা, উত্তেজনা, ক্লান্তি, প্রেষণা স্তর, আগ্রহের স্তর প্রভৃতি।

এটি উল্লেখযোগ্য যে বিভ্রান্তকারী চলরাশি এক গবেষণা থেকে অন্য গবেষণায় ভিন্ন হয়। একটি গবেষণার স্বাধীন চলরাশি অন্য গবেষণায় নির্ভরশীল চলরাশি হতে পারে। এটি নির্ভর করে নির্দিষ্ট কাজের ধরনের উপর।

(ছ) চলরাশির প্রায়োগিক সংজ্ঞা ঃ 'চলরাশি'র ব্যবহারিক সংজ্ঞায় 'চলরাশি' বলতে কি বোঝানো হচ্ছে তা প্রকাশ করা দরকার। অনেক চলরাশি সামাজিক বিজ্ঞানে শিক্ষাগত সাফল্য লাভ, বুদ্ধাঙ্ক, সৃজনশীলতা প্রভৃতি ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু সরাসরি দেখা যায় না। এই কারণে তারা দুর্বোধ্য/অস্পষ্ট এবং ভাষাভাষা/অনির্দিষ্ট। অনেকে এদের অন্যভাবে বর্ণনা / সংজ্ঞা দেয়। চলরাশিদের অবশ্যই ব্যবহারিক গঠনে প্রকাশ করা উচিত যা সুনির্দিষ্ট করে এবং কার্যপ্রণালীকে পরিচালিত করে যার দ্বারা তাদের নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করতে পারি, ব্যবহারিক চল সর্বদা বৈধ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা উচিত।

3.9.2 ধাপ/পদক্ষেপ ২ ঃ সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of the Literature)

সাহিত্য বলতে কি বোঝায়?

গবেষণায় সাহিত্য বলতে মুদ্রিত যে কোনো শাখার কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের বা গবেষণার মুদ্রিত, সংগঠিত লিপিবদ্ধ তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানভাণ্ডারকে বোঝায়। Review শব্দ 'Re' এবং 'View' এই দুটি শব্দের দ্বারা গঠিত। এটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করার প্রণালী সাহিত্যের পর্যালোচনায় আমরা কোনো একটি নির্দিষ্ট গবেষণা ক্ষেত্রের জ্ঞান ও অনুসন্ধান লব্ধ ফলাফল সংগঠিত করি যাতে (১) প্রস্তাবিত গবেষণার কাজ ইতিমধ্যে করা হয়েছে কিনা (২) আগের গবেষণা থেকে নতুন করে গবেষণা করার গবেষণায় পথ প্রদর্শন বা নতুন ভাবে আলোক পাত করতে পারে কিনা জানতে পারা যায়।

(ক) সাহিত্য পর্যালোচনার তাৎপর্য (Significance of the reivew of the literature)

* এটি গবেষণা শুরুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে।
* এটি সমস্যার নির্বাচন, সংজ্ঞানিরূপণ ও সীমা নির্ধারণে সাহায্য করে।
* গবেষণা প্রকল্প গঠনে সাহায্য করে।
* এটি সমস্যার অপ্রয়োজনীয় ও অনঅভিপ্রেত পুনরাবৃত্তি এড়াতে সাহায্য করে।
* অতীত গবেষণার ভিত্তিতে পথ প্রদর্শনে সাহায্য করে।
* এটি গবেষণা চলাকালীন প্রত্যাশিত এবং/অথবা অপ্রত্যাশিত জটিলতা এড়াতে সাহায্য করে।
* এটি প্রাপ্ত ফলের ব্যাখ্যাকরণে পথ নির্দেশ করে।
* এটি আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমসাময়িক করতে সাহায্য করে।
* এটি পুনরায় গবেষণা করার মতামত দেয়।

(খ) সাহিত্য পর্যালোচনার উৎসাবলী : (Sources of Literature for Review)

নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎস দেওয়া হল—

(১) পুস্তক।

(২) সম্পর্কিত ম্যাগাজিন।

(৩) পত্র-পত্রিকা।

(৪) বস্তু নিরপেক্ষ চিন্তাভাবনা।

(৫) কনফারেন্স প্রসেডিংস।

(৬) সরকারি রিপোর্ট।

(৭) জাতীয় তথ্য কেন্দ্র।

(৮) ইন্টারনেট।

(৯) প্রকাশিত - অপ্রকাশিত থিসিস।

(১০) এনসাইক্লোপিডিয়া।

(১১) বিশেষ শিক্ষার বর্ষপুস্তক।

(১২) বিশ্ববিদ্যালয় খবর।

(১৩) ভারতীয় শিক্ষা গবেষণার অনুসন্ধানসমূহ।

(১৪) শিক্ষামূলক গবেষণা পর্যালোচনা।

3.9.3 ধাপ/পদক্ষেপ ৩ ঃ প্রকল্প গঠন (Formulation of the Hypothesis)

গবেষণা পরিচালনায় সমস্যা নির্বাচন ও গঠন করার পর অন্যতম কাজ হল প্রকল্প গঠন। ইংরাজী Hypothesis শব্দটি দুটি শব্দ Hypo-less than or tentaive, Thesis - statement about the soultion of Problem সুতরাং Hypothesis হল ''s tentative statement proposed for the solution of the problem.'' ; সুতরাং গবেষণা প্রক্রিয়ায় প্রকল্প হল দুটি চল এর মধ্যে বা ততোধিক চলদের মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্ক নিয়ে সম্ভাব্য অনুমান নির্ভর মন্তব্য যা পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে ভুলও প্রমাণিত হতে পারে।

(ক) প্রকল্পের গুরুত্ব (Importance of Hypothesis)

(১) **জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সাহায্য করে ঃ** প্রকল্প কোনো বিষয় বা ঘটনার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেয় যার পুনর্বিবেচনা ও বৈধতা যাচাই করা হবে। যদি বৈধ হয় তবে বিষয় বা ঘটনার সামান্যীকরণ করা হয়। এই সামান্যীকরণ ক্ষেত্র বিষয়ের জ্ঞান ভাণ্ডার বাড়াতে সাহায্য করে।

(২) **গবেষণা কাজের পথ নির্দেশ করে ঃ** প্রকল্প গবেষণার সম্ভাব্য সমাধান এবং গবেষণার দিক নির্দেশ করে। প্রকল্প গবেষণার নির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহকে সূচিত করে এবং কি ধরনের নমুনা ও তথ্য প্রকল্পকে পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে। প্রকল্প গবেষকের কি করা প্রয়োজন, উদ্দেশ্য কি, গবেষণায় কি খুঁজে পেতে চায়, কারা প্রাসঙ্গিক চল, কি ধরনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে, কি ধরনের পরিসংখ্যান প্রযুক্তি তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হবে তা নির্দিষ্টভাবে সূচিত করে। প্রকল্প গবেষণাকারি ক্ষেত্র সীমা নির্ধারণ করে।

(৩) **অনুসন্ধানলব্ধ ফলাফলের ব্যাখ্যা প্রদানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে ঃ** ফলাফলের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের রিপোর্ট তৈরির সুসংগঠিত ভিত্তি স্থাপন করে। এটি প্রতিটি প্রকল্পকে আলাদাভাবে পরীক্ষা ও সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত আলাদা ভাবে রিপোর্ট করতে অধিকতর সহজ করে দেয়। এটি গবেষণা রিপোর্টকে অর্থবহ এবং আকর্ষণীয় করে তোলে।

(৪) **অন্ধভাবে অনুসন্ধান বন্ধ করে ঃ** প্রকল্প স্পষ্টভাবে উদ্দেশ্য এবং তা অর্জনের পদ্ধতি নির্দেশ করে, অন্ধভাবে যেখানে সেখানে কোনো কিছু অনুসন্ধান বন্ধ করে। এটি বাতি ঘর/আলোকস্তম্ভ হিসাবে গবেষকের যে পথে চলা উচিত সেই আলোর পথের সন্ধান দেয়।

(খ) ভালো প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য (Criteria of a good hypothesis)

যেমন ভালো সমস্যার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তেমনি ভালো প্রকল্পেরও কিছু ভালো বৈশিষ্ট্য আছে—

(১) **স্পষ্ট, নির্ভুল এবং সহজ পরিভাষায় বর্ণনা করা ঃ** অস্পষ্ট পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। যেমন ব্যক্তিত্ব (personality)র পরিবর্তে 'Personality as assessed by Eysenck

personality Inventory' বা বুদ্ধিমত্তা (intellignece) "Alexander Pass Along Test" হিসাবে বর্ণনা করা দরকার। অযথা অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ভাষা ব্যবহার করা উচিত যাতে পাঠক সহজে বুঝতে পারে তা করা উচিত।

(২) **পরীক্ষনীয়তা ঃ** যে প্রকল্প পরীক্ষা করা যায় তা ভালো প্রকল্প বলে বিবেচিত। যদি প্রকল্প বিস্তৃত পরিভাষায় হয় তবে তা পরীক্ষা করা জটিল, যে প্রকল্প নির্দিষ্ট পরিভাষায় নির্দিষ্ট চল ব্যবহার করে তা পরীক্ষা করা সহজ। যেমন— যে প্রকল্প "Participating in co-cultural activities would facilitate all round personality development of the participants" তা যাচাই করা খুবই জটিল কারণ "Co-cultural activity" এবং "all round personality" উভয়েই ব্যাপক এবং বিস্তৃত পরিভাষা।

(৩) **চলরাশির মধ্যে প্রত্যাশিত সম্পর্ক প্রকাশ করে ঃ** ভালো প্রকল্প সর্বদা দুটি চলরাশি এর মধ্যে বা ততোধিক চলরাশির মধ্যে প্রত্যাশিত সম্পর্ক প্রকাশ করে। যাইহোক এটি নির্ভর করে কেমন ধরনের প্রকল্প আমরা গঠন করেছি তার উপর। যেমন যদি আমরা "null hypothesis" গঠন করি তবে এটি প্রকাশ করে যে দুটি চল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয় বা দুটি চল এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এই ধরনের প্রকল্প ও ভালো প্রকল্প যা পরীক্ষা করা যায়।

(৪) **সুযোগ সীমাবদ্ধ ঃ** একটি ভালো প্রকল্পে সুযোগ সীমাবদ্ধ কারণ এটি খুব সুনির্দিষ্ট এবং নির্ভুল। আমরা বিশ্বজনীন তাৎপর্যপূর্ণ প্রকল্পতে গঠন করতে পারি কিন্তু তাদের যাচাই করা খুবই জটিল কারণ তারা পরীক্ষা ও যাচাই করার জন্য সুনির্দিষ্টও নয় এবং সম্পাদনযোগ্যও নয়।

(৫) **সমগোত্রীয় বিষয়যুক্ত ঃ** কিছু ভালো এবং সুদৃঢ় কারণ ছাড়া একটি ভালো প্রকল্প সর্বদা বর্তমান জ্ঞান ও বিষয় নিয়ে গঠিত। এটি প্রতিষ্ঠিততত্ত্ব এবং বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি বৈপরীত্য স্থাপন করে না। প্রকল্পের পরীক্ষার পর বৈসাদৃশ্যমূলক ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। যদি কিছু সুদৃঢ় কারণ এবং যুক্তি থাকে (যেমন গ্যালিলিও সমস্ত সমাজের ধারণার বিপরীতে বলেছিলেন সূর্য স্থির, পৃথিবী তাকে প্রদক্ষিণ করছে) তবে প্রচলিত ধ্যানধারনার বিরোধী প্রকল্প গঠন করা যেতে পারে।

(৬) **নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করতে দায়বদ্ধ ঃ** এমন ধরনের সমস্যা নির্বাচন করা উচিত যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাচাই করা যায়, একইভাবে এমন প্রকল্প গঠন করা উচিত যা নির্দিষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করা যায়।

(গ) প্রকল্পের প্রকারভেদ ঃ—

প্রকল্প নিম্নলিখিত যে কোনো আকারে গঠন করা যেতে পারে ঃ

(১) **ঘোষণামূলক গঠন ঃ** এই ধরনের গঠনে গবেষক তার প্রকল্পের প্রত্যাশিত গবেষণা লব্ধ ফল ধনাত্মক মন্তব্য হিসাবে বর্ণনা করে যেমন— ছেলেদের দৌড়ানোর বেগ মেয়েদের থেকে বেশী।

(২) **নঞর্থক প্রকল্প** ঃ এই ধরনের প্রকল্প গঠনে গবেষক বর্ণনা করে দুটি চল এর মধ্যে বা ততোধিক চল-এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই বা কোনো পার্থক্য নেই। যেমন ছেলে এবং মেয়ের বুদ্ধাঙ্ক (IQ) তে কোনো পার্থক্য নেই।

(৩) **প্রশ্ন আকার** ঃ এই ধরনের গঠনে প্রত্যাশিত ফলাফল না বলে কি ফল হবে পরে তা প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করে। যেমন ছেলেদের দৌড়ানোর বেগ কি মেয়েদের থেকে বেশী হবে? সাধারণত আমরা এই ধরনের প্রকল্প গঠন এড়িয়ে চলি কারণ এটি গবেষককে গাইডও করে না বা ভালো প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য পূরণ করে না।

3.9.4 ধাপ/পদক্ষেপ ৪ ঃ পদ্ধতি / গবেষণা পদ্ধতিবিদ্যা (Method/Research Methodology)

এটি নিম্নলিখিত বিভাগ নিয়ে গঠিত

(ক) গবেষণার রূপরেখা / নকশা

(খ) নমূনা এবং নমূনা চয়ন পদ্ধতি

(গ) তথ্য সংগ্রহের জন্য যন্ত্রপাতি (Tools)

(ক) **গবেষণা রূপরেখা / নকশা** ঃ গবেষণা সমস্যা নির্বাচন এবং কাজের প্রকল্প তৈরী করার পর পরবর্তী পদক্ষেপ হল গবেষণার পরিকল্পনা তৈরী করা। এটি হল সংক্ষিপ্ত মূল নকশা এবং কাজের পরিকল্পনা যা একজন গবেষককে কিভাবে, কখন এবং কি করতে হবে বা পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত তার পথপ্রদর্শন করে, এটা হল এক প্রকার ধারণামূলক গঠন যার মধ্যে গবেষককে গবেষণা পরিচালিত করতে হয়।

গবেষণা রূপরেখার প্রকারভেদ ঃ একে প্রধানত নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করা হয়। কি ধরনের নকশা গ্রহণ করা হবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে গবেষণার লক্ষ্য এর উপর।

(১) **পরীক্ষামূলক গবেষণা রূপরেখা** ঃ এই ধরনের গবেষণার দ্বারা গবেষক দুটি চল বা ততোধিক চল এর মধ্যে কারণ বাচক সম্পর্ক মূলক প্রকল্পের পরীক্ষা করে থাকেন। এই ধরনের গবেষণায় নকশা পক্ষপাতিমূলক আচরণ কমায়। বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়, কার্যকারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং গ্রহণে সাহায্য করে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষামূলক গবেষণা রূপরেখা দেওয়া হল-

After only design :

* **Between - Subjects After Only Design.**
* **Simple Randomized subjects design**
* **Factorial Design.**
* **Within Subjects after only design**
* **Combining Between and Within Subjects Designs.**

* **Before After Desgin :** এই বিষয়ে জানার জন্য Christen Sen (1994) বা পরীক্ষামূলক মেথডোলজির উপর অন্যান্য বই পড়তে পারেন।

(২) **অনুসন্ধান ধর্মী গবেষণা রূপরেখা :** এটি গঠনমূলক গবেষণা রূপরেখা নামে পরিচিত। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল নতুন বিষয়ের অনুসন্ধান যা এখনও অজানা, এখানে নতুন ধারণা এবং অর্ন্তদর্শন আবিষ্কারের উপর জোর দেওয়া হয়। এটি নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতি নিয়ে গঠিত।

* **গ্রহণযোগ্য সাহিত্যের পর্যালোচনা :** প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণযোগ্য বিষয় এবং তথ্য পর্যালোচনা করে গবেষণার জন্য একটি সুদৃঢ় জায়গা তৈরী করতে পারি।

* **তদন্ত / অনুসন্ধান অভিজ্ঞতা :** এখানে আমরা নির্বাচিত ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ এবং দক্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে গবেষণার পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করি। এটি অনেক তথ্য দেয় যা কোনো প্রকাশিত সাহিত্য বা অন্য কোনো উপায়ে পাওয়া সম্ভব নয়।

* **অন্তর্দৃষ্টি উদ্রেককারী বিষয় বা উদাহরণের বিশ্লেষণ :** গবেষণার বিষয়বস্তু অধ্যয়নকালে অনেক কিছু বিষয় / ঘটনা দেখতে পাই যা বিশ্লেষণ করে সমস্যার সম্পর্কিত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি।

(৩) **বর্ণনাধর্মী গবেষণা রূপরেখা :** এই ধরনের গবেষণা রূপরেখায় একজন ব্যক্তি বা একটি দলের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করি। তাদের বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করে তাদের ভবিষ্যৎ আচরণ নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি।

(৪) **রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত গবেষণা রূপরেখা :** এই ধরনের গবেষণা রূপরেখায় কোনো সমস্যার কারণ নির্ণয় করে তার সমাধানে কিছু পরামর্শ দিতে চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের গবেষণা রূপরেখা চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে রোগ নির্ণয় করে তা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

(খ) **নমুনা এবং নমুনাচয়ন :** পরিমিত সম্পদ, সময়, শক্তি এবং অর্থের কারণে আমরা সমস্ত পপুলেশন নিয়ে গবেষণা করতে পারি না। এটি সম্পাদন যোগ্য ও বাস্তবসম্মত নয়। সেই জন্য পপুলেশন থেকে একটি ছোট দল বেছে নিই (নমুনা) যা সমস্ত পপুলেশনের প্রতিনিধিত্ব করে।

Population is any group of people that possesses one or more characteristics in common that the researcher wants to study. গবেষক যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করতে চান সেই রকম এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য যে জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে আছে এই প্রকারের যে কোন জনগোষ্ঠীকে 'পপুলেশন' বলা হয়।

নমুনা (Sampling) হল পপুলেশনের প্রতিনিধিত্বকারী ক্ষুদ্র দল যা নিরীক্ষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। তথ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে নমুনার ফলাফল পরিসংখ্যানগত ভাবে বিশ্লেষণ করার পর প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত/ফলাফল সমস্ত পপুলেশনের উপর সামান্যীকরণ করা হয়।

নমুনা নির্বাচনে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি নমুনা চয়ন প্রযুক্তি (Sampling) ব্যবহার করা যেতে পারে—

(ক) **সম্ভাবনাময় নমুনাচয়ন পদ্ধতি (Probability Sampling) :** এই ধরনের নমুনাচয়ন পদ্ধতিতে পপুলেশনের প্রত্যেক ব্যক্তির নমুনা হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার সমান সুযোগ থাকে। এটি পপুলেশনের

প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হয় এবং সংগ্রহ করা তথ্যের উপর আমরা ইনফারেনশিয়াল বা প্যারামেট্রিক পরিসংখ্যানবিদ্যা প্রয়োগ করি।

এটি নানারকমের হয়—

* Simple Random Sampling.
* Systematic Random Sampling.
* Stratified Random Sampling.
* Area or Cluster Sampling.

(b) **Non-Probability Sampling :** এই ধরনের নমুনাচয়ন পদ্ধতিতে আমরা প্রাপ্ত বিষয়দের অধ্যয়ন করি কোনো নির্দিষ্ট নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করি না। এইভাবে নির্বাচিত নমুনার মধ্যে পপুলেশনের আকাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যাবলী যা গবেষক অধ্যয়ন করতে চায় তা না থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশী। আমরা সংগ্রহ করা তথ্যের উপর নন প্যারামেট্রিক বা নন-ইনফারেন-শিয়াল পরিসংখ্যানবিদ্যা প্রয়োগ করি। এই নমুনাদের ফলাফল পপুলেশনে সামান্যীকরণ করা হয় না। সুতরাং এই ধরনের নমুনা চয়ন প্রযুক্তির সুযোগ কম এবং যদি র‍্যানডমলি (Randomly) নমুনাচয়ন করার মতো সুযোগ থাকে তবে এই ধরনের টেকনিকের ব্যবহার এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

বিভিন্ন প্রকার ননপ্রোব্যাবিলিটি স্যামপ্লিং হল--

* Incidental or Accidental Sampling.
* Purposive Sampling.
* Quota Sampling.
* Judgement Sampling.

আগ্রহী পাঠক সবিস্তারে জানার জন্য কোঠারী (১৯৯০ বা রিসার্চ মেথডোলজির উপর যে কোনো বই পড়তে পারেন।)

(গ) **তথ্য সংগ্রহের জন্য যন্ত্রসমূহ (Tools for Data Collection) :** প্রকল্পকে পরীক্ষা করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। এই তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নানান যন্ত্র, পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া আছে। কি ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে গবেষণার সমস্যা এবং রূপরেখার উপর। তথ্য দুই প্রকারের—

(ক) **পরিমেয় তথ্য** — যা পরিমাপ করা যায় এবং সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়।

(খ) **গুণগত তথ্য** — যা পরিমাপ করা যায় না যা, নিরীক্ষণ এবং বিচার বা সিদ্ধান্ত থেকে পাওয়া যায়।

তথ্যের প্রধান দুটি উৎস হল—

(ক) প্রত্যক্ষ তথ্য উৎস— যা সরাসরি পরিমাপ, নিরীক্ষণ বা প্রত্যক্ষদর্শী থেকে পাওয়া যায়।

(খ) **পরোক্ষ তথ্য উৎস**— যা ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। অর্থাৎ অন্যান্য উৎস (Second hand) থেকে যেমন অন্যের দ্বারা তৈরী রিপোর্ট থেকে সংগ্রহক করা হয়।

নিম্নে কিছু মুখ্য টুলস দেওয়া হল—

(ক) **মনোবিদ্যাগত পরীক্ষা এবং তালিকাসমূহ**—মনোবিদ্যাগত পরীক্ষা যা মানুষের আচরণ বর্ণনা এবং পরিমাপের জন্য তৈরী এবং মানোপযোগী করা হয়েছে। এই টুলসগুলি শিক্ষামূলক এবং/অথবা শ্রেণীকক্ষ গবেষণায় সর্বাধিক ব্যবহৃত। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মনোবিদ্যামূলক পরীক্ষা দেওয়া হল যেগুলি গবেষকরা শ্রেণীকক্ষ গবেষণায় প্রায়ই ব্যবহার করেন—

সিদ্ধিলাভ/কৃতকার্য পরীক্ষা :

* **Achievement Tests :** এটি বিষয় কি শিখেছে এবং তার বর্তমান কৃতকার্যের স্তর মূল্যায়ন করে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হল এর উদাহরণ।

* **প্রবণতা/ ঝোঁক পরীক্ষা (Aptitude Tests) —** Aptitude শব্দটি 'aptos' শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ 'fitted for'। প্রবণতা পরীক্ষার দ্বারা আমরা কোন বিষয়ে কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি। এই ধরনের কিছু পরীক্ষা হল—Scholastic Aptitude Test, Scientific Aptitude Test, Clerical Aptitude Test প্রভৃতি।

* **আগ্রহ তালিকা (Interest Inventories) :** আগ্রহ হল আমাদের অনুভূতি যা আমাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। যদি কোনো কাজে আগ্রহ থাকে তবে সেই কাজে সহজেই দখল অর্জন করা যায়। এটি বিষয়ের কোন একটি ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ অনুসন্ধানের চেষ্টা করে। উদাহরণ—Vocational Interest Investories, Kuder's Preference Record প্রভৃতি।

* **ব্যক্তিত্ব তালিকাসমূহ (Personality Inventories) :** এইগুলি বিষয়কে দেওয়া হয় কোনো নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য যাতে তাদের ব্যক্তিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য অথবা প্রবণতা মূল্যায়ন করা যায়। মূলত তিন ধরনের পদ্ধতি ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়।

  অবজেক্টিভ মেথড, সাবজেক্টিভ মেথড এবং প্রোজেক্টিভ মেথড। কিছু উদাহরণ হল—16 PF Test, Thematic Apperception Test প্রভৃতি।

(খ) **প্রত্যক্ষ তথ্য বা ক্ষেত্র উৎসসমূহ :** মনোবিদ্যাগত পরীক্ষা ও তালিকাসমূহ ছাড়াও গবেষক প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করেন।

প্রশ্নমালা (Questionnaire) : এতে নির্দিষ্ট প্রশ্নসমূহ থাকবে যার উত্তর দিতে হবে। এর সাহায্যে একই সময়ে একদল উত্তরদানকারীর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু এটি কেবলমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন এবং শিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তালিকা (Schedule) : এটিও একধরনের প্রশ্ন তালিকা। প্রশ্নমালাতে উত্তরদানকারী নিজে পড়ে নিজেই উত্তর দেয় কিন্তু তালিকাতে গবেষক প্রশ্ন নিজেই জিজ্ঞাসা করেন এবং উত্তর নির্দিষ্ট জায়গাতে নিজেই নথিভুক্ত করেন।

সাক্ষাৎকার (Interview) : প্রশ্নমালা ডাকযোগে উত্তরদানকারীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে

[illegible] (Mail Questionnaire) [illegible]
[illegible] (Interviewer) [illegible]
[illegible]

(ঘ) [illegible]

* [illegible]

3.9.5 তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া (Procedure of Data Collection)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.9.6 তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা (Analysis and Interpretation of Data)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.9.7 রিপোর্ট লিখন (Reporting the Results or Report writing)

[illegible]

রিপোর্ট না লেখে এবং প্রকাশিত না হয় তবে তার কোনো ব্যবহার হয় না। সুতরাং গবেষণা প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ হল ফলাফল এবং সিদ্ধান্তের রিপোর্ট তৈরী করা। রিপোর্ট তৈরী নানান ফরম্যাট এবং নিয়ম আছে যা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

3.10 এককের সারাংশ (Unit Summary)

* গবেষণা প্রস্তাব হল গবেষণা সম্পাদন করার জন্য প্রস্তাবিত সুসংগঠিত পরিকল্পনা।
* গবেষণা প্রস্তাবনা সুসংগঠিতভাবে সমস্ত তাৎপর্যজনক এবং সংগতিপূর্ণ বিষয়ে বিশদ নিয়ে প্রস্তুত করা উচিত।
* সময় এবং বাজেট তালিকা অতি সতর্কভাবে তৈরী করা উচিত কারণ এটি গবেষণা প্রস্তাবের অনুমোদনে প্রভাব ফেলতে পারে।
* জীবনপঞ্জীকাতে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য দেওয়া উচিত।
* আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত ফরম্যাট অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাব ও জীবনপঞ্জিকা তৈরী করা উচিত।
* তাৎপর্যজনক, অভিনব এবং ব্যবহারিক সমস্যা নির্বাচন করা উচিত।
* সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণার শুরুর ভিত্তি স্থাপন করে।
* সাহিত্যের পর্যালোচনা ছাড়া সমস্যার আরও নানা উৎস আছে। দক্ষ ব্যক্তির মতামত এবং তার সাহায্য ও পরামর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।
* ভালো সমস্যা ও প্রকল্পের সব বৈশিষ্ট্য পূরণ করা জটিল কিন্তু তা পূরণের চেষ্টা করা উচিত।
* প্রকল্প বর্তমান জ্ঞান ও তত্ত্বসমূহের ভিত্তিতে গঠন করা উচিত।
* সঠিক চল-এর নির্বাচন আবশ্যিক, পরবর্তীকালে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব এড়াতে তাদের ব্যবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া দরকার।
* যদি বিভ্রান্তকারী চলদের নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তবে তথ্য এবং ফলাফল বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত করা যাবে না।
* বিভিন্ন ধরনের গবেষণা রূপরেখা ও যন্ত্রপাতি আছে। কোনটি ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে নির্দিষ্ট গবেষণা সমস্যার উপর।
* যদি সম্ভব হয় নমুনা নির্বাচনে র‍্যানডম স্যাম্পলিং পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।
* ফলাফলের বিশ্লেষণ সর্বোচ্চ যত্ন নিয়ে করা দরকার এবং ব্যাখ্যা প্রদান করার সময় বর্তমান তত্ত্ব ও বিষয়ের সাহায্য নেওয়া দরকার।
* উপযুক্ত গবেষণা রিপোর্ট তৈরী কেবলমাত্র গবেষণার কাজকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করে না, এছাড়াও নতুন গবেষণার সমস্যার জন্ম দিতে সাহায্য করে।

3.11 অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। একটি নির্ভরশীল চল-এর প্রভাব স্বাধীন চল-এর উপর পড়ে—ভুল না ঠিক।

২। নমুনা পপুলেশনের প্রতিনিধিত্ব—ভুল না ঠিক।

৩। নিম্নলিখিতদের মধ্যে কোনটি গবেষণা ফলাফলকে বিকৃত করে—

(ক) স্বাধীন চল।

(খ) নির্ভরশীল চল।

(গ) বহিরাগত চল।

(ঘ) উপরের সবকটি।

৪। গবেষণা টুল নির্বাচন মূলত নির্ভর করে।

(ক) গবেষণা সুপারভাইজার।

(খ) টুলসের সহজ লভ্যতা।

(গ) আমাদের ইচ্ছা।

(ঘ) গবেষণা অধ্যয়ন।

৫। সংজ্ঞা দাও—(ক) গবেষণা প্রস্তাব, (খ) সমস্যা, (গ) প্রকল্প, (ঘ) চল, (ঙ) নমুনা, (চ) প্রত্যক্ষ তথ্য, (ছ) পরোক্ষ তথ্য।

৬। গবেষণা প্রস্তাব ও জীবন-পঞ্জিকা তৈরী করা একজন গবেষকের পক্ষে জরুরী?

৭। (ক) সমস্যা, সাহিত্য এবং (খ) প্রকল্পের বিভিন্ন উৎসগুলি কি কি?

৮। তুমি কিভাবে প্রাপ্ত ফলাফলকে উপযুক্ত এবং সক্রিয়ভাবে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করবে?

৯। গবেষণা রিপোর্ট তৈরির সময় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

3.12 বাড়ীর কাজ (Assignment)

মনে করুন আপনি স্কুল থেকে পালিয়ে যাওয়া ছেলেদের নিয়ে গবেষণা করতে চান একটি গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরী করুন, তাৎপর্য বিচার করুন, চিন্তাভাবনার উপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতা লিখুন।

3.13 আলোচন্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion & Clarification)

3.14 উৎস (Reference)

1. Christensen, L. B. (1994) *Experimental Methodology* (6th ed.) Bosteon : Allyn and Bacon.
2. Kerlinger, F. N. (1973) *Foundations of Behavioural Research*, Delhi : Subject Publications.
3. Kothari, m C. R. (1990) *Research Methodology : Methods and Techniques* (2nd ed.). New Delhi : Wishwa Prakashan.
4. Koul, L. (1997) *Methodology of Educational Research*. New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
5. Marx, M. H. (1963) *Theories in Contemporary Psychology*. New York : MacMillan.
6. Nachmias, D. and Nachmias, C. (1981) *Research Methods in the Social Sciences*. New York : St. Martin's Press.

একক ৪ ❑ তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফলের বিশদীকরণ ও রিপোর্ট লিখন (Analysing Data, Interpretation of Results and Report Writing)

গঠন

4.1 ভূমিকা

4.2 উদ্দেশ্য

4.3 রাশিতত্ত্বের প্রক্রিয়াকরণ

4.4 গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ

4.5 গুণগত তথ্যের সংগঠিতকরণ

4.6 গুণগত তথ্যের বিশ্লেষণ

4.6.1 উপাদান বিশ্লেষণ

4.6.2 আরোহী প্রণালী নির্ভর বিশ্লেষণ

4.6.3 যুক্তিসংগত বিশ্লেষণ

4.7 পরিমেয় তথ্য বিশ্লেষণ

4.8 পরিমেয় তথ্যের সংগঠিতকরণ

4.9 পরিমেয় তথ্যের বিশ্লেষণ

4.9.1 বর্ণনাধর্মী তথ্য বিশ্লেষণ

4.9.2 অনুমান নির্ভর তথ্য বিশ্লেষণ

4.10 ফলাফলের বিশদীকরণ

4.10.1 গুণগত তথ্যের বিশদীকরণ

4.10.2 পরিমেয় তথ্যের বিশদীকরণ

4.10.3 ভালো বিশদীকরনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

4.10.4 ফলাফলের ব্যাখ্যা প্রদানের ভিত্তিসমূহ

4.10.5 ফলাফলের বিশদীকরণের প্রয়োজনীয় সতর্কতাবলী

4.11 গবেষণা রিপোর্ট লিখন

4.12 এককের সারাংশ

4.13 অগ্রগতির মূল্যায়ন

4.14 আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

4.15 উৎস

4.1 ভূমিকা (Introduction)

গবেষণা যেমন শিক্ষাক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে তেমনি গবেষণা শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যক্তিদের সমৃদ্ধ করে তাদের কর্তব্য ও ভূমিকা সক্রিয় এবং দক্ষতার সঙ্গে পালনে সাহায্য করে।

গুণগত গবেষণা পরিচালনা করে তারা কেবলমাত্র জ্ঞানের অগ্রগতি ঘটায় না জাতীয় কল্যাণ ও মানব কল্যাণও করে থাকেন। গবেষণায় প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গবেষণা পরিকল্পনা রিপোর্ট লেখা ছাড়া অসম্পূর্ণ। সুতরাং এই বিভাগে আমরা গবেষণার তিনটি মুখ্য উপাদান তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফলের ব্যাখ্যা প্রদান এবং রিপোর্ট লেখা নিয়ে আলোচনা করবো।

4.2 উদ্দেশ্য (Objectives)

* কিভাবে তথ্য শ্রেণীবদ্ধ করা হয় বুঝতে পারা।
* তথ্যের গুণগত বিশ্লেষণ বর্ণনা করতে পারা।
* তথ্যের পরিমাণমূলক বিশ্লেষণ বর্ণনা করতে পারা।
* তথ্য কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তা বুঝতে পারা।
* গবেষণা রিপোর্ট লেখা।

4.3 তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ (Processing of Data)

সমস্যা গঠনের পর নির্বাচিত নমুনার উপর গবেষণা সমস্যা অনুযায়ী শিক্ষামূলক টুলস প্রয়োগ করে অবিশ্লেষিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তও বৈধ সামান্যীকরণের জন্য সেই তথ্য বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা হয়। কতখানি বৈধ, বিশ্বাসযোগ্য এবং যথেষ্ট পরিমাণ তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে কিনা বড় কথা নয়। পরন্তু-সংগৃহীত তথ্য সঠিকভাবে যত্নসহকারে প্রসেসিং করা হয়েছে কিনা তা বিবেচ্য বিষয়। অর্থাৎ যত্নসহকারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষিত বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা এবং যুক্তির সাহায্যে সামান্যীকরণ করা।

4.4 গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ (Qualitative Data Analysis)

তথ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী একে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। গুণগত ও পরিমেয়। তথ্যের প্রকৃতি প্রধানত নির্ভর করে তথ্য সংগ্রহের জন্য কি ধরনের টুলস নমুনার উপর ব্যবহার করা হচ্ছে, তার উপর। কোয়েশ্চেনেয়াস, অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ অথবা অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের সাহায্যে সংগ্রহ করা তথ্য সাধারণত গুণগত তথ্য হয় যা জনগণ নিজেদের সম্পর্কে নিজের ভাষায় প্রকাশ করে। এই ধরনের তথ্যের যত্নশীল বিশ্লেষণ করে তা গবেষণা করলে সমস্যার আকাঙ্খিত সংগতিপূর্ণ ব্যবহারযোগ্য এবং অন্তর্নিহিত তথ্য পাওয়া যায়।

4.5 গুণগত তথ্যের সংগঠিতকরণ (Organisation of Qualitative Data)

অনেক সময় গবেষণার জন্য তথ্য সংখ্যা রূপে সংগ্রহ করা হয় বা শব্দের দ্বারা সংগ্রহ করা হয়, এই ধরনের তথ্যকে গুণগত তথ্য বলে। উদাহরণ—যখন কোনো ব্যক্তিকে তার বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা বলতে বলা হয় তখন তার উত্তর শব্দ এবং মন্তব্য হিসাবে পাওয়া যায়—একে গুণগত তথ্য বলে কারণ এই তথ্যাবলী গুণগত দিক প্রকাশ করে সংখ্যা হিসাবে নয়।

যেহেতু কোনো সর্বজন স্বীকৃত এবং প্রচলিত কোনো নিয়ম নেই সেই কারণে গবেষককে এমনভাবে সংগ্রহ তথ্যকে সংগঠিত করতে হবে যাতে তিনি অর্থবহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। Patton (1982) বলেছিলেন যে ন্যূনতম ভাবে সংগ্রহ করা তথ্যের চারটি সেট করা উচিত এবং একটিকে নিরাপদ জায়গায় রাখা উচিত। যদি কোনো প্রকারে আসল তথ্যের কোনো ক্ষতি হয় তবে একই তথ্য একই নমুনা থেকে একই টুলস প্রভৃতি ব্যবহার করেও সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য সেটগুলি অবিশ্লেষিত তথ্য সংগঠিত এবং অর্থবহ বিভাগে ভাগ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

4.6 গুণগত তথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of Qualitative Data)

Koul (1997) বলেছেন "Analysis of the qualitative means studying the organised material in order to discover inherent facts, these data are studies from as many anglesas possible either to explore the new facts or to interpret already known existing facts" অর্থাৎ গুণগত তথ্যের বিশ্লেষণ বলতে অধ্যয়নের মাধ্যমে সংগঠিত তথ্যের অধ্যয়ন অন্তর্নিহিত বিষয়ের অনুসন্ধান বোঝায়। এই ধরনের তথ্যসমূহ যতদূর বিষয়ের অনুসন্ধান বা আগে থেকে অবস্থিত জানা বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা: গুণগত তথ্যের সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়— উপাদান বিশ্লেষণ, আরোহ প্রণালী নির্ভর বিশ্লেষণ। যুক্তিসংগত/যুক্তিনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ।

4.6.1 উপাদান বিশ্লেষণ (Content Analysis)

শিক্ষামূলক ঘটনার প্রকৃতি অন্যান্য ঘটনার মতো নয়। প্রথমটি মূলত গুণগত বা অমূর্ত বস্তুনিরপেক্ষ প্রকৃতি এবং দ্বিতীয়টি হল মূলত পরিমেয় প্রকৃতির। গুণগত ঘটনাবলী অস্পষ্ট এবং জটিল সেই কারণে

সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় স্পষ্ট ফল সহজে পাওয়া যায় না। উপাদান বিশ্লেষণ হল একটি প্রযুক্তি যা সংগৃহীত তথ্য থেকে ফলাফল অর্জনে ব্যবহার করা হয়। উপাদান বিশ্লেষণে সংগ্রহ করা তথ্য নির্দিষ্ট বিভাগ, বিজ্ঞানসম্মত এবং নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে ভাগ করি। Berelson (1952) মন্তব্য করেছিলেন উপাদান/বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ হল সামাজিক গবেষণার একটি টেকনিক যা গুণগত তথ্যকে নৈর্ব্যক্তিক, বিজ্ঞানসম্মত এবং পরিমেয় আকারে উপস্থাপিত করে।

Kaplan (1913) "Content analysis attempts to characterlize the meaning in a given body to discourse in a systematic and quantitative fashion" বিষয়বস্তু/উপাদান বিশ্লেষণের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সামাজিক ঘটনাকে সুসংগঠিত, সংখ্যাগত এবং পরিমেয় ভাবে উপস্থাপন করা।

১৯৫২ সালে Berelson তিনটি মুখ্য প্রচেষ্টার কথা বলেছিলেন— যা কোনো গবেষণায় একক বা যুগ্ম ভাবে উপাদান বিশ্লেষণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ক) **উপাদান / বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ** এই প্রচেষ্টাতে গবেষক প্রধানত উপাদানের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি মনোযোগ দেন। গবেষক উপাদানের স্বয়ং স্বতন্ত্র প্রকৃতি বা গঠনের উপর মনোযোগ দেন।

(খ) **উপাদানের উৎপাদক বা কারণসমূহ ঃ** এই প্রচেষ্টাতে গবেষক কারণের দ্বারা সৃষ্ট বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে উপাদানের কারণ সমূহের প্রকৃতি বিচার করতে চেষ্টা করেন। এখানে গবেষক সরাসরি কারণ নির্ধারণ করতে না পারেন তবে উৎপাদিত বিষয়/উপাদানের মূল্যায়ন করেন এবং যদি কারণ নির্ধারণ করতে পারেন তবে কারণের বৈশিষ্ট্যের ভালো সূচক কোনটি তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন।

(গ) **দর্শকবৃন্দ এবং উপাদানের প্রভাব / ফল ঃ** এখানে গবেষক উপাদান বিশ্লেষণ করে দর্শকবৃন্দের প্রকৃত অধ্যয়ন করতে চেষ্টা করেন। বিষয়বস্তু দর্শকবৃন্দের বৈশিষ্ট্য বা যোগাযোগের প্রভাব নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

উপাদান বিশ্লেষণের ধাপ সমূহ (Steps in Content Analysis)

(ক) **বিশ্লেষণের একক এর সংজ্ঞা প্রদান ঃ** প্রথমেই গবেষকের বিষয়বস্তুর (একক) সংজ্ঞা দেওয়া উচিত যা তিনি বিশ্লেষণ করতে চান। বিষয়বস্তু একটি শব্দ, বাক্যের অংশ, অনুচ্ছেদ, প্রবন্ধ/নিবন্ধ বা সম্পূর্ণ বই হতে পারে। এককের নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে গবেষণার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে।

(খ) **চল এবং বিভাগ নির্দিষ্টকরণ ঃ** অধ্যয়নের একক প্রতীকি বিষয়বস্তু হিসাবে পরিচিত, গবেষক এদের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানসম্মত বিচার/পর্যালোচনা এবং সামান্যীকরণ করা হয়। প্রতীকি বিষয় বস্তুকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যে পরিবর্তন করার জন্য আমাদের চল বা মাত্রা/আয়তন বা বৈশিষ্ট্যের ধরন নির্দিষ্ট করা উচিত যার নিরীক্ষে পরবর্তীকালে বর্ণনা তৈরি করি। এই ধরনের চলের কিছু উদাহরণ হল—সততার মাত্রা, কর্ম সন্তুষ্টি/কর্মতৃপ্তি প্রভৃতি। এই ধরনের চল পুনরায় উঁচু, নীচু এবং যে কোনো একটিতে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। এখানে আমাদের কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম সূচিত করতে হবে প্রতীকি বিষয়বস্তুর কোন বৈশিষ্ট্য এই বিভাগে যাবে অন্য বিভাগে নয়। এই নিয়মসমূহের সম্পর্কে মন্তব্যই কোনো বিভাগের ব্যবহারিক সংজ্ঞা হিসাবে গণ্য করা হয়।

(গ) **পুনরাবৃত্তির হার অভিমুখ এবং প্রাবল্য/তীব্রতা/গভীরতা ঃ** অধ্যয়নের একক নির্ধারণ করে চল ও শ্রেণী বিভাগ যা প্রয়োগ করা হবে তা নির্দিষ্ট করে আমরা বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি অভিমুখ এবং গভীরতার নিরীখে বিশ্লেষণ করি। পুনরাবৃত্তির জানার জন্য গবেষক এককের সংখ্যা গণনা করেন যা কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগে পড়ে। অভিমুখ বলতে আকর্ষণীয়/আকর্ষণহীন, সুখবর/অসুখবর, স্বপক্ষে/বিপক্ষে অথবা নিরপেক্ষ কিনা বোঝায়। গভীরতা বলতে অধ্যয়িত এককের সংক্রান্ত বিষয়কে সূচিত করে।

(ঘ) **নমুনা/চয়ন পদ্ধতি ঃ** এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিশ্লেষিত একক অবশ্যই সমস্ত বিষয়বস্তুর প্রতিনিধি হবে যাতে প্রাপ্ত ফলাফল/সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে সামান্যীকরণ করা যায়। যা নমুনা চয়ন পদ্ধতি বিষয়ে বিশ্লেষণের একটি অন্যতম মুখ্য এবং ব্যবহারিক সমস্যা।

(ঙ) **উপাদান/বিষয় বিশ্লেষণের রূপরেখা গঠন করা ঃ** সন্তুষ্টজনক উপাদান বিশ্লেষণের রূপরেখার গঠনের জন্য ১৯৭০ সালে Cart Wright নিম্নলিখিত ধাপসমূহ বলেছেন।

ধাপ ১ - প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট করা ঃ পরবর্তীকালে জটিলতা এড়ানোর জন্য গবেষকের গবেষণা রূপরেখা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা উচিত। এটি সর্বশেষ তালিকা পরিকল্পনায় সাহায্য করে যা পরবর্তীকালে উপাদান বিশ্লেষণে সাহায্য করতে পারে।

ধাপ ২ - তালিকাবদ্ধ করণের জন্য পরিকল্পনা রূপরেখা তৈরী ঃ গবেষকের কোডেড তথ্য তালিকাবদ্ধ করার জন্য স্পষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করা উচিত। তথ্য হাতে করে না যন্ত্রের (কম্পিউটারের) সাহায্যে প্রসেস করা হবে তালিকাবদ্ধ করার জন্য তা আগে থেকেই ভেবে রাখা দরকার।

ধাপ ৩- বহির্সীমানার রূপরেখা তৈরি করা ঃ বহির্সীমানা নির্ধারণ খুব যত্নসহকারে এবং যে ধরনের একক অধ্যয়ন করা হবে। তার সেই বিষয়বস্তুর বিশদভাবে থাকা দরকার। প্রত্যেকটি গণনা এককের সংখ্যা, সাংকেতিক শব্দে পরিবর্তন করার সুযোগ, বার্তাসূত্রকের নাম, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য বিশদ ভাবে থাকা দরকার।

ধাপ ৪ - প্রত্যেকটি চলকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা ঃ গবেষকের পারস্পরিকভাবে চূড়ান্ত/পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বলতে একটি শ্রেণী বিভাগকে বোঝায় যেখানে উপাদান বিশ্লেষণে প্রাপ্ত প্রতিটি সংগতিপূর্ণ বিষয়কে রাখা যায়। পারস্পরিক ভাবে চূড়ান্ত শ্রেণী বিভাগ বলতে সেই শ্রেণী বিভাগকে বোঝায় যেখানে একটি বিষয় কেবলমাত্র একটি জায়গাতে রাখা যায়।

ধাপ ৫ - বিষয়বস্তুর একক গঠনের জন্য পদ্ধতি গঠন ঃ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বিভিন্ন বার্তাসূত্রকার একই বিভাগের একই বিষয়বস্তুকে একত্রিত করে।

ধাপ ৬ - বিশ্লেষণের রূপরেখা ও একত্রিকরনের প্রণালী তৈরির চেষ্টা ঃ বিষয়বস্তুর নমুনার উপর কিছু পাইলট কাজ করা উচিত যাতে বিশ্লেষণ রূপরেখা এবং একত্রিত করনের জন্য কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন কিনা নির্ধারণ করা যায়।

ধাপ ৭ - বার্তাসূত্রকারের নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ ঃ বিশ্লেষণ রূপরেখা এবং একত্রিকরনের পদ্ধতি

গঠন করার পর গবেষকের বিভিন্ন বার্তাসূত্রকারের নির্বাচন করা উচিত যারা সঠিক ভাবে তথ্য নিয়ে কাজ করবে এবং বিশ্লেষণ রূপরেখার প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক ব্যবহার করবে। নির্বাচনের পর বার্তাসূত্রকারদের সঠিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তার গবেষণার পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য ভালোভাবে বুঝতে পারে।

বিষয়/উপাদান বিশ্লেষণের উপযোগিতা (Utility of Content Analysis)

(১) **গুণগত অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুকে উদ্দেশ্যমুখী করা ঃ** বেশীর ভাগ সামাজিক ঘটনাই গুণগত প্রকৃতির যাদের উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্দেশ্যমুখী, বিষয়মুখী এবং বিজ্ঞানসম্মত গঠনে আনা হয়। উপাদান/বিষয় বিশ্লেষণ আমাদের গুণগত তথ্যকে শ্রেণীবদ্ধকরণ, সংকেত গঠন এবং তালিকাবদ্ধকরণের সাহায্য করে। গুণগত তথ্যকে পরিমাণগত এবং সংখ্যাগতি বিষয়ে পরিবর্তিত করা যায় সঠিক তালিকা, লেখচিত্র এবং চার্ট তৈরির সাহায্যে।

(২) **যোগাযোগ গবেষণার উপযোগিতা ঃ** যোগাযোগ প্রক্রিয়া ও তার বিভিন্ন পথের প্রভাব পঠনের জন্য উপাদান বিশ্লেষণ বিশেষত অত্যন্ত প্রয়োজন। যোগাযোগের বিভিন্ন স্তর আছে, উপাদান বিশ্লেষণ আমাদের এই স্তরের মধ্যে তুলনা করতে সাহায্য করে।

(৩) **অধ্যয়িত দলের মনোস্তাত্ত্বিক মাণ নির্ধারণ ঃ** বেশীর ভাগ মনোবিদ্যার বিষয়সমূহ গুণগত প্রকৃতির, যেমন—ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গঠন উপাদান বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে কোনো দলের মনোবিদ্যামূলক মান বস্তু নির্ভর ভাবে অধ্যয়ন করা যায়।

(৪) **নীতির পথে বিস্তার সাধন ঃ** উপাদান বিশ্লেষণনীতির/মতবাদের পদ্ধতি ও তার নানান পথ দিয়ে অধ্যয়ন করতে সাহায্য করে। যত্নশীল গবেষণার পর নীতি / মতবাদের উন্নয়ন সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া যায়।

4.6.2 আরোহী প্রণালী নির্ভর বিশ্লেষণ (Inductive Analysis)

এটি সূচিত করে মূলভাবনা / চিন্তাভাবনা, ধরন /বিন্যাস এবং শ্রেণীবিভাগ সমূহের বিশ্লেষণ নিজে থেকেই তথ্য থেকে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু গবেষকের সতর্ক ও যত্নশীল দৃষ্টির প্রয়োজন তথ্যের মধ্যে এই সকল পার্থক্য দেখার জন্য।

১৯৮২ সালে Patton-এর মতানুযায়ী মূল্যায়নের জন্য কর্মসূচী সমূহের মধ্যে পার্থক্য এবং কিভাবে অংশগ্রহণকারীরা উত্তর দিচ্ছেন এবং কর্মসূচীর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন সেই সম্বন্ধে স্বাভাবিক পার্থক্য সমূহের অধ্যয়ন বিশেষ জরুরী। তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দুই ধরনের উপস্থাপন করার পথে উদ্ভব হয়েছে। প্রথমত বিশ্লেষণকারী বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ ও কর্মসূচীকে কোনো একটি ভাবনার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। দ্বিতীয়ত বিশ্লেষণকারী কিছু শ্রেষ্ঠ বিভাগ বা ধরন/বিন্যাস দেখতে পারেন যাদের কোন পরিভাষা বা স্তর নেই এবং বিশ্লেষণকারী পরিভাষা তৈরী করেন এই সমস্ত আরোহী প্রণালীতে উদ্ভূত শ্রেণী বিভাগের জন্য।

Patton-এই ধরনের প্রচেষ্টাকে দেশীয় এবং বিশ্লেষণকারীগঠিত টাইপোলজিস নাম দিয়েছেন। "Indigenous typologies" তে গবেষক পরিভাষাগুলির উপর নজর রাখেন যেগুলি দলের মানুষদের মধ্য থেকে উঠে আসে এবং এই ধরনের পরিভাষার আলোকে দলটিকে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু "analystconstructed

typoligies'' তে গবেষক এই ধরনের কোনো জনপ্রিয় পরিভাষা অধ্যয়িত দল থেকে পান না, তাকে বিন্যাস, মূল ভাবনা বা শ্রেণী বিভাগসমূহ তৈরী করতে হয় যার ভিত্তিতে দলটিকে অধ্যয়ন করেন।

4.6.3 যুক্তিসংগত বিশ্লেষণ (Logical Analysis)

Koul (1987) - ''Logical analysis aims at creating potential categories by crossing one typology with another and then moving back and forth between the logical construction and the actual data for creating a ''new typology'' using cross - classification matrices''.

এই ধরনের বিশ্লেষণে গবেষকের এই ধরনের সর্বোচ্চ সতর্কতার প্রয়োজন এবং সংবেদনশীলতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা উচিত যে তত্ত্বের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট আচরণ অপরিলক্ষিত থেকে গেছে বা যুক্তি সংগতভাবে কোনো নূতন শ্রেণী বিভাগ করা যায় কিনা।

4.7 পরিমেয় তথ্য বিশ্লেষণ (Quantitative Data Analysis)

বেশীর ভাগ সময়ই গবেষক তথ্য স্কোর হিসাবে পেতে চায় কারণ এগুলি সহজে তালিকাবদ্ধ এবং বিশ্লেষণ করা যায়। যে সমস্ত তথ্য পরিমাপ স্কোর হিসাবে প্রকাশ করা যায় তাদের পরিমেয় তথ্য বলে, যা পরিমান প্রকাশ করে। বিভিন্ন শিক্ষামূলক টুলস নির্বাচিত নমুনার উপর ব্যবহার করে অবিশ্লেষিত পরিমেয় তথ্য পেয়ে থাকি। তারপর এই অবিশ্লেষিত তথ্য সংগঠিত, তালিকাবদ্ধ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত বৈধ সামান্যীকরণ করে থাকি।

4.8 পরিমেয় তথ্যের সুসংবদ্ধতাকরণ (Organization of Quantitative Data)

এটি সংগ্রহ করা তথ্যের সম্পাদনা, কোড গঠন, শ্রেণীবিভাগ ও তালিকা তৈরী করা নিয়ে গঠিত–

(ক) **সম্পাদনা (Editing) :** ১৯৯০ সালে কোঠারীর মন্তব্য অনুযায়ী সম্পাদন হল সংগ্রহ করা অবিশ্লেষিত তথ্য পরীক্ষা করার পদ্ধতি যাতে ভুল এবং বাদ যাওয়া তথ্য নির্ণয় করা এবং সম্ভব হলে সংশোধন করা যায়। সম্পাদনাতে প্রশ্নমালা এবং/অথবা তালিকার উত্তর সমূহ সূক্ষানুসন্ধানের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। সম্পাদনার মাধ্যমে তত্ত্ব সঠিক, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, একইভাবে নথিভুক্ত করা, যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ এবং কোডিং ও তালিকাবদ্ধ করার জন্য সুগঠিত করা সুনিশ্চিত করা হয়। সম্পাদনা হল তথ্য সুসংবদ্ধকরণের প্রথম ধাপ।

(খ) **সংকেত গঠন (Coding) :** ১৯৯০ সালে কোঠারীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী সংকেত (Coding) গঠন হল উত্তরের সংখ্যাসূচক / সংখ্যাগত অথবা অন্যপ্রতীক বা চিহ্ন প্রদান যাতে উত্তর সীমিত সংখ্যার বিভাগে/ শ্রেণীতে রাখা যায়। এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ গবেষণা জন্য উপযুক্ত এই ধরনের শ্রেণী বিভাগের সম্পূর্ণতা আছে, এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পূর্ণতাও বর্তমান। তথ্যের সংকেত গঠনে শ্রেণীর সম্পূর্ণতা বিশেষত্ব/স্বাতন্ত্র্য এবং বিস্তৃতি যত্নসহকারে অনুসরণ করা দরকার।

(গ) **শ্রেণীবিন্যাসকরণ (Classification) :** শ্রেণীবিন্যাস বলতে অবিশ্লেষিত তথ্যকে একই ধরনের

বৈশিষ্ট্যের সাধারণ ভিত্তিতে বিভিন্ন সমগোত্রীয় বিভাগ বা শ্রেণী বা দলে ভাগ করা, যাতে কিছু অর্থবহ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

তথ্যের শ্রেণীবিভাগে দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। প্রথমটি হল নমুনার বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে (উদাহরণ–লিঙ্গ, সাক্ষরতা প্রভৃতি) এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি সূচক-এর (বয়স, আয়, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি) ভিত্তিতে।

অবিশ্লেষিত তথ্য (Raw Data) : যখন শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষা পরিচালনা করি, তখন ক্রমিক সংখ্যা (Roll Number) অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের স্কোর হল অবিশ্লেষিত তথ্য-এর ভালো উদাহরণ।

উদাহরণ :-	ক্রমিক সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	পরীক্ষার স্কোর	৫৯,	৮১,	৬৫,	৬১,	৭৯,	৫৪,	৬০

বিন্যাস (Array) : একই স্কোর নিম্ন বা উর্দ্ধক্রম অনুসারে সাজানোকে বিন্যাস (Array) বলে।

উদাহরণ :- পরীক্ষার স্কোর— ৮১, ৭৯, ৬৫, ৬১, ৬০, ৫৯, ৫৪ বিন্যাস সহজবোধ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বোচ্চ (৮১) সর্বনিম্ন (৫৪) এবং মাঝের স্কোর (৬১) সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

তথ্য দল/রাশিতথ্য (Group Data) : দলবদ্ধ তথ্য—

অধিকতর সহজে এবং বিস্তারিতভাবে উচ্চতর পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে বোঝা যায়।

অবিশ্লেষিত তথ্যকে দলবদ্ধ করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুযায়ী রাশিতথ্যের পরিসংখ্যা ছক তৈরী করি।

একটি শ্রেণী পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ৫০ নম্বরের পরীক্ষায় ২৫ জন শিক্ষার্থী দ্বারা প্রাপ্ত নম্বরের পরিসংখ্যা বিভাজন ছক/টেবিল তৈরী—

টেবিল-১

২২	৩৬	৩৪	৪২	২৭
১৮	২৬	৩২	৪৫	৪৮ *
৩৩	২১	৩০	২৬	৩২
৩৯	২৪	৩৫	৩০	৪১
৩৬	৪১	১৬ * *	২৫	৩১

* হল সর্বোচ্চ নম্বর * * সর্বনিম্ন নম্বর।

ধাপ-১ : বিস্তৃতি বা প্রসার (Range) নির্ণয় (সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নম্বরের পার্থক্য যুক্ত এক)। উপরের টেবিলে-র সর্বোচ্চ ৪৮ এবং সর্বনিম্ন ১৬ সুতরাং প্রসার হল ৪৮-১৬ + ১ = ৩৩।

ধাপ-২ : শ্রেণী প্রসারের (Class Interval-CI) সংখ্যা ও আকার (number ও size) স্থির করা যাতে

স্কোরগুলি শ্রেণী বিন্যাস করা হবে সাধারণভাবে ব্যবহৃত শ্রেণী প্রসারের আকার ৩, ৫ বা ১০ এবং দল সংখ্যা ১৫ সহজ পরিসংখ্যানমূলক বিচারের জন্য ৫ থেকে ১৫ মধ্যে রাখা হয়। এটি রাশিতথ্যের ব্যবহার সহজ করে দেয়। আমাদের উদাহরণে আমরা একটি শ্রেণী প্রসারে ৫টি ইউনিটে দল বা আকার নির্বাচন করেছি, সুতরাং/শ্রেণী প্রসারের সংখ্যা-৭ (প্রসারকে আকার দ্বারা ভাগ করে অর্থাৎ ৩৩/৫ = ৬.৬ বা পূর্ণসংখ্যা ৭)

ধাপ-৩ ঃ প্রাপ্ত নম্বরগুলি এক এক করে তাদের শ্রেণী প্রসারে টালি করা হল -

টেবিল-২ ঃ পরিসংখ্যা বিভাজন ছক

শ্রেণী-প্রসার/বিভাগ	টালিমার্ক	পরিসংখ্যা
৪৫-৪৯	I	১
৪০-৪৪	III	৩
৩৫-৩৯	IIII	৪
৩০-৩৪	~~IIII~~ II	৭
২৫-২৯	~~IIII~~	৫
২০-২৪	III	৩
১৫-১৯	II	২
		N = ২৫

প্রথম নম্বরটি অর্থাৎ ২১। ২০-২৪ শ্রেণী প্রসারের মধ্যে পড়ে তাই এর জন্য একটি টালি মার্ক ('/') দেওয়া হল। এইভাবে পরের নম্বরটি ১৮, ১৫-১৯ শ্রেণী প্রসারের মধ্যে পড়ে তাই এর জন্য একটি টালি মার্ক ঐ শ্রেণী প্রসারের জন্য দেওয়া হল। এইভাবে ২৫টি নম্বর শ্রেণীবদ্ধ করা হল। মনে রাখতে হবে ৫ নম্বর টালি মার্কটি আগের ৪টি টালিমার্ককে ছেদ করবে, অর্থাৎ '~~IIII~~'। এর টালির সহজ গণনার জন্য করা হয়। এরপর প্রতিটি শ্রেণী প্রসারের টালিমার্ক গণনা করে তৃতীয় স্তম্ভে পরিসংখ্যা (frequency-f)-তে লেখা হয়। পরিসংখ্যা বলতে একটি শ্রেণী প্রসারের মধ্যেকার সমস্ত কেসের (এখানে নম্বরের) সংখ্যাকে বোঝায়। সমস্ত পরিসংখ্যার সামগ্রিক যোগফল 'N' দ্বারা সূচিত করা হয় যা সমস্ত অধ্যয়িত কেসের সংখ্যা সূচিত করে অর্থাৎ এখানে ২৫ জন শিক্ষার্থীর N = ২৫।

শ্রেণী প্রসারের সীমা (Limits of A Class Interval) : শ্রেণীপ্রসারের সীমা ০.৫ ইউনিট পর্যন্ত ঐ শ্রেণী প্রসারের প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করে প্রকৃত সীমা ১৫-১৯-এর ক্ষেত্রে ১৪.৫ থেকে ১৯.৫ এবং ২০-২৪ এর ১৯.৫ - ২৪.৫ হয়। মধ্য বিন্দু (Mid point) = কোনো শ্রেণী বিভাগের ঠিক মধ্যমানকে ইহার মধ্যবিন্দু বলা হয়। এখানে ১৫-১৯ শ্রেণীবিভাগের মধ্য বিন্দু ১৭। যে কোনো শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু নির্ণয় করার জন্য এর নিম্নসীমা এবং উর্দ্ধসীমা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায়। এখানে (১৫+১৯)/২=১৭

(ঘ) ছকবিন্যাস/তালিকাবদ্ধকরণ (Tabulation) : ১৯৯০ সালে কোঠারীর মতানুযায়ী সংগ্রহ করা

তথ্যকে একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত এবং যুক্তিসংগত ভাবে একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। সুতরাং তালিকাবদ্ধকরণ হল অবিশ্লেষিত তথ্যের সারসংক্ষেপ করার পদ্ধতি এবং একই তথ্যকে বিশ্লেষণের জন্য কমপ্যাক্ট আকারে (Statistical table আকারে) প্রদর্শন করা। বৃহৎ অর্থে "tabulation is an orderly arrangement of data in column and rows."

ছক বিন্যাসকরণ পরিসংখ্যানগতভাবে তথ্যকে বিশ্লেষণ করার জন্য তালিকাবদ্ধ করা জরুরী। এটি হাতে বা যান্ত্রিকভাবে বৈদ্যুতিন যন্ত্রের সাহায্যে করা যেতে পারে।

4.9 পরিমেয় তথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of the Quantitative Data)

বিশ্লেষণ বলতে তথ্যের পরিচর্যাকে বোঝায় যার ফলে প্রাপ্ত অনুসন্ধান লব্ধফলের ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। এর জন্য সতর্ক, গতিশীল এবং মুক্তমনের গবেষকের দরকার। তথ্য সংগ্রহ করার আগে তথ্য বিশ্লেষণের পরিকল্পনা তৈরী করা উচিত। ১৯৪১ সালে Good, Barr এবং Scates তথ্য বিশ্লেষণের জন্য চারটি উপদেশ দিয়েছিলেন।

(ক) আগেভাগেই তথ্যানুযায়ী তাৎপর্যপূর্ণ তালিকাসমূহের চিন্তা-ভাবনা করা।

(খ) সমস্যা সম্পর্কিত মন্তব্য এবং আগের বিশ্লেষণ যত্নসহকারে পরীক্ষা করা এবং খুব সতর্কভাবে আসল তথ্য অধ্যয়ন করা।

(গ) কিছু সময়ের জন্য তথ্যকে ধারে সরিয়ে রেখে সমস্যাকে সাধারণ মানুষের মত ভাবতে হবে অথবা সমস্যা নিয়ে অভিজ্ঞ এবং দক্ষ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

(ঘ) বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

বর্তমান গবেষণায় পরিসংখ্যানবিদ্যার ব্যবহার ছাড়া কোনো কিছু প্রমাণ করা খুব কঠিন। পরিসংখ্যানবিদ্যা হল গণিত শাস্ত্রগত টেকনিক বা পদ্ধতি সমূহের সমাহার যা সংখ্যাগত তথ্যসংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা প্রদানে সাহায্য করে।

তথ্য দুই প্রকার ঃ

(১) প্যারামেট্রিক তথ্য ঃ এটি হল পরিমাপ করা তথ্য, প্যারামেট্রিক পরীক্ষা অনুমান নির্ভর যেখানে তথ্য সাধারণভাবে বা তার কাছাকাছি ছড়িয়ে থাকে। প্যারামেট্রিক পরীক্ষা (উদাহরণ t- test, ANOVA, Factor Analysis, Pearson's প্রভৃতি) ইন্টারভ্যাল এবং রেশিওস্কেল তথ্যে ব্যবহার করা যায়।

(২) নন প্যারামেট্রিক তথ্য ঃ এই ধরনের তথ্য হিসাবযোগ্য অথবা পংক্তিভুক্ত। নন-প্যারামেট্রিক পরীক্ষা (উদাহরণ--Spearman's Rho, Mann-Whitney Utest, Wilcoxon, Chi-Square, median প্রভৃতি) কখনো কখনো "distribution free tests নামে পরিচিত। এটি সাধারণভাবে বণ্টিত পপুলেশনের অনুমানের উপর বিশ্বাস করে না।

4.9.1 বর্ণনাধর্মী তথ্য বিশ্লেষণ (Descriptive Data Analysis)

বর্ণনাধর্মী তথ্য বিশ্লেষণ ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট দলের ব্যক্তিদের (যাদের আমরা অধ্যয়ন করেছি)

সম্বন্ধে সামান্যীকরণ করতে পারি। আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত সেই দলের বাইরে নিয়ে যেতে পারি না, কারণ তথ্য কেবলমাত্র নির্দিষ্ট দলেরই বৈশিষ্ট্যসমূহকে বর্ণিত করে এবং ঐ নির্দিষ্ট দলের প্রকৃতি সম্পর্কে আকাঙ্খিত তথ্য সরবরাহ করে।

পরিসংখ্যানগত পরিমাপন ঃ তথ্যকে অর্থপূর্ণভাবে বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ করার জন্য নানা পরিসংখ্যানগত পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

I. কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ (Measures of Central Tendency)

(ক) মধ্যক (Mean)

(খ) মধ্যমা (Median)

(গ) সংখ্যা গুরুমান (Mode)

II. বিস্তৃতির পরিমাপ (Measures of Spread or Dispersion)

(ক) প্রসার (Range)

(খ) গড় পার্থক্য (The Deviation from the Mean (x))

(গ) ভেদমান (Variance)

(ঘ) সম্যক পার্থক্য (Standard Deviation)

III. পারস্পরিক অবস্থান পরিমাপ (Measures of Relative Position)

(ক) Percentile Rank.

(খ) Percentile Score.

(গ) Standard Scores

IV. সম্পর্ক পরিমাপ (Measures of Relationship)

(ক) সহপরিবর্তন গুণাঙ্ক (Co-efficient of Correlation)

(1) Pearson's Product-Moment co-efficient of correlation

(2) Spearman Rank order co-efficient of correlation.

(3) Phi Correlation Coefficient.

4.9.2 অনুমান নির্ভর তথ্য বিশ্লেষণ (Inferential Data Analysis)

গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হল চলদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে সাধারণ নীতি আবিষ্কার করা। যদি সমস্ত পপুলেশনকে পর্যবেক্ষণ করতে হয় তবে গবেষণা প্রক্রিয়া কখনোই শেষ হবে না এবং তা প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ। অনুমান নির্ভর তথ্য বিশ্লেষণ হল ব্যবহারিক সমাধান। এই ধরনের বিশ্লেষণে নমুনাচয়ন পদ্ধতি আছে এবং আমরা একটি ছোটো দলকে (যাদের মধ্যে পপুলেশনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বলে ধরে নিই) অধ্যয়ন করি। এই ছোটো দলকে নমুনা বলে এবং যাদের থেকে নমুনা (ছোটো দল) নেওয়া হয় তাকে পপুলেশন বলে। এই ধরনের তথ্য বিশ্লেষণে নমুনাতে প্রাপ্ত ফলাফল, পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্তসমূহ সমস্ত পপুলেশনে সামান্যীকরণ করা হয়।

পরিসংখ্যানগত পরিমাপনসমূহ ঃ

I. Parametric Tests—

(1) T-test.

(2) ANOVA (Analysis of Variance)

(3) AN Cova (u of Co-varicince)

(4) Factor Analysis.

(5) Pearson's r.

II. Non-Parametric Tests :

(1) The Chi-Square Test.

(2) The Mann-Whitney Test.

(3) Wilcoxon Test.

(4) Spearman's rho.

কিছু পরিসংখ্যানগত টেকনিক সম্বন্ধে নিম্নে দেওয়া হল—

(১) কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ বা গড় (Measures of Central Tendency or Average Test) : কেন্দ্রীয় প্রবণতাকে "a sort of average or typical value of the items in a series and its function is to summarize the series in terms of this average value." যদি আমরা একটি শ্রেণীর একদল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর পরিসংখ্যা বিভাজন (frequency distribution) অনুযায়ী সাজাই তবে আমরা দেখবো খুব কম শিক্ষার্থী খুব বেশ বা খুব কম স্কোর করেছে। বেশীর ভাগ স্কোরই সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্কোরের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রবণতা কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central tendency) নামে পরিচিত এবং 'measures of central tendency' বলতে সেই স্কোরটিকে বোঝায় যা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্কোরের মধ্যে অবস্থিত এবং বেশীর ভাগ শিক্ষার্থী তার অংশীদার।

শিক্ষামূলক গবেষণায় সাধারণত নিম্নলিখিত গড়গুলি ব্যবহৃত হয়—

(ক) মধ্যক (The Mean)

(খ) মধ্যমা (The Median)

(গ) সংখ্যাগুরুমান (The Mode)

(ক) মধ্যক (The Mean (M) — এটা সাধারণভাবে গড় (average) অর্থাৎ একটি সিরিজের সমস্ত স্কোরের যোগফলকে স্কোরের নাম্বার দিয়ে ভাগ করে গড় পাওয়া যায়।

অবিন্যস্ত (ungrouped) রাশিতথ্যের গড় নির্ণয়—

সূত্র : $M = \sum X/N$ যেখানে M = মধ্যক।

$\sum$ = সম্পূর্ণ যোগফল

'X' = স্কোর/নম্বরসমূহ

N = স্কোর/নম্বরের সংখ্যা।

উদাহরণ ঃ

'X'
৬০
৪৫
৫০
৪৪
৫৯
৫৫
৬১
∑x = ৩৭৬

N = ৭ অতএব, মধ্যক/গড় = ৩৭৫/৭ = ৫৩.৫৭

H **বিন্যস্ত রাশিতথ্যের মধ্যক নির্ণয়** ঃ বিন্যস্ত রাশিতথ্য (Grouped Data) বলতে রাশিতথ্য যা পরিসংখ্যা বিভাজন ছক (frequency distribution table) আকারে উপস্থাপিত তাকেই বোঝায়।

সূত্র ঃ $M = \sum fx/N$ যেখানে M = গড়/মধ্যক

∑ = যোগফল।

f = পরিসংখ্যা।

x = শ্রেণী বিভাগের/প্রসারের মধ্যবিন্দু।

N = পরিসংখ্যার যোগফল।

উদাহরণ ঃ

শ্রেণীপ্রসার (CIs)	f(frequency)	X (মধ্যবিন্দু)	fx
৪৫-৪৯	১	৪৭	৪৭
৪০-৪৪	৩	৪২	১২৬
৩৫-৩৯	৪	৩৭	১৪৮
৩০-৩৪	৭	৩২	২২৪
২৫-২৯	৫	২৭	১৩৫
২০-২৪	৩	২২	৬৬
১৫-১৯	২	১৭	৩৪
	N = ২৫		∑fx = ৭৮০

M = ∑fx / N = ৭৮০/২৫

M = ৩১.২

(খ) মধ্যমা (Median-Md) : মধ্যমা হল বিন্দু (স্কোর) যা রাশি তথ্যমালাকে দুইটি সমান অংশে বিভক্ত করে। মানের উর্দ্ধক্রম অনুযায়ী রাশিগুলিকে সাজালে যে রাশিটি ঠিক মাঝখানে থাকে তাই হল রাশি তথ্যমালার মধ্যমা।

মধ্যমার একপাশের প্রত্যেকরাশির মান মধ্যমা থেকে কম এবং অন্যপাশের প্রত্যেকটি রাশির মান মধ্যমা থেকে সর্বদা বেশী হয়।

* অবিন্যস্ত রাশিতথ্যের মধ্যমা নির্ণয়—যখন রাশি সংখ্যা (N) অযুগ্ম ঃ সূত্র Md = N + 1\2-তম রাশি।

  উদাহরণ ঃ পরীক্ষার নম্বর—৫৯, ৮১, ৬৫, ৬০,৭৯, ৫৪, ৬১। উর্দ্ধক্রম অনুযায়ী ৮১, ৭৯, ৬৫, ৬১, ৬০, ৫৯, ৫৪ এখানে N = ৭

  সুতরাং Md = ৭+১/২=৮/২=৪ তম মান = 61।

  যখন রাশিসংখ্যা (N) যুগ্ম — এক্ষেত্রে উর্দ্ধক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে মাঝখানে দুটি রাশি পাওয়া যাবে যাহাদের উভয়ের যৌগিক গড় মধ্যমা নির্ণয় করে।

  সূত্র—Md = N/2 তম রাশির মান + N/2 + 1তম রাশির মান/2

  উদাহরণ—নম্বরসমূহ—৫৯, ৮১, ৬৫, ৬১, ৭৯, ৫৪

  উর্দ্ধক্রম অনুযায়ী—৮১, ৭৯, ৬৫, ৬১, ৫৯, ৫৪ এখানে N = ৬।

  সুতরাং মাধ্যমা (Md) = তৃতীয় রাশির মান + 6/2+1তম রাশির মান/২

  = তৃতীয় রাশির মান + চতুর্থ রাশির মান/২

  = ৬৫+৬১/২=১২৬/২ = ৬৩

  সুতরাং মধ্যমা = ৬৩।

* বিন্যস্ত রাশিতথ্যের মধ্যমা নির্ণয়—

  সূত্র Md = L + (N/2 – F/)/f ×ci

  যেখানে Md = মধ্যমা

  L = যে শ্রেণী বিভাগে মধ্যমা হয় তার প্রকৃত নিম্নসীমা।

  N = সমস্ত পরিসংখ্যার যোগফল।

  F = যে শ্রেণী বিভাগে মধ্যমা হয় তার নীচের সমস্ত শ্রেণীর পরিসংখ্যার যোগফল।

  f = যে শ্রেণী বিভাগে মধ্যমা হয় তার পরিসংখ্যা সংখ্যা।

  Ci = শ্রেণী বিভাগ (শ্রেণী প্রসার)।

যেহেতু মধ্যমা মাঝের রাশির মান সেইহেতু আমাদের মাঝের রাশিটি সনাক্ত করতে হবে। আমরা এই রাশিসংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করে পেতে পারি (N/2)। আমাদের উদাহরণে N = ২৫। সুতরাং N/2 বা ২৫/২ = ১২.৫। সুতরাং মধ্যমা ১২ তম রাশি ও ১৩ তম রাশির মানের মাঝে কোথাও হবে। যদি আমরা

সমস্ত পরিসংখ্যা যোগ করি (নীচ বা উপর যে কোনদিক থেকে) তবে মধ্যমা ৩০-৩৪ শ্রেণী বিভাগের মধ্যে পড়ে।

উদাহরণ : শ্রেণী বিভাগ	f	
৪৫-৪৯	১	
৪০-৪৪	৩	
৩৫-৩৯	৪	
৩০-৩৪	৭	মধ্যমা শ্রেণী
২৫-২৯	৫	
২০-২৪	৫	
১৫-১৯	৩	
১৫-১৯	২	
	N = ২৫	
	N/২=১২.৫	

Md = L + (N/২ – F)/f×Ci

= ২৯.৫ + (১২.৫-১০/৭) × ৫ = ৩১.২৯

(গ) **সংখ্যাগুরুমান (The Mode-Mo) :** রাশি তথ্যমালার মধ্যে যে রাশির মান সর্বাধিকবার পাওয়া যায় তাকে ঐ রাশি তথ্যমালার সংখ্যাগুরু মান বলে। অর্থাৎ যে মানটি সর্বাধিক বার পাওয়া যায় তাই হল সংখ্যাগুরু মান।

অবিনাস্ত রাশিতথ্যের সংখ্যাগুরুমান (Mo) নির্ণয়— এক্ষেত্রে যত্ন সহকারে খুঁজে বের করতে হয় একটি শ্রেণীতে কোন মানটি সর্বাধিক বার আছে।

উদাহরণ — ৬৯, ৫৮, ৪৫, ৭৮, ৭২, ৫৮, ৮৩, ৫৮, ৪৫

সাজিয়ে— ৮৩, ৭৪, ৭২, ৬৯, ৫৮, ৫৮, ৪৫, ৪৫

এখানে Mo = ৫৮ (কারণ ৫৮ সংখ্যাটি সর্বাধিক বার পাওয়া গেছে)।

যদি রাশিমালাতে একটি সংখ্যাগুরুমান থাকে তাকে এক সংখ্যাগুরু মান (Unimodal Frequency Distribution) বলে। যদি পরিসংখ্যা বিভাজনে দুটি সংখ্যাগুরুমান থাকে তাকে দুই সংখ্যাগুরুমান (Bimodal Frequency Distribution) এবং দুইয়ের অধিক থাকলে তাকে বহু সংখ্যাগুরু মান (Multimodal Frequency Distribution) বলে।

বিন্যস্ত রাশিতথ্যের সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় :—

সূত্র : Mo = ৩M – ২M

যেখানে Mo = সংখ্যাগুরুমান

Md = মধ্যমা

M = মধ্যক

উদাহরণ — আমরা আগের উদাহরণের মধ্যক এবং মধ্যমা নির্ণয় করেছি। এখন সংখ্যাগুরু মান (Mo) নির্ণয় করব।

শ্রেণীবিভাগ	f
৪৫-৪৯	১
৪০-৪৪	৩
৩৫-৩৯	৪
৩০-৩৪	৭
২৫-২৯	৫
২০-২৪	৩
১৫-১৯	২
	N = ২৫
	M = ৩১.২
	Md = ৩১.২৯

সুতরাং Mo = ৩×৩১.২৯ - ২ × ৩১.২

= ৯৩.৮৭ - ৬২.৪

= ৩১.৪৭

(২) **বিস্তৃতির পরিমাপ (Measures of Spread or Dispersion) :** কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ সমস্ত রাশি দলের গুণমান একটি একক স্কোর দ্বারা উপস্থাপিত করে। এটি রাশি দলে স্কোরগুলি এদের পরিসংখ্যা গড়ের চারিদিকে কিভাবে বিস্তৃত সে সম্পর্কে কোন আলোকপাত করে না।

উদাহরণ—৭ জন শিক্ষার্থীর একটি দল দুটি ভিন্ন পরীক্ষায় স্কোর করেছে -

	পরীক্ষা-১ (বাংলা)		পরীক্ষা-২ (বিজ্ঞান)	
শিক্ষার্থী	স্কোর	গ্রেড	স্কোর	গ্রেড
০২	৯২	A	৭৯	C
০৩	৮৩	B	৭৮	C
০৪	৮১	B	৭৮	C

০৪	৭৭	C	৭৭	C
০৫	৭০	C	৭৬	C
০৬	৬৬	D	৭১	C
০৭	৬১	D	৭১	C

X = ৫০০	X = ৫৩০
N = ৭	N = ৭
M = ৭৫.৭১	M = ৭৫.৭১
Md = ৭৭	Md = ৭৭

দুটি ভিন্ন পরীক্ষার সমান মধ্যক এবং মধ্যমাকে সমানাকৃতির কৃতকার্য বলে বিবেচনা করা উচিত? দুটি পরীক্ষার সাফল্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই? সুতরাং এটি পরিষ্কার যে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ পরিষ্কারভাবে দুটি পরীক্ষার সাফল্যের পার্থক্য নিরুপণ করতে ব্যর্থ। এখানে আমাদের বিস্তৃতির বা ভেদের মাপ করা দরকার। এটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বিজ্ঞানের স্কোরের খুব পার্থক্য বর্তমান বিজ্ঞানের স্কোরের মধ্যে খুব কম পার্থক্য বর্তমান, সেইহেতু তারা সমগোত্রীয়। হিন্দীর স্কোরগুলি 'A' গ্রেড থেকে 'C' গ্রেড পর্যন্ত বিস্তৃত সেইকারণে অসমগোত্রীয় প্রকৃতির।

নিম্নে কতগুলি বিস্তৃতির পরিমাপ দেওয়া হল—

(ক) **প্রসার (The Range) :** প্রসার হল রাশিমালার অন্তর্গত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম রাশিদ্বয়ের বিয়োগফলের সঙ্গে ১ যোগ।

উপরের হিন্দীর পরীক্ষার মানের প্রসার হল ৩২(৯২-৬১+১) এবং বিজ্ঞানের কেবলমাত্র ৯(৭৯-৭১+১)।

কিন্তু এতে কেবলমাত্র চূড়ান্ত স্কোর (বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম) এর মান নিয়ে আলোচনা করে অন্যরাশিগুলি উপেক্ষিত। ব্যক্তিগত স্কোরগুলির উপর যথাযথ গুরুত্ব দেয় না।

(খ) **গড় পার্থক্য (The Deviation from the Mean, x) :** অনেকক্ষেত্রে গড় মানের পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়, সম্পর্কিত শ্রেণীর মধ্যক থেকে ব্যক্তি স্কোরে দূরত্ব প্রকাশ করে।

সূত্র ঃ $x = X - M$ যেখানে xx = গড় পার্থক্য

X = ব্যক্তিগত স্কোর

M = মধ্যক

উদাহরণ ঃ 'X' — (X-Md) = x

১৫	(১৫-২৬) = ১১
২৪	(২৪-২৬) = -২
৩১	(৩১-২৬) = +৫
৩৫	(৩৫-২৬) = +৯
২৫	(২৫-২৬) = -১
X = ১৩০	x = 0
N = ৫	
M = ২৬	

যদি ব্যক্তিগত স্কোর 'X' মধ্যক (M)-এর চেয়ে বড় হয় তবে গড় পার্থক্য (x) ধনাত্মক (+)। যদি ব্যক্তিগত স্কোর মধ্যক (M)-এর চেয়ে ছোটো হয় তবে গড় পার্থক্যের (x) চিহ্ন ঋণাত্মক (-) এবং x সমান শূন্য হবে।

(গ) ভেদমান (**The Variance-σ^2**) : গড় পার্থক্য (x) নির্ণয় করার পর ব্যক্তিগত পার্থক্যকে বর্গ করা হয় এবং তারপর সমস্ত x^2 কে যোগ করে রাশি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রাপ্ত মানকে ভেদমান বলা হয় যা একটি রাশিমালাতে সমস্ত স্কোরগুলি গড়ের নিরিখে কিভাবে বিস্তৃত তা প্রকাশ করে। অর্থাৎ সম্যক পার্থক্যের বর্গের মানকে ভেদমান বলে।

সূত্র ঃ $\sigma^2 = \sum(X-M)^2/N$ বা

$\sigma^2 = \sum x^2/N$

যেখানে σ^2 = ভেদমান

$\sum x^2$ = ব্যক্তিগত গড় পার্থক্যের বর্গের যোগফল N = স্কোর সংখ্যা।

উদাহরণ ঃ

X	(X-M) = x	x^2
২৫	(১৫-১৬) = -১	১২১
২৪	(২৪-২৬ →) = -২	৪
৩১	(৩১-২৬ →) = +৫	২৫
৩৫	(৩৫-২৬ →) = +৯	৮১
২৫	(২৫-২৬ →) = -১	১
N = ৫		$\sum x^2$ = ২৩২

$\sigma^2 = \sum x^2/N$

= ২৩২/৫

= ৪৪৬.৪

(ঘ) **সম্যক পার্থক্য (Standard Deviation-σ/SD) :** ভেদমানের বর্গমূল মানকে সম্যক পার্থক্য বলে যা SD নামে পরিচিত। এটি বিস্তৃতি পরিমাপে খুব জনপ্রিয়, তাৎপর্যজনক এবং অধিক গ্রহণযোগ্যও সুস্থির। এটি গ্রীক অক্ষর সিগ্মা (σ) দ্বারা সূচিত।

অবিন্যস্ত রাশিতথ্যের SD নির্ণয়--

সূত্র ঃ $\sigma = \sqrt{\sum x^2 / N}$

উদাহরণ ঃ

X	(X-M) = x	x^2
১৫	(১৫-১৬) = − ১১	১২১
২৪	(২৪-২৬ →) = − ২	৪
৩১	(৩১-২৬ →) = + ৫	২৫
৩৫	(৩৫-২৬ →) = + ৯	৮১
২৫	(২৫-২৬ →) = − ১	১
N = ৫		$\sum$x = ২৩২

$\sigma = \sqrt{\sum x^2 / N}$

= $\sqrt{২৩২ / ৫}$

= $\sqrt{৪৬.৪}$ = ৬.৮১

শ্রেণীবদ্ধ বিন্যস্ত রাশিতথ্য মালার SD নির্ণয়

সূত্র ঃ $\sigma\sqrt{fx^2 / N}$

যেখানে d = সম্যক পার্থক্য

$x^2 = (X\text{-}M)^2$ যেখানে 'X' শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু এবং M হল মধ্যক

f = পরিসংখ্যা (frequency)

N = সমস্ত পরিসংখ্যার যোগফল।

উদাহরণ ঃ

শ্রেণীবিভাগ	f	X (মধ্যবিন্দু)	M	x	x^2	fx^2
৪৫-৪৯	১	৪৭	৩২	১৫	২২৫	২২৫
৪০-৪৪	৩	৪২	৩২	১০	১০০	৩০০
৩৫-৩৯	৪	৩৭	৩২	৫	২৫	১০০
৩০-৩৪	৭	৩২	৩২	০	০	০
২৫-২৯	৫	২৭	৩২	-৫	২৫	১২৫
২০-২৪	৩	২২	৩২	-১০	১০০	৩০০
১৫-১৯	২	১৭	৩২	-১৫	২২৫	৪৫০

$\sum fx^2$ = ১৫০০

N = ২৫ $\sum$ 'X' = ২২৪

M = $\sum$ 'X'/N

= ২২৪/১৫

M = ৩২

সমস্ত মান সূত্রে প্রয়োগ করে—

= $\sigma\sqrt{\sum fx^2 / N}$

= $\sqrt{১৫০০ / ২৫}$

= $\sqrt{৬০}$

= ৭.৭৫

উপরের বিষয়সমূহ ছাড়াও আরও অনেক প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ পরিসংখ্যান পদ্ধতি আছে, যাদের সম্বন্ধে জ্ঞান একজন গবেষকের গবেষণার জন্য খুবই অপরিহার্য। যারা ভবিষ্যতে গবেষণা করবে তাদের সবধরনের পরিসংখ্যান পদ্ধতির তত্ত্ব ও ব্যবহারিক বিশদ জ্ঞান অর্জন দরকার। অধিক তথ্যের জন্য ফার্গুসন (১৯৮১), গিলফোর্ড (১৯৭৮), গ্লাস ও হপকিন্স (১৯৮৪) হেজ (১৯৮১) পড়া যেতে পারে।

4.10 ফলাফলের ব্যাখ্যা (Interpretation of Results)

তথ্য গুণগত এবং পরিমেয় এই দুইশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এইগুলিকে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।

4.10.1 গুণগত তথ্যের ব্যাখ্যা (Interpretation of Qualitative Data)

বিশ্লেষণ পদ্ধতির সর্বশেষ এবং অন্যতম অধ্যায় হল তথ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করা। Patton (1990) এর মতানুযায়ী (Interpretation) ফলাফলের ব্যাখ্যা, 'কেন' প্রশ্নের উত্তর দান, কোনো নির্দিষ্ট ফলে তাৎপর্য যোগ করা এবং বিশ্লেষণাত্মক মূল কাঠামোতে বিন্যাস স্থাপন করাকে বোঝায়।

গুণগত তথ্যের ব্যাখ্যা প্রদান গবেষকের গবেষণা দক্ষতা, গবেষণার পূর্ব অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা এবং পক্ষপাতের উপর নির্ভর করে। গুণগত তথ্যকে বস্তুগতভাবে ব্যাখ্যা করা পরিমেয় তথ্যের তুলনায় খুবই জটিল কারণ পরিমেয় তথ্য সরাসরি তথ্যের সংখ্যাগত বিশ্লেষণের সাহায্য পাওয়া যায়। বর্ণনাধর্মী জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাকারী ফলাফলের ব্যাখ্যা করেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি কেবলমাত্র ব্যাখ্যাকারীর জন্য নয়, পাঠকদেরও জানা দরকার ব্যাখ্যাকারী কিভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

4.10.2 পরিমেয় তথ্যের ব্যাখ্যা (Interpretation of Quantitative Data)

পরিমেয় তথ্যের সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের পর গবেষক ফলাফলের ব্যাখ্যা প্রদানে উৎসাহী হন। এটি হল তথ্য কি প্রকাশ করছে তা দেখানো পদ্ধতি। তাদের অর্থ কি, প্রাপ্ত ফলাফল তাৎপর্যপূর্ণ কিনা, প্রকৃত সমস্যার সমাধান কি প্রভৃতি দেখানোর পদ্ধতি। এটি মনে রাখার বিষয় যে তথ্য কথাও বলে না বা নিজেরা নিজেদের ব্যাখ্যা দিতে পারে না, গবেষক তথ্যকে জিহ্বা ও শব্দ দেয় এবং গবেষণা সমস্যার আলোকে তথ্যের অর্থও তৈরী করে। সুতরাং ব্যাখ্যা করার সময় গবেষকের নিজের পক্ষপাত ও ধারণাসমূহের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, যাতে বস্তুনিষ্ঠভাবে ফলাফলের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

4.10.3 ভালো ব্যাখ্যাত অর্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Good Interpretation)

(ক) **আত্মানুভূতি-প্রসূত কোনো কিছুর স্থান নেই (No Place for Subjectivity) :** ব্যাখ্যাকারী নিজের পক্ষপাত, চিন্তাভাব নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং ফলাফল বস্তুগতভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।

(খ) **সঠিক এবং যথাযথ ব্যাখ্যা দান ঃ** ব্যাখ্যা যথাযথ এবং সঠিক হতে হবে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ছাড়া যাবে না এবং কোনো অপ্রাসঙ্গিক সূত্র অনুসন্ধান করাও যাবে না।

(গ) **ফলাফল/অভিমতের স্পষ্ট প্রকাশ ঃ** ফলাফলের অসতর্ক এবং অস্পষ্ট প্রকাশ বিভ্রান্তি অনাগ্রহ এবং জ্ঞানের ক্ষতি করে। সেইহেতু ফলাফল/অভিমতের ব্যাখ্যা ও তার প্রকাশ স্বচ্ছ হওয়া দরকার।

(ঘ) **আগের জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা ঃ** ব্যাখ্যা করার সময় গবেষকের একই ক্ষেত্রের আগের গবেষণার সঙ্গে যোগসূত্র আছে কিনা বা তার থেকে কিভাবে আলাদা তা দেখা উচিত।

(ঙ) **ভুলত্রুটি সমূহের মেনে নিয়ে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা ঃ** একজন ভালো ব্যাখ্যাকারীর ভুলত্রুটিগুলো (যা তার গবেষণার কাজে প্রভাব বিস্তার করেছে) না লুকিয়ে তাদের স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত, যাতে ভবিষ্যৎ গবেষক সতর্ক হতে পারে।

(চ) **সহজ ও পরিষ্কার ভাষার ব্যবহার ঃ** গবেষকের বাহারী ভাষার পরিবর্তে সহজ ও প্রভাব বিস্তারকারী ভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

(ছ) **ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য মতামত প্রদান করা ঃ** গবেষক গবেষণা করার সময়ে অনেক নতুন

ধারণা পেতে পারেন। এই সমস্ত বিষয় তার গবেষণার রিপোর্টে উল্লেখ করা দরকার, যাতে ভবিষ্যতে গবেষণা করা যায়।

4.10.4 ফলাফলের ব্যাখ্যা প্রদানের ভিত্তিসমূহ (Bases of the Interpretation of Result)

(ক) গবেষণা সমস্যার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়।

(খ) গবেষণা প্রকল্পের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়।

যেহেতু প্রকল্প হল সম্ভাব্য সমাধান যা তথ্য সংগ্রহের আগেই গঠন করা হয় সেইহেতু ফলাফলের ব্যাখ্যাদান প্রকল্পের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিনা তা প্রকাশ পাওয়া উচিত।

(গ) পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ এবং ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়—

(ঘ) **পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ফলাফলের ব্যাখ্যা করা হয় ঃ** কখনো কখনো গবেষণা চলাকালীন গবেষক চলা-দের মধ্যে কিছু প্রকল্পিত নয় এমন কিছু সম্পর্ক খুঁজে পেতে পারেন। গবেষকের ঐ সমস্ত সম্পর্ক অগ্রাহ্য না করে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া উচিত যাদের নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষণা করা যাবে।

4.10.5 ফলাফলের বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় সতর্কতাসমূহ (Necessary Precautions in Interpreting the Result)

ফলাফলের ব্যাখ্যা করার সময় সামান্যতম অসতর্কতা কেবলমাত্র ফলাফলের ভুল ব্যাখ্যা করে না, এটি জ্ঞানের ক্ষতি করে এবং এর উপর নির্ভর করে তৈরী ভবিষ্যৎ গবেষণাকেও ভুলপথে চালিত করে। এটি অর্থ, সময়, শ্রম এবং সম্পদেরও প্রভূত অপচয় করে। সেই কারণে সম্ভাব্য ভুলগুলি চিহ্নিত নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। নিম্নে কিছু সাধারণ ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে দেওয়া হল, যাদের ফলাফলের ব্যাখ্যা করা সময় যত্নশীল ও এড়িয়ে চলা উচিত—

(১) **সমস্যাকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অসমর্থ হওয়া ঃ** বেশীর ভাগ সময়েই সমস্যা গবেষণার গাইড দিয়ে থাকেন। বেশীর ভাগ সমস্যা স্থানীয় বর্তমান সমস্যাকে ফোকাস করে। কিন্তু তাদের আন্তর্জাতিক প্রস্থতা এবং দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা উচিত, যাতে দীর্ঘমেয়াদী উপকার পাওয়া যায়।

(২) **বিভিন্ন উপাদানের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে অসমর্থতা ঃ** অনেক সময় গবেষণা সম্মানের বা মর্যাদার জন্য করা হয়। বেশীর ভাগ গবেষক তাদের মুখ্য চল-এর ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রদানে অসমর্থ। তাদের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট চল-দের বা তাদের প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট ওরিয়েন্টেশন থাকে না। সুতরাং ভালো গবেষকের সমস্ত ধরনের চলদের ফলাফলের ব্যাখ্যা করার সময় গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(গ) **গবেষণার সীমাবদ্ধতা সনাক্তকরণে ব্যর্থতা ঃ** কোনো গবেষণাই সীমাবদ্ধতা মুক্ত নয় এবং ফলে কোন প্রকার অপ্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা, ত্রুটিপূর্ণ গবেষণা রূপরেখা, বা ভুল টুলস (tools) এবং অনুপযুক্ত পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ হতে পারে। গবেষকের এদের সনাক্তকরণ করা উচিত এবং এদের নিরীখে ফলাফল ব্যাখ্যা করা উচিত।

(ঘ) **অপরিলক্ষিত/বা অপঠিত বিষয়ের জন্য ভুল ব্যাখ্যা প্রদান ঃ** ফলাফল একাধিক ঘটনা/বিষয়ের সমষ্টি সেখানে অনেক সুপ্ত অপরিলক্ষিত কিছু বিষয়/ঘটনা আছে যারা ফলাফলে প্রভাব বিস্তার

করে। যেমন গবেষক রিপোর্ট করলেন ক কারণে 'খ' তৈরী সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটি (ক+খ)ও হতে পারে। সুতরাং গবেষকের এই 'গ'-দেরও জানা উচিত।

(ঙ) **নির্বাচিত বিষয়/উপাদানকে অগ্রাহ্য করে :** অনেক সময় গবেষক কিছু নির্বাচিত উপাদান সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অগ্রাহ্য করেন তাতে ভুল সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ছাড়া সমস্ত বিষয়ে ভালো ফল করা থেকে যদি গবেষক সিদ্ধান্ত নেয় বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়, তবে তিনি শিক্ষার্থীদের ঐ বিষয়ে যথাযথ শিক্ষাদান না পাওয়ার কারণকে অগ্রাহ্য করেছেন এমনও হতে যার ফল স্বরূপ বিজ্ঞানে খারাপ ফল হয়ে থাকতে পারে।

(চ) **ব্যাখ্যাদানমূলক মূল্যায়নের জটিলতা :** ঘটনার যথাযথ মূল্যায়ন ছাড়া বর্ণনাধর্মী গবেষণার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান, কঠিন। যেমন ৫০ শতাংশ শিক্ষকের মতে ১০+২ এর পাঠক্রম সন্তুষ্টজনক এবং ৫০ শতাংশ শিক্ষকের মতে সন্তুষ্টজনক নয়। এখানে গবেষক কি করবেন? এখানে গবেষকের পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন এবং মূল্যায়ন করে জমায়েত করা তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা উচিত।

(ছ) **প্রত্যাশিত ফলাফল ব্যাখ্যা করা :** যদি প্রত্যাশিত ফলও পাওয়া যায় তবুও সাহায্যকারী তথ্যের বাইরে যাওয়া উচিত নয় এবং আমাদের সীমাবদ্ধতা অগ্রাহ্য ও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এমনকি আমাদের প্রত্যাশিত ফলাফলের রিপোর্ট তৈরী করার সহজাত এবং অবচেতন প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

(জ) **অপ্রত্যাশিত তদন্তফল বা ঋণাত্মক ফলের ব্যাখ্যা করা :** অপ্রত্যাশিত বা ঋণাত্মক ফলের কারণে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। মনে রাখতে হবে প্রকল্প হল সম্ভাব্য সমাধান যা অনুমান নির্ভর, প্রকৃত সমাধান নয়। সেই কারণে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে মূল প্রকল্পকে পুনরায় বিচার করা উচিত। আমাদের ইচ্ছামতো বৈপরীত্যমূলক ফলাফল রিপোর্ট করা উচিত নয় কারণ এটি স্বচ্ছ ধারণা নয় এবং এটা গবেষণার উন্নয়ন এবং জ্ঞানের গতিপথ রুদ্ধ করে। ঋণাত্মক ফল হলেও রিপোর্ট করা উচিত।

4.11 রিপোর্ট লিখন (Report Writing)

এমনকি একটি ভালো গুণমান সম্পন্ন গবেষণারও কোনো ব্যবহার থাকে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি জনগণের কাছে পৌছায়? গবেষণা রিপোর্ট লিখন এই কাজটি করে।

রিপোর্ট লিখনের উদ্দেশ্য :

* ফলাফল প্রকাশ করার জন্য--রিপোর্ট লিখনের সাহায্যে আমরা গবেষণা লব্ধ জ্ঞান/ফলাফল সক্রিয়ভাবে প্রকাশ করতে পারি।

* প্রাপ্ত ফলাফল অংশীদার করার জন্য রিপোর্ট লিখন জরুরী মুখে মুখে এটি বারংবার বলা বা প্রচার করা সম্ভব নয়। এমন কি গবেষণার পুনরাবৃত্তিও সম্ভব নয়। তাই রিপোর্ট লিখে ও মুদ্রিত করা হয় যাতে আগ্রহী ব্যক্তি তা পেতে পারে এবং এর সুবিধা নিতে পারে।

* জ্ঞানের অগ্রগতি ও বিস্তার ঘটাতে রিপোর্ট লিখন দরকার যদি গবেষণালব্ধ ফল গবেষকের খাতে জমা থাকে বা পরীক্ষাগারের দরজা অতিক্রম না করে তবে তার বিস্তার সম্ভব নয়। প্রত্যেক গবেষণাই জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং অগ্রগতি ঘটায় এবং এটি ঘটা রিপোর্ট লিখন ব্যতীত অসম্ভব।

* জনগণ যাতে গবেষণার সুবিধা পেতে পারে। একই গবেষণার পুনরাবৃত্তি না করেও জনগণ গবেষণালব্ধ ফলের সুবিধা ভোগ করতে পারে তার জন্য রিপোর্ট লেখা দরকার।

* বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা করার জন্য—রিপোর্ট লিখন ও প্রকাশনা ছাড়া এর পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়, যা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপনে চেষ্টা করে।

* ভবিষ্যৎ গবেষণা উৎস এবং আমন্ত্রণের জন্য--গবেষণার সময় গবেষক অনেক ভিন্ন ধরনের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ধারণার সন্ধান পেয়ে থাকতে পারেন। রিপোর্ট লিখন ছাড়া এদের জানা সম্ভব নয়।

যদিও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রিপোর্ট লিখন পদ্ধতি ব্যবহার করেন তবুও সবাই এর সঠিক সহজ এবং সংগতিপূর্ণ উপস্থাপনা বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। গবেষণা রিপোর্ট স্পষ্ট, সংগঠিত এবং যথাযথভাবে উপস্থাপিত হওয়া উচিত, যাতে ধারণাসমূহের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করা যায়। গবেষণা রিপোর্ট তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত এবং থিসিস বা ডিসার্টেশন থেকে পৃথক।

American Psychological Association & Publication Manual 1943 সালে রিপোর্ট লিখনের নিম্নলিখিত রূপরেখা দিয়েছেন।

I. **শিরোনাম পাতা (Title Page)**

   (ক) শিরোনাম (Title)

   (খ) Author's Name & Affiliation.

   (গ) Running Head.

   (ঘ) Acknowledgements (if any)

II. Abstract :

III. Introduction (No heading required) :

   (ক) Statement of the Problem.

   (খ) Review of the Literature.

   (গ) Purpose and Rationale/Hypothesis.

IV. Method :

   (ক) Subjects.

   (খ) Apparatus or Instrumentation.

   (গ) Procedure.

V. Results :

(ক) Tables and Figures (as per requirement)

(খ) Statistical Presentation.

VI. Discussion.

(ক) Support or Nonsupport of the Hypothesis.

(খ) Practical and Theoretical Implications.

(গ) Conclusions.

VII. References :

VIII. Appendix (if any) :

I. শিরোনাম পাতা (Title Page) : এটি গবেষণা রিপোর্টের প্রথম পাতা। এটি শিরোনাম, গবেষকের নাম ও অনুমোদন নিয়ে গঠিত। শিরোনাম সংক্ষিপ্ত গবেষণার উদ্দেশ্যে সূচিত করা উচিত। এটি পাতার উপরের দিকে মাঝ জায়গা বরাবর লেখা উচিত। গবেষকের অনুমোদন নামের নীচে লেখা উচিত। কৃতজ্ঞতা স্বীকারে (Acknowledgements) গবেষণার ভিত্তি, আর্থিক সাহায্য, গবেষণায় সাহায্য প্রভৃতি থাকা উচিত।

II. সারসংকলন (Asbstract) : এটি গবেষণা রিপোর্টের দ্বিতীয় পাতা যা গবেষণা সম্পর্কে ১০০ থেকে ১৫০ শব্দে বর্ণনা করা হয় যাতে সমস্যার সংক্ষিপ্তসার, নমুনার বৈশিষ্ট্য, ব্যবহৃত টুলস, গবেষণা ফাইন্ডিং ও গবেষকের মন্তব্য থাকে।

গবেষণার রিপোর্টের মুখ্য বিষয়গুলি হল ঃ সূচনা, পদ্ধতি, ফলাফল ও আলোচনা·

সূচনা ঃ এটি তৃতীয় পাতাতে সূচনা নামাঙ্কন ছাড়াই শুরু হয়। এতে নিম্নের বিষয়গুলি থাকে—

* **সমস্যা-মন্তব্য** — এটি স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

* প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের পর্যালোচনা অর্থাৎ গবেষণা-সমস্যার সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত।

* **তত্ত্ব প্রকল্প**—এতে স্পষ্ট যুক্তি, ব্যবহৃত চল-দের প্রয়োগগত সংজ্ঞা, বিভিন্ন প্রকল্পের যোগাযোগ ও প্রচলিত মন্তব্যের সাহায্যে তত্ত্ব, প্রকল্পের যথার্থতা বিচার করা হয়।

III. **পদ্ধতি ঃ** সূচনার পর এর স্থান। এখানে গবেষক কি এবং কিভাবে গবেষণা করবেন তা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন। এটি খুবই সতর্কতার সঙ্গে লেখা উচিত যাতে প্রয়োজনে ভবিষ্যতে গবেষকেরা এর পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। এই বিভাগটি 'পদ্ধতি' নামাঙ্কিত মুখ্য শিরোনামের অধীনে বাম ধারে শুরু হয় এবং **কতকগুলি** শিরোনাম থাকে, যাদের শিরোনামের তলায় দাগ দেওয়া থাকে, যেমন-- বিষয় ঃ এটি নমুনার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে যেমন কতগুলি নমুনা অধ্যয়ন করা হবে তার সংখ্যা, নমুনা নির্বাচনের পদ্ধতি, নমুনার জনসংখ্যা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য যেমন—বয়স, শ্রেণী, লিঙ্গ, জাতি, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি যা গবেষণার জন্য প্রয়োজন।

খুব সংক্ষিপ্তভাবে টুলস সম্পর্কে তথ্য— লেখকের নাম, টুলসের বর্ণনা, বিশ্বাসযোগ্যতা, বৈধতা প্রভৃতি যাতে ভবিষ্যত গবেষক বা গবেষণাটির পুনরাবৃত্তি করতে চাইলে টুলস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারে.

IV. **কার্যপ্রণালী** : এতে গবেষণায় গবেষকের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে অতীতকালে ব্যবহার করে বর্ণনা দেওয়া থাকে। এটি যত্নশীলভাবে এবং সবিস্তারেও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখা উচিত। কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্য ছাড়া যাবে না।

V. **ফলাফল** : এটি যত্নের সঙ্গে ও সুসংগঠিত ভাবে তথ্যরাশি ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ও ফল উপস্থাপিত করে। এটি ফলাফলের নিহিতার্থের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত নয়। এটি সমস্ত ধরনের প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধান ফল যা প্রকল্পকে সমর্থন করছে বা করছেন সবই উপস্থাপনা করে। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার জন্য ছক ও রেখচিত্র ব্যবহার করা হয়। সম্পূর্ণ পরিসংখ্যানগত গণনা ও সূত্রাবলী ব্যতিক্রমী ছাড়া গবেষণা রিপোর্টে এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

ছকের সাহায্যে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের তাৎপর্যের স্তর যত্নের সঙ্গে রিপোর্ট করা হয়।

VI. **আলোচনা** : গবেষণা রিপোর্টের শেষ অংশ হল আলোচনা। ফলাফলের সতর্ক উপস্থাপনার পর অধ্যয়নের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক নিহিতার্থ নির্ধারণের কাজ করা হয়ে থাকে, যেখানে মূল সমস্যার সমাধানের উপর আলোকপাত করেছে কিনা প্রকল্পতত্ত্ব ফলাফল সমর্থন করছে না প্রকল্পতত্ত্ব বর্জন করছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। এখানে ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য মতামত পরামর্শও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

VII. **তথ্যপুস্তক ও পরিশিষ্টসমূহ** : এই বিভাগটি নতুন পাতার উপরের দিকে মাঝখানে শিরোনাম লিখে শুরু হয়। এতে গবেষকের রিপোর্টে লিখিত সমস্ত তথ্য পঞ্জি, বই, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি নির্দিষ্টভাবে লেখা হয়। সমস্ত তথ্য সহায় বর্ণনাক্রম অনুযায়ী পাতার বামধার থেকে ডাবল স্পেস ছেড়ে লেখা হয়। বইয়ের লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম ন্যূনতম বিরতিসূচক চিহ্ন (Comma) দিয়ে লেখা হয়। তথ্যসহায়িকা লেখার বিভিন্ন ধরনের আছে, তবে একজনের যে কোনো এক ধরনেরই অনুসরণ করা উচিত।

পরিশিষ্টতে রিপোর্টের মূল অংশের যে সব বিষয়ে বিশদে লেখা সম্ভব হয়নি তা লেখা হয়, তথ্য সহায়িকার মতো পরিশিষ্টও নতুন পাতার উপরের দিয়ে শিরোনাম হিসাবে লেখা হয়।

সুনিপুণ গবেষণা রিপোর্ট লেখা একটি সহজ কাজ নয়। এমনকি একজন অভিজ্ঞ গবেষকও তার গবেষণা রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগে খুব যত্ন ও ধৈর্যের সঙ্গে অনেকবার দেখেন। বানান ভুল, অসংগতিপূর্ণ কালের গঠনের প্রতি নজর দেওয়া দরকার। সাধারণত তথ্যসহায়িকা লেখাতে অনেক ভুল হয়।

১৯৮৩ সালে APA-এর প্রকাশন ম্যানুয়ালের কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রিপোর্টে লেখার জন্য তথ্যসহায়িকা লেখার জন্য নীচে দেওয়া হল—

(ক) **বই**—Koul, L. (1997) Methodology of Educational Research, New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

(খ) **বহু লেখকের বই**—Best, J. W. and Kahn, J. V. (1992) Research Best, J. W. and Kahn, J. V. (1992) Research in Education. New Delhi : Prentice-Hall of Indai Pvt. Ltd.

(গ) **জার্নাল নিবন্ধ**—Rosander. A. C. (1936), The Spearman-Brown formula in attitude scale construction. Journal of Experimental Psychology, 19, 486-495.

(ঘ) **থিসিস বা ডির্সাটেশন (অপ্রকাশিত)**—Best, J. W. (1948) An analysis of certain selected

factors underlying the choice of teaching as a profession. Unpublished doctoral dissertaing. University of Wisconsin, Madison.

গবেষণার রিপোর্টের টাইপ করা— এটি ডাবল স্পেসে পরিষ্কারভাবে ৮৫/১১ ইঞ্চি বড় কাগজে উপরে নীচে, বাম ও ডান ধারে ১.৫ ইঞ্চি করে ছাড় দিয়ে কাগজের একধারে টাইপ করা উচিত। প্রতিটি লাইনের শেষে শব্দভেঙে লেখা ঠিক নয়। পাতার সংখ্যা সূচক নম্বর পাতার ডানদিকের উপর থেকে ১ ইঞ্চি নীচে ডান দিকে ঘেঁষে লেখা দরকার। শিরোনাম পাতার পাতায় সংখ্যা লেখা থাকে না।

4.12 এককের সারাংশ (Unit Summary)

এই ইউনিটটিতে গবেষণার খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফলের বিশদীকরণ, গবেষণা রিপোর্ট লিখন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সমস্ত বিষয়ে পরিচিত করার চেষ্টা হয়েছে তবুও জায়গার অভাবে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের বিশদ আলোনা সম্ভব হয়নি। ফলাফলের বিশদীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার জন্য নিরপেক্ষ এবং সতর্ক প্রচেষ্টা দরকার। শেষে রিপোর্ট লিখন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রিপোর্ট লিখন যোগাযোগের তাৎপর্যপূর্ণ পথ যার জন্য রিপোর্ট লিখনে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

4.13 অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

১। গুণগত তথ্যের সংগঠন ও বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা কর?

২। পরিমেয় তথ্যের সংগঠন ও বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা কর?

৩। ফলাফলের বিশদীকরণ জরুরী কিনা?

৪। কিভাবে ফলাফল কার্যকরী/সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

৫। গবেষণা রিপোর্টের মূল অংশগুলি কি কি?

৬। কেন রিপোর্ট লিখন প্রয়োজনীয় এবং কিভাবে আমরা ফলপ্রসূ রিপোর্ট লিখতে পারি?

৭। কার্যকরী যোগাযোগের জন্য কি রিপোর্ট লিখন জরুরী? ব্যাখ্যা কর।

4.14 আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion & Clarification)

4.15 উৎস (Reference)

1. American Psychological Association (1983) *Publication Manual* (3rd ed.). Washington. DC : Author.

2. Berelson, B. (1952) *Content Analysis in Communication Research*. Glencoe : The Free Press.

3. Cartwright, D. P. (1970) Analy is of Qualitative Material. In L. Festinger and D. Katz (Eds.) *Research Methods in Behavioural Sciences*. New Delhi : Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd. Indian Edition.

4. Ferguson. G. A. (1981) *Statistical Analysis in Psychology and Education* (5th ed.). New York : McGraw-Hill.

5. Glass. G. V. and Hopkins. K. D. (1984) *Statistical Methods in Education and Psychology* (2nd ed.). Englewood Cliffs. NJ : Prentice-Hall.

6. Good. C. V. Barr, A, S, and Scates, D. E. (1941) *Methodology of Educational Research*. New York : Appleton-Century Crofts. Inc.

7. Guilford. J. P. and Fruchter B. (1978) *Fundamental Statistics in Psycologhy and Education*. New York : Holt. McGraw-Hill.

8. Hays. W.L. (1981) *Statistics* (3rd ed.). New York : Holt, Rinehart and winston.

9. Kaplan. A. (1913) Content Analysis and Theory of Signs. Phy. Sc., 10, p. 230.

10. Kothari. C. R. (1990) *Research Methodology : Methods and Techniques*, New Delhi : Wishwa Prakashan.

11. Koul. L. (1997) *Methodology of Educational Research*. New Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

12. Patton. M. Q. (1982) *Qualitative Evaluation Methods*. London : Sage Publications.

13. Patton. M. Q. (1990) *Qualitative Evaluation and Research Methods* (2nd ed.). Newsbury Parl CA : Sage.

Abriviation

AAMR	-	American Association on Mental Retardation
IEP	-	Individualiged Educational Programme.
EMR	-	Educable Mentally Retarded.
TMR	-	Trainable Mentally Retarded.
CBTR	-	Central Bureau of Textbook Research.
CBEVG	-	Central Bureau of Educational and Vocational Guidance.
NIBE	-	National Institute of Basic Education
NIEPA	-	National Institute of Educational Planning and Administration
IIE	-	Indian Institute of Education
CASE	-	Centre of Advanced Study in Education.
EP	-	Educational Perspective.
ICSSR	-	Indian Council of Social Science and Research.